জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা

নবম–দশম শ্রেণি

রচনা

আবু মুহম্মদ

মোঃ আবদুল হক

সম্পাদনা

প্রফেসর আ খ ম ফারুক

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর- ২০১২
পুনর্মূদ্রণ : **জুলাই, ২০১৪**

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
মেহের নিগার
জারিয়া তুল হাফসা

কম্পিউটার কম্পোজ
পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রাঃ) লিঃ

প্রচ্ছদ
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
গাজী মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান টিটো

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ : আনন্দ প্রিন্টার্স, ১৬৬ আরাবাগ, ঢাকা।

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা বিষয়টি মূলত সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন এই জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত। দেশ-বিদেশের বিচিত্র খেলাধুলা চর্চার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা যেন কর্মক্ষম সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে সেদিক বিবেচনায় রেখে পাঠ নির্বাচন করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ আবুল কাসেম মিয়া
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	সুস্থজীবনের জন্য শারীরিক শিক্ষা	১–১৩
দ্বিতীয়	শারীরিক সক্ষমতা	১৪–২১
তৃতীয়	মানসিক স্বাস্থ্য ও অবসাদ	২২–২৯
চতুর্থ	স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসেবা	৩০–৩৯
পঞ্চম	স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টি	৪০–৪৮
ষষ্ঠ	মাদকাসক্তি ও এইডস	৪৯–৬৯
সপ্তম	বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য	৭০–৭৯
অষ্টম	দলগত খেলা	৮০–১২১
নবম	অ্যাথলেটিক্স ও সাঁতার	১২২–১৪৬
দশম	খেলাধুলার দুর্ঘটনা	১৪৭–১৫৯

প্রথম অধ্যায়

সুস্থজীবনের জন্য শারীরিক শিক্ষা

শারীরিক শিক্ষায় সুস্থজীবন। তাই শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা অপরিহার্য। আগে সবার ধারণা ছিল শরীর সম্বন্ধীয় শিক্ষাই শারীরিক শিক্ষা। শরীরকে নিয়ে যে শিক্ষা আবর্তিত হয় তাকে শরীরচর্চা বলে। শরীর ভালো না থাকলে মন ভালো থাকে না। কাজে মন বসে না, তাই দেহ ও মনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। 'সুস্থ দেহে সুন্দর মন' প্রাচীন এই প্রবাদটি সর্বযুগে সর্বকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে শারীরিক উন্নয়ন, মানসিক বিকাশ ও সামাজিক গুণাবলি অর্জনই হলো শারীরিক শিক্ষা। একজন শিক্ষার্থী শারীরিক শিক্ষা লাভ করে সুস্থ দেহে সুন্দর মনের অধিকারী হয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সুস্থজীবনের জন্য শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- শারীরিক শিক্ষার নীতি ও ভিত্তি বর্ণনা করতে পারব ।
- বাংলাদেশের শারীরিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সুস্থজীবন যাপনে অভ্যস্ত হব।
- শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হব।
- শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব ।
- শারীরিক শিক্ষার বিভিন্ন কমসূচি আন্তঃশ্রেণি, আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানাদি সঠিকভাবে পালন করতে পারব ।
- শারীরিক শিক্ষার বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবে।

পাঠ–১ : শারীরিক শিক্ষা : শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলতে বা সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গেলে প্রথমেই শিক্ষা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। শারীরিক শিক্ষা ছাড়া শিক্ষা অসম্পূর্ণ। শিক্ষা শব্দটির ব্যাখ্যা প্রদান করলে শারীরিক শিক্ষা কী তা বোঝা সহজ হবে। শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তি নানাভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যা বিভিন্ন অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। শিক্ষা শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ নয়, ব্যক্তির শারীরিক, সামাজিক, আবেগিক ও অন্যান্য দিকেরও সুষম বিকাশ সাধন করে। শিক্ষা ব্যক্তিজীবনের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়েই ঘটে না, শিক্ষা জীবনব্যাপী বিস্তৃত। শিক্ষা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষা অর্জিত হয় বাড়িতে, সমাজে, খেলার মাঠে এবং সর্বত্র।

শিক্ষা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি সংজ্ঞা–

শিক্ষা ব্যক্তির সর্বোচ্চ সম্ভাব্য শারীরিক ও আত্মিক সৌন্দর্য ও উৎকর্ষ সাধন করে।

(Education helps in the body and soul of the pupil all the beauty and all the perfection he is capable of) Plato. শিক্ষা হলো সুস্থশরীরে সুস্থমন তৈরি (Education is the creation of sound mind in a sound body)

শরীর, মন ও আত্মার সর্বোচ্চ বিকাশ সাধনই হলো শিক্ষা।

শারীরিক শিক্ষা ও শিক্ষার সম্পর্ক সম্বন্ধে সি. এ. বুচার (C.A. Bucher) বলেছেন–"শারীরিক শিক্ষা, শিক্ষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শারীরিক শিক্ষা হলো সুনির্দিষ্ট শারীরিক কাজকর্মের মাধ্যমে শারীরিক, মানসিক, আবেগিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা।" এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক।

প্রাচীনকালে শারীরিক শিক্ষা বলতে শরীর সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে বুঝানো হতো। এ ধারণা ভুল। শরীর সম্বন্ধীয় শিক্ষা বা শারীরিক কসরতকে শারীরিক শিক্ষা নয় শরীরচর্চা বলে। শারীরিক শিক্ষা শুধু শরীর নিয়েই আলোচনা করে না, এর সাথে মানসিক বিকাশ ও সামাজিক গুণাবলি কীভাবে অর্জিত হয় সে ব্যাপারেও সহায়তা করে।

ডি.কে. ম্যাথিউস বলেছেন– শারীরিক কার্যকলাপের দ্বারা অর্জিত শিক্ষাই শারীরিক শিক্ষা।

হপ স্মিথ ও ক্লিফটন বলেছেন– বিজ্ঞানসম্মত ও কৌশলগত অঙ্গসঞ্চালনের নাম শারীরিক শিক্ষা।

জে. বি. ন্যাশের ভাষায়– ''শারীরিক শিক্ষা গোটা শিক্ষার এমন একদিক যা মাংসপেশির সঠিক সঞ্চালন ও এর প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে ব্যক্তির দেহের ও স্বভাবের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে।''

উল্লিখিত উক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শারীরিক শিক্ষার মূলকথা হলো– দেহ ও মনের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষম উন্নয়ন, মানসিক বিকাশ সাধন, সামাজিক গুণাবলি অর্জন ও খেলাধুলার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন।

শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য : শারীরিক শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সর্বাত্মক উন্নতি সাধন করা, সুস্থদেহে সুন্দর মন গড়া। শারীরিক শিক্ষার প্রধান কাজ হলো শিশুকে আনন্দ ও খেলাধুলার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা। বিভিন্ন শারীরিক শিক্ষাবিদগণ শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নিম্নলিখিত মত ব্যক্ত করেছেন। উইলিয়ামস্-এর মতে "শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির শারীরিক,

সামাজিক ও অন্যান্য দিকের সুষম উন্নতি ঘটিয়ে ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনের চেষ্টা করা"। **বুক ওয়াল্টার** বলেছেন– "শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দিক সমূহের সুসমন্বিত বিকাশ সাধন"। এই বিকাশ সাধনের উপায় হলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও নিয়মনীতি অনুসারে পরিচালিত খেলাধুলা, ছন্দোময় ব্যায়াম এবং জিমন্যাস্টিকস্ ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ।

এম.জি. ম্যাসন ও এ.জি.এল ভেন্টার বলেছেন–

১. শিশুকে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য তাকে সুস্থভাবে গড়ে তোলা।
২. শিশুর সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ঘটানো।
৩. সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা।
৪. নৈতিক, আবেগিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক গুণাবলি অর্জনে অনুপ্রাণিত করা।
৫. খেলাধুলার মাধ্যমে নেতৃত্বদানের গুণাবলি অর্জন করা।

শারীরিক শিক্ষাবিদদের উপরোক্ত মতামত থেকে পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য সাধারণ শিক্ষার মতোই ব্যক্তি সত্তার সর্বোচ্চ ও সুষম বিকাশ সাধন যা সুপরিকল্পিত এবং নিয়ন্ত্রিত খেলাধুলা ও অনুরূপ ক্রিয়া কর্মের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

কাজ– ১ : শারীরিক শিক্ষার সংজ্ঞাগুলো পোস্টার পেপারে লিখে দেয়ালে লাগিয়ে রাখ।
কাজ– ২ : শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্যগুলো বোর্ডে উপস্থাপন কর।

পাঠ– ২ : শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য : সাধারণভাবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এই ধারণার মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না। অনেক সময় একের জায়গায় অন্যটিকে ব্যবহার করি। কিন্তু এই দুই ধারণা সমার্থক নয়। এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। লক্ষ্য হলো চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল আর উদ্দেশ্য হলো সেই গন্তব্যস্থলে পৌছানোর সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট পদক্ষেপসমূহ। যেমন– সিঁড়ি বেয়ে ছাদে ওঠার ক্ষেত্রে লক্ষ্য হলো ছাদ, আর সিঁড়ির এক একটি ধাপ হলো উদ্দেশ্য। লক্ষ্যের অস্তিত্ব মানুষের কল্পনায়, তার রূপায়ণ সম্ভব হয় না। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো বাস্তব। মানুষ উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে এমনকি তার পরিমাপও সম্ভব। শারীরিক শিক্ষাবিদগণ শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য বেশ কয়েকটি অন্তর্বর্তী পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোই শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত। বিশেষজ্ঞগণ কিছু উদ্দেশ্য সম্পর্কে একমত হলেও কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে মতের ভিন্নতাও প্রকাশ করেছেন। কয়েকটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতামত থেকে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব। বিভিন্ন চিন্তাবিদদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত বিবেচনা করে শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্যকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা–

১. শারীরিক সুস্থতা অর্জন।
২. মানসিক বিকাশ সাধন।
৩. চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন।
৪. সামাজিক গুণাবলি অর্জন।

১. শারীরিক সুস্থতা অর্জন

ক. খেলাধুলার নিয়মকানুন মেনে ভালো করে খেলতে পারা।

খ. কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিল করা।

গ. স্নায়ু ও মাংসপেশির সমন্বয় সাধনে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ঘ. দেহ ও মনের সুষম উন্নতি করা।

ঙ. সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করা।

চ. সহিষ্ণুতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জন করা।

২. মানসিক বিকাশ সাধন

ক. উপস্থিত চিন্তাধারার বিকাশ সাধন।

খ. নৈতিকতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

গ. সেবা ও আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

ঘ. বিভিন্ন দলের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠা।

৩. চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন

ক. আনুগত্যবোধ ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পাওয়া।

খ. খেলাধুলার মাধ্যমে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হওয়া।

গ. খেলোয়াড়ি ও বন্ধুত্বসুলভ মনোভাব গড়ে ওঠা।

ঘ. প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব গড়ে ওঠা।

ঙ. আত্মসংযমী হওয়া ও আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করা।

৪. সামাজিক গুণাবলি অর্জন

ক. নেতৃত্বদানের সক্ষমতা অর্জন ও সামাজিক গুণাবলি অর্জন করা।

খ. বিনোদনের সাথে অবসর সময় কাটানোর উপায় জানা।

গ. বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করা।

ঘ. সকলের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা।

শারীরিক শিক্ষাবিদদের মতামত থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণ শিক্ষার মতোই ব্যক্তিসত্তার সর্বোচ্চ ও সুষম বিকাশ সাধন করে থাকে এবং পরিকল্পিতভাবে খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জনে সাহায্য করে।

কাজ– ১ : শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্যগুলো পোস্টার পেপারে লিখে দেয়ালে লাগাও।

কাজ– ২ : সামাজিক উদ্দেশ্যগুলো দ্বারা কী অর্জন করা যায় গ্রুপ ওয়ারী বসে ব্যাখ্যা করবে।

কাজ– ৩ : শারীরিক সুস্থতা অর্জনের উদ্দেশ্যগুলো বোর্ডে লিখে দেখাও।

পাঠ– ৩ : শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : শারীরিক শিক্ষা দেহ ও মনের সামঞ্জস্য উন্নয়ন সাধন করে। শারীরিক শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার পূর্ণতা আসে না। যে সব গুণ থাকলে দেশের প্রতিটি নাগরিক সুস্থ, সবল ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠে এবং নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়, শারীরিক শিক্ষা সেই গুণাবলি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। মানুষ সমাজে স্বীকৃতি পেতে চায়। এই স্বীকৃতির মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। তাই নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব গঠনেও শারীরিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। আমাদের দেহ কতকগুলো অঙ্গের সমষ্টি। আবার প্রত্যেকটি অঙ্গ নানারূপ মাংসপেশি, হাড়, শিরা, ধমনি ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। দেহকে ঠিক রাখার জন্য সব সময়ই দেহের মধ্যে কতকগুলো প্রক্রিয়া কাজ করছে। এই প্রক্রিয়াগুলো সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা। উপযুক্ত খাবার, অঙ্গ সঞ্চালন, বিশ্রাম ও ঘুম এইগুলির অভাবে শরীর সঠিকভাবে বৃদ্ধি পায় না ও সুস্থ থাকে না। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা দৈহিক ও মানসিক বিকাশের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করছে।

বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলো ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো–
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তাই সমাজ সংরক্ষণ, সমাজ সংস্কার ও ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের কাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজ ও দেশের কাছে দায়বদ্ধ। দেশের মানবসম্পদকে সঠিকভাবে বিকশিত করা এবং আজকের শিশুকে আগামী দিনের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত। এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ মূলত দ্বিমুখী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম কাজ হলো শিশু-শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিকাশ সাধন। এর মধ্যে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক দিক অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় কাজ হলো শিক্ষার্থীর জৈবিকসত্তাকে সামাজিক সত্তায় রূপান্তরিত করা। এর মধ্যে শিশুর চারিত্রিক ও মূল্যবোধের উন্নতি এবং সামাজিক বিকাশ অন্তর্ভুক্ত।

এই কাজের মধ্যে প্রথমটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ কাজ এবং দ্বিতীয়টি তার পরোক্ষ দায়িত্ব। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়। মাসলো-এর মতে শিক্ষার্থীর এই প্রয়োজন তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। যেমন–

১. শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন (Biological need)

২. মানসিক ও আত্মিক পরিপূর্ণতার প্রয়োজন (Psychological need)

৩. সামাজিক প্রয়োজন (Social need)

১. শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন : শিক্ষার্থীর শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন পূরণে শারীরিক শিক্ষা প্রত্যক্ষ কাজ করে। এ ব্যাপারে শারীরিক শিক্ষার ভূমিকা হলো–

ক. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর গতিশীল কাজের জৈবিক প্রয়োজন পূরণ করে।

খ. শিক্ষার্থীর দৈহিক গঠন সুন্দর ও মজবুত করে।

গ. শিক্ষার্থীর শারীরিক সক্ষমতা ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ঘ. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

ঙ. শিক্ষার্থী খেলাধুলার কৌশল শেখার মাধ্যমে খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জন করে।

চ. শারীরিক শিক্ষা সুস্থ মনের জন্য সুস্থ দেহ গড়ে তোলে।

২. মানসিক ও আত্মিক পরিপূর্ণতা প্রয়োজন

ক. শিশুর মানসিক ও বুদ্ধিমত্তার ভিত গড়ে তোলে।

খ. পড়াশোনার একঘেয়েমি দূর করে।

গ. শিক্ষার্থীর চারিত্রিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়।

ঘ. আত্মসচেতনতা, আত্মনির্ভরতা, আত্মোপলব্ধি ও আত্মসম্মান বাড়িয়ে তোলে।

ঙ. পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলতে সাহায্য করে।

চ. শিক্ষার্থীর মনে সৃজনশীলতার অনুভূতি জাগ্রত করে।

ছ. ক্ষতিকর নেশা থেকে দূরে রাখে।

জ. চিত্তবিনোদন ও অবসর সময় কাটানোর উপায় নির্বাচনে সাহায্য করে।

৩. সামাজিক প্রয়োজন

ক. প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে।

খ. খেলাধুলায় সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটে ও মানসিক গুণ অর্জনে সহায়তা করে।

গ. শারীরিক শিক্ষা নেতৃত্বদানের ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।

ঘ. দেশ ও সমাজের সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটায়।

ঙ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে।

চ. শিক্ষার্থীর উদার মানসিকতা ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে।

কাজ- ১:	শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনগুলো দলে দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা কর।
কাজ- ২ :	মানসিক প্রয়োজনীয়তাগুলো শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ৩টি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে ২টি করে প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করতে বলবেন।
কাজ- ৩ :	সামাজিক প্রয়োজনগুলো বোর্ডে লিখে দেখাও।

পাঠ-৪ : শারীরিক শিক্ষার নীতি ও ভিত্তি : নীতি হলো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, ঐতিহাসিক তথ্য এবং দার্শনিক মতবাদপুষ্ট মৌলিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস ও মতবাদ। নীতি গড়ে ওঠে বাস্তব তথ্যের উপর ভিত্তি করে এবং নীতি ব্যবহৃত হয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। নীতির সংজ্ঞায় ব্যারো বলেছেন- Principles may be defined as truths or general concepts based on facts and used as guider for taking action and making choices. বাস্তব সত্যঘটনা ও সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করে নীতি ব্যবহৃত হয় যা পছন্দ মতো কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে উঠা নীতি সাধারণভাবে সবার ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য এবং এই নীতি সহজে পরিবর্তন হয় না। তবে মনে রাখতে হবে নীতি চিরন্তন নয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন তত্ত্ব বা তথ্যের প্রভাবে নীতি সংশোধিত ও পরিবর্তিত হতে পারে। তবে আপেক্ষিকভাবে নীতি অপরিবর্তনীয়। নীতির গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষিত হয় তার প্রয়োগ ও কার্যকারিতার উপর।

নীতিসমূহ : উৎসের প্রকৃতি অনুসারে শারীরিক শিক্ষার নীতিসমূহকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলো হলো–

১. **জীব বৈজ্ঞানিক নীতি** (Biological Principles)

২. **মনোবৈজ্ঞানিক নীতি** (Psychological Principles)

৩. **সমাজ বৈজ্ঞানিক নীতি** (Sociological Principles)

৪. **জীব বলবিদ্যার নীতি** (Biomechanical Principles)

৫. **দার্শনিক নীতি** (Philosophical Principles)

১. জীব বৈজ্ঞানিক নীতি : জৈবিক দিক নিয়ে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতোই জীবিত এক প্রাণী। বিবর্তনের ফলে বর্তমানে মানুষের উন্নত জৈবিক রূপ সৃষ্টি হয়েছে। জৈবিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য অন্যান্য জীবের মতোই মানুষের প্রয়োজন– খাদ্য, বিশ্রাম ও শারীরিক পরিশ্রমের। শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে গৃহীত কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য নীতি হলো–

(ক) শারীরিক ব্যায়াম প্রাণের জৈবিক ভিত্তি। শারীরিক ব্যায়ামের সাহায্যে পেশিসমূহ দেহের সমস্ত অঙ্গ ও তন্ত্রের সক্ষমতা, সুস্থতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করে বেড়ে ওঠে। তাই জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শারীরিক ব্যায়াম প্রয়োজন।

(খ) মানবদেহের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা ব্যায়ামের মাধ্যমে বাড়ে। যন্ত্রনির্ভর যুগে কায়িক পরিশ্রম কমে যাওয়ার সাথে সাথে পরিকল্পিত শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজন বেড়েছে। শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক ব্যায়ামের অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্যবোধ গড়ে তোলার উপরে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

(গ) মানুষের শারীরিক গঠন, দৈহিক উচ্চতা পেশির প্রকৃতি, স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষত্ব এগুলো বংশগতির উপর নির্ভর করে। প্রশিক্ষণের সাহায্যে শরীরের এই সমস্ত দিকের বিশেষ পরিবর্তন সম্ভব হয়। খেলোয়াড় নির্বাচনের সময় এই নীতির কথা মনে রাখা দরকার।

(ঘ) ব্যক্তির সামগ্রিক শারীরিক বৈশিষ্ট্য বংশগতি ও পরিবেশের জটিল ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল। তাই বংশগতির যথাযথ বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

(ঙ) শারীরিক গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্ষমতায় নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম তৈরির সময় এই নীতির কথা মনে রাখা দরকার।

(চ) বৃদ্ধি ও বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে শারীরিক ও শারীরবৃত্তীয় কার্যক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের হার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের। বিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরির ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি।

(ছ) শারীরিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির ও শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখার প্রধান উপায় হলো শারীরিক ব্যায়াম।

(জ) ব্যায়ামের প্রকৃতি অনুসারে শারীরিক সক্ষমতার বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। তাই শক্তি (Strength), ক্ষমতা (Power), দম (Endurance) প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক প্রশিক্ষণসূচির প্রয়োজন হয়।

২. **মনোবৈজ্ঞানিক নীতি** : মনোবিজ্ঞান হলো ব্যক্তির ব্যবহারের বিজ্ঞান যা মনের সাথে সম্পর্কিত। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করে ব্যক্তির খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করার সময়কালে প্রয়োগের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। মনোবিজ্ঞান হতে গৃহীত মূলনীতিগুলো হলো–

ক. শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে শিশুর শারীরিক বিকাশের সাথে মানসিক বিকাশও ঘটে।

খ. ব্যক্তির শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ. শিশুর মনোযোগ ও আগ্রহ খেলাধুলার কৌশল শেখাতে সাহায্য করে।

ঘ. শিশুর খেলাধুলা শেখা ও শিখনের সূত্রানুযায়ী ঘটে।

ঙ. কোনো কিছু শেখার জন্য শিশুর মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন।

চ. খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

ছ. খেলাধুলায় অংশগ্রহণের প্রতি শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ লক্ষ করা যায়।

জ. খেলাধুলা শিশুর জ্ঞান বিকাশে সাহায্য করে।

ঝ. কোনো বিশেষ খেলায় পারদর্শিতা অর্জন একটি বিশেষ ধরনের মানসিক শক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সহজ হয়।

৩. **সমাজ বৈজ্ঞানিক নীতি** : মানুষ সামাজিক জীব। শিশুর ব্যক্তিগত শারীরিক বিকাশের সাথে এই নীতি সামাজিক গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করে। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে গৃহীত এবং শারীরিক শিক্ষায় ব্যবহৃত মূলনীতিগুলো হলো–

ক. শিশু সামাজিক জীব হিসেবে জন্মায় না। উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশে তার সামাজিকীকরণ ঘটে।

খ. খেলাধুলার মাধ্যমে সামাজিক গুণাবলি ও বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটে।

গ. খেলার মাঠে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ দূর হয়।

ঘ. খেলাধুলা সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সাংস্কৃতিক দিকের বিকাশ ঘটায়।

ঙ. খেলাধুলা বিনোদন ও অবসর যাপনের উৎকৃষ্ট উপায়।

৪. **জীববলবিদ্যার নীতি** : বলবিদ্যা হলো কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল ও তার প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা। জীববলবিদ্যা বলবিদ্যার এক ব্যবহারিক শখ হিসেবে খেলাধুলায় অংশগ্রহণকালীন শরীরের উপর উপযুক্ত বল ও তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে। এই ক্ষেত্র থেকে গৃহীত মূলনীতিগুলো হলো–

ক. বল/শক্তি প্রয়োগ ছাড়া কোনো ব্যায়াম বা খেলাধুলার কৌশল সম্পন্ন করা যায় না।

খ. বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল সর্বদা গতি সৃষ্টি করে।

গ. মানব দেহের বল পেশিসংকোচনের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়।

ঘ. স্থিতি ও গতি বস্তুর দুটি প্রাথমিক অবস্থা।

ঙ. খেলাধুলার গতিকার্যে একাধিক বলের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে।

চ. মানবদেহে কিছু জৈবিক সীমাবদ্ধতাসহ যান্ত্রিক নিয়মে গতিকার্য সম্পন্ন করে।

ছ. মানবদেহের ভারসাম্যের পরিমাণ অনেকাংশে শরীরের ভরকেন্দ্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

৫. দার্শনিক নীতি : দর্শননীতি হলো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জানা দর্শনের বিভিন্ন শাখা যেমন আদর্শবাদ, প্রকৃতিবাদ, বাস্তববাদ ও প্রয়োগবাদ। এখান থেকে শারীরিক শিক্ষায় গৃহীত মুলনীতিগুলো হলো–

ক. শারীরিক শিক্ষা শুধুমাত্র শরীরের শিক্ষা নয়, ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনই হলো শারীরিক শিক্ষা।

খ. শারীরিক শিক্ষায় শিশু কেন্দ্রিকতা গুরুত্বপূর্ণ, বিষয় কেন্দ্রিকতা নয়।

গ. শারীরিক শিক্ষা প্রাকৃতিক নিয়মে শিক্ষাদানের উপর জোর দেয়।

ঘ. খেলাধুলা শিশুর শক্তিশালী মাধ্যম।

ঙ. শারীরিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর বন্ধু ও পথপ্রদর্শক।

চ. শারীরিক শিক্ষা ব্যক্তিকে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে শিক্ষা দেয়।

ছ. শারীরিক শিক্ষার প্রয়োগমূলক দিক আছে।

জ. শিশুর শারীরিক সামর্থ্য ও আগ্রহ অনুসারে শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

শারীরিক শিক্ষার ভিত্তি : আধুনিক শারীরিক শিক্ষা শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক এবং শিক্ষাশ্রয়ী এক প্রচেস্টা। তাই এই শিক্ষার কার্যক্রম গড়ে উঠে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং তথ্যের উপর ভিত্তি করে। শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক দিকের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী শারীরিক শিক্ষাসূচি প্রণীত হয়। শারীরিক শিক্ষার সঠিক কর্মসূচীর প্রণয়ন ও কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানব দেহের গঠন ও কার্যাবলি এবং ব্যক্তির সাথে দল ও সমাজের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তাই গড়ে ওঠেছে এই শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের সমন্বয়ে।

১. সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তি : একজন শিক্ষার্থী শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে এই সামাজিক গুণগুলো অর্জন করবে–

ক. সমাজের সাথে শারীরিক শিক্ষার সম্পর্ক গড়ে তোলা।

খ. সমাজ থেকে শিক্ষা লাভ।

গ. শারীরিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজবদ্ধতা।

ঘ. সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা।

ঙ. সমাজের মঙ্গল সাধনে শিক্ষা।

২. মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি : শারীরিক শিক্ষা মানুষের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধন করে। মনকে বাদ দিয়ে পরিবর্তন সম্ভব নয়। মনস্তত্ত্ব হচ্ছে মনের বিজ্ঞান। মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন আনতে হলে মনকে বিভিন্নভাবে জানতে হবে। এখানেই শারীরিক শিক্ষার সাথে মনস্তত্ত্ব তথা শিক্ষা, শিক্ষাগত মনস্তত্ত্বের সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষাগত মনোবিজ্ঞান শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদানের ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে।

৩. জীবতাত্ত্বিক ভিত্তি : জীববিজ্ঞান হলো জীবন এবং জীবিত প্রাণীর বিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানের তথ্যানুসারে এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে অন্যান্য প্রাণীর মতোই বিবর্তনের ফলে। বিবর্তনবাদের আলোকে প্রাণের জৈবিক ভিত্তি দৈহিক গঠন কাঠামো, শারীরিক সক্ষমতা, নারী-পুরুষের পার্থক্য, শারীরিক উন্নতি ইত্যাদি বিষয়গুলো শারীরিক শিক্ষার জীববৈজ্ঞানিক ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত।

কাজ–১ : শারীরিক শিক্ষার নীতিগুলো দলে দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা কর।

কাজ–২ : সমাজ বৈজ্ঞানিক নীতিটি আলোচনা কর।

কাজ–৩ : শারীরিক শিক্ষার ভিত্তিগুলো পোস্টারে লিখে আনো।

পাঠ–৫ : শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা, ব্যায়াম, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ও বিনোদনমূলক যে সমস্ত কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয় তাকে শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি বলে। একজন শারীরিক শিক্ষক যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করেন তাই শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত।

শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়–

১. অত্যাবশ্যকীয় কর্মসূচি (Compulsory Service Programme)

২. অন্তঃক্রীড়াসূচি (Intramural Sports)

৩. আন্তঃক্রীড়াসূচি (Extramural Sports)

১. অত্যাবশ্যকীয় কর্মসূচি (Compulsory Service Programme) : একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে সরকারি নির্দেশাবলি, শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক ক্লাস, প্রতিযোগিতা, সমাবেশ ও স্থানীয় নির্দেশনা ইত্যাদি সবই অত্যাবশ্যকীয় কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। এই কর্মসূচিগুলো একজন শারীরিক শিক্ষকের অবশ্যই পালন করতে হয়। সরকারি নির্দেশনাবলি বলতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক যে সমস্ত নির্দেশনা, যেমন– প্রাত্যহিক সমাবেশ করতে হবে, প্রতিদিন/ সপ্তাহে ৩টি ক্লাস নিতে হবে, আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে, জাতীয় দিবসগুলোতে খেলাধুলা করাতে হবে ইত্যাদিকে বুঝায়। স্থানীয় নির্দেশনা বলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিয়মকানুন সমূহকে বুঝিয়ে থাকে যেমন– স্কুল ক্যাম্পাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, বার্ষিক ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা, দৈহিক উন্নতির পরিমাপের পরীক্ষা নেওয়া, টিফিন প্রোগ্রাম পরিচালিত করা ইত্যাদি।

২. অন্তঃক্রীড়াসূচি (Intramural Sports) : ইন্ট্রামুরাল একটি ল্যাটিন শব্দ। Intra অর্থ ভিতরে এবং Muralis অর্থ দেয়াল। তাহলে পুরো অর্থ দাঁড়ায় দেয়ালের ভিতরে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের চারি দেয়ালের মধ্যে বা

নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আকারে যে সমস্ত খেলাধুলা হয় তাকে ইন্ট্রামুরাল স্পোর্টস বলা হয়। যেমন– বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, নবম শ্রেণি বনাম দশম শ্রেণি ক্রিকেট ম্যাচ, অথবা ষষ্ঠ শ্রেণি ক ও খ শাখার মধ্যে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। যদি হাউজ থাকে তাহলে হাউজে হাউজে যে প্রতিযোগিতা হয় তাও এর আওতায় পড়ে। এ ছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক বা বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বা ১ম বর্ষ বনাম ২য় বর্ষের মধ্যে যে সমস্ত প্রতিযোগিতা হয় সেগুলোও ইন্ট্রামুরাল স্পোর্টসের অন্তর্গত। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে যে খেলাধুলা বা প্রতিযোগিতা হয় তাকে ইন্ট্রামুরাল স্পোর্টস বলে।

৩. আন্তঃক্রীড়াসূচি (Extramural Sports) : Extra অর্থ বাইরে, Mural অর্থ দেয়াল অর্থাৎ দেয়ালের বাইরে যে সমস্ত খেলাধুলা হয় তাকে আন্তঃক্রীড়াসূচি (Extramural Sports) বলা হয়। যে সমস্ত খেলাধুলা বা প্রতিযোগিতা এক স্কুলের সাথে অন্য স্কুল, এক কলেজের সাথে অন্য কলেজের মধ্যে খেলা হয় তাকে আন্তঃক্রীড়া প্রতিযোগিতা বলা হয়। যেমন– আন্তঃস্কুল, আন্তঃকলেজ, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃক্লাব ইত্যাদি প্রতিযোগিতা বুঝায়। এ সমস্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজ দলের যোগ্যতা যাচাই করা যায়। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় বিভিন্নমানের খেলোয়াড়রা অংশগ্রহণ করে। ফলে ভালো খেলোয়াড়ের সাহচর্যে এসে তাদের আচার-ব্যবহার, উন্নতমানের কৌশল ইত্যাদি থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দলগত সমঝোতা ও উৎকর্ষ বাড়ে, প্রতিযোগিতার মনোভাব ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

কাজ–১ : শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচিগুলো গ্রুপ অনুসারে আলোচনা কর।

কাজ–২ : সার্ভিস প্রোগ্রাম বলতে কী বুঝ বোর্ডে লিখে দেখাও।

কাজ–৩ : ইন্ট্রামুরাল ও এক্সট্রামুরাল–স্পোর্টস এর পার্থক্যগুলো পোস্টারে লিখে ক্লাসে টাঙ্গিয়ে দাও।

পাঠ–৬ : বাংলাদেশের শারীরিক শিক্ষা : বাংলাদেশে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শারীরিক শিক্ষা বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আগে শারীরিক শিক্ষা বলতে শরীরসম্বন্ধীয় শিক্ষা বুঝানো হতো বর্তমানে শরীর ও মনের বিকাশ সম্পর্কিত শিক্ষাকে শারীরিক শিক্ষা বলে। বাংলাদেশে সরকারিভাবে ৬টি শারীরিক শিক্ষা কলেজ রয়েছে যা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে। বাংলাদেশে শারীরিক শিক্ষা বিভাগ বলে শিক্ষা ভবনে একটি বিভাগ রয়েছে যার প্রধান হলেন একজন উপ-পরিচালক। এই বিভাগের কাজ হলো–

প্রতি বছরে দুইবার জাতীয় স্কুলক্রীড়া প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা এবং মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা স্তরের শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকদের বছরে দুইবার রিফ্রেশার্স কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া। উপ-পরিচালক, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন ফেডারেশনের খেলাধুলা বিষয়ক যে সমঝোতা চুক্তি হয় তার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ২০০২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মধ্যে ভৌত অবকাঠামো, খেলাধুলার ব্যাপকতা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নের জন্য এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রতিটি জেলায় একজন করে জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আছেন। একজন জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রমকে উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণ করতে পারেন।

বাংলাদেশে পাঠ্যবই হিসেবে শারীরিক শিক্ষার অবস্থান ও কার্যক্রম নিম্নরূপ-

১. বাংলাদেশ সরকার 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' বিষয়টিকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক করেছে।

২. নবম ও দশম শ্রেণিতে ২০১৩ সাল থেকে 'শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা' বিষয়টি বাধ্যতামূলক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্কুলে শারীরিক শিক্ষার উপর পরীক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করায় শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে।

৩. শারীরিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যে বিষয়টির প্রতি বেশি নজর দেওয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন এবং তাদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। এই ক্ষেত্রে প্রাইমারি স্কুলে শারীরিক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

কাজ–১ : বাংলাদেশের শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে তোমার ধারণা বর্ণনা কর।

কাজ–২ : বাংলাদেশে শারীরিক শিক্ষার উপরে যে যে কার্যক্রম আছে তা লিখ।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

১.১ শারীরিক শিক্ষার লক্ষ্য–

ক. শিশুকে বেঁচে থাকার জন্য সুস্থভাবে গড়ে তোলা

খ. শিশুকে সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া

গ. ভালো নম্বর পাওয়া

ঘ. শিশুকে শারীরিক শিক্ষা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা

১.২ আন্তঃস্কুল ক্রীড়া বলতে কী বুঝায়?

ক. শরীর সম্বন্ধীয় খেলা
খ. অন্য বিদ্যালয়ের সাথে খেলা
গ. বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলা
ঘ. শুধু মেয়েদের মধ্যে খেলা

১.৩ খেলাধুলা করলে–

ক. শরীর ও মন সতেজ হয়।
খ. মন খারাপ হয়।
গ. হাত পা ব্যথা করে।
ঘ. ঘুম আসে

১.৪ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যে খেলাধুলা উন্নয়নের লক্ষ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় কোন সালে?

ক. ২০০৫ সালে খ. ২০০১ সালে

গ. ২০০৩ সালে ঘ. ২০০২ সালে

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. শারীরিক শিক্ষা দেহ ও মনের.............উন্নয়ন সাধন করে।

খ. শারীরিক শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার..............আসে না।

গ. আমাদের দেহ কতকগুলো............সমষ্টি।

ঘ. শারীরিক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা একে অপরের.............।

ঙ. শিশুর সৃজনশীল প্রতিভার...........ঘটানো।

৩. বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলোর মিল কর।

ক. শারীরিক শিক্ষা	ক. আন্তঃস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
খ. দর্শন নীতি	খ. সার্ভিস প্রোগ্রাম
গ. প্রাত্যহিক সমাবেশ	গ. দেহ ও মনের সার্বিক উন্নতি করা
ঘ. এক্সট্রামুরাল স্পোর্টস	ঘ. প্রকৃতি বাদ

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও–

ক. শারীরিক শিক্ষা কাকে বলে?

খ. জীবতাত্ত্বিক ভিত্তি বলতে কী বুঝায়?

গ. ইন্ট্রামুরাল স্পোর্টস কাকে বলে?

ঘ. জীব বল বিস্তার নীতি কাকে বলে?

৫. রচনামূলক প্রশ্ন

ক. 'সুস্থ দেহে সুন্দর মন' উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

খ. শারীরিক শিক্ষার নীতি কত প্রকার ও কী কী?

গ. শারীরিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর।

ঘ. শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শারীরিক সক্ষমতা

শারীরিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হলো শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করা। তাই শারীরিক সক্ষমতার বৈশিষ্ট্য, খেলাধুলার সাথে এর সম্পর্ক, শারীরিক সক্ষমতার মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে শারীরিক শিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। ব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক সক্ষমতা কীভাবে অর্জন করা যায়, লিঙ্গভেদে ব্যায়ামের ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারবে। শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, দম, গতি ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তার গুরুত্ব এবং কোন খেলায় কোনটির ভূমিকা বেশি তা জানতে পারবে। শারীরিক সক্ষমতার মাধ্যমে সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে সক্ষম হবে।

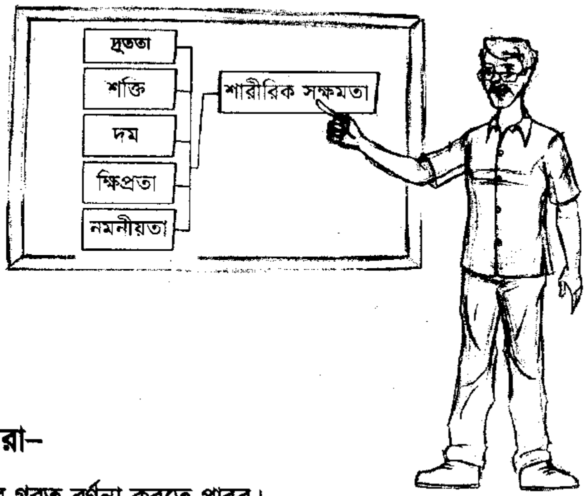

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- দৈহিক সুস্থতার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়ামের ইতিবাচক দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে বয়স ও লিঙ্গভেদে কোন খেলায় কোন কোন ব্যায়াম উপযোগী তা বর্ণনা করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, গতি, দম, ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে কোন খেলায় কোন ব্যায়াম উপযোগী সঠিক নিয়ম কানুন মেনে তা লিঙ্গভেদে অনুশীলন করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, গতি, দম, ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়াম সঠিক নিয়মে করতে পারব।
- শারীরিক সক্ষমতার মাধ্যমে সুস্থ ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হব।

পাঠ-১ : শারীরিক সক্ষমতা ও এর গুরুত্ব : সাধারণ অর্থে সক্ষমতা হলো কোনো কাজ করার সামর্থ্য। বৃহত্তর অর্থে সক্ষমতা বলতে জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষা করে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ধারণ করার সামর্থ্যকে বুঝায়। এর মধ্যে ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দিকের সামর্থ্য অন্তর্ভুক্ত। তাই মনে করা হয় যে, সক্ষমতা একটি সামগ্রিক ধারণা। সক্ষমব্যক্তি শারীরিক সুস্থতার সাথে সাথে মানসিক সুস্থতা, আবেগীয় ভারসাম্য ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সমর্থ হন। শারীরিক সক্ষমতার এই সামগ্রিক ধারণা ব্যাখ্যা করার জন্য AAHPER (American Association of Health, Physical Education and Recreation) এর পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ক. বংশগতি অনুযায়ী শারীরিক স্বাস্থ্য।

খ. দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং বিপদকালীন অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি, দম, সমন্বয় ক্ষমতা ও কৌশল।

গ. প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের প্রতি যথাযথ মনোযোগ ও মূল্যবোধ।

ঘ. আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতা থেকে চাপমুক্ত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আবেগিক সাম্য।

ঙ. দলের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং সমাজ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক চেতনা।

চ. চলার পথে উদ্ভূত সমস্যাবলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বৃদ্ধি ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা।

ছ. গণতান্ত্রিক দেশের দায়িত্বশীল নাগরিকের কর্তব্য পালনের জন্য আবশ্যিক নৈতিকতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা।

সুতরাং সক্ষমতা বলতে ব্যক্তির সামগ্রিক সামর্থ্যকে বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সক্ষমতা মানুষের ব্যক্তি সামগ্রিকতা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সামগ্রিক সক্ষমতার বিভিন্ন দিকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাস্তব, প্রয়োজনীয় এবং প্রাথমিক দিক হলো শারীরিক সক্ষমতা। সক্ষমতার এই দিক জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যক। শারীরিক সক্ষমতা হলো শারীরিক কাজকর্ম করার সামর্থ্য। সুতরাং দৈহিক কাজের ভিন্নতা অনুসারে শারীরিক সক্ষমতারও স্বরূপ বদলায়। সেজন্য সাধারণ জীবনের হাঁটা, চলা, বসা ও অন্যান্য কাজের জন্য শারীরিক সক্ষমতা এবং একজন খেলোয়াড়ের শারীরিক সক্ষমতা এক নয়। কাজের ধরনের উপর শারীরিক সক্ষমতার ধরনও ভিন্ন। শারীরিক সক্ষমতার সংজ্ঞা হিসেবে ক্লার্ক বলেছেন— " The ability to carry out everyday task with vigour and alertness, without undue fatigue and with ample energy to enjoy leisure time pursuits and to meet unforeseen emergencies". ক্লান্ত না হয়ে শক্তি ও সচেতনার সাথে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করা, আনন্দ ও উৎসাহের সাথে অবসর সময় কাটানো এবং সংকট মোকাবেলার সামর্থ্য হলো শারীরিক সক্ষমতা। অনেকের মতে যন্ত্রনির্ভর আধুনিক জীবনে কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পাওয়ায় শারীরিক সক্ষমতার উপরোক্ত সংজ্ঞা বর্তমানে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়। শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজনীয় দিকগুলো হলো শারীরবৃত্তীয় অঙ্গ ও তন্ত্রসমূহের কার্যক্ষমতা, নতুন পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার সামর্থ্য ইত্যাদি।

শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব : একজন শিক্ষার্থী/ব্যক্তি শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করলে দৈনন্দিন জীবনের সব প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হবে। যেমন–

১. যে কোনো শারীরিক কার্যক্রম অনায়াসে করতে পারবে।

২. দৈব-দুর্ঘটনা মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে।

৩. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৪. শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করলে মন ভালো থাকে ফলে লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে পারবে।

৫. যে কোনো ধরনের খেলাধুলায় পারদর্শিতা অর্জন করতে পারবে।

কাজ–১ : শারীরিক সক্ষমতা বলতে তুমি কী বুঝ? তা পোস্টার আকারে লিখে দেখাও।

কাজ–২ : গ্রুপ ভাগ করে শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব আলোচনা কর।

পাঠ–২ : ক্রীড়াভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম : ক্রীড়াভেদে ব্যায়ামের ভিন্নতা রয়েছে। সব খেলার জন্য এক ধরনের ব্যায়ামের প্রয়োজন হয় না। কোনো খেলায় হাতের শক্তির প্রয়োজন আবার কোনো খেলায় পায়ের শক্তির বেশি প্রয়োজন হয়। খেলার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যায়াম করা হলে ঐ খেলায় ভালো ফল আশা করা যায়। যেমন–

ফুটবল : ফুটবল খেলায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় শক্তি, দম ও ক্ষিপ্রতা। সুতরাং যারা ফুটবল খেলবে তাদেরকে শক্তি ও দম বাড়ানোর ব্যায়াম বেশি করে করতে হবে।

সাঁতার : যারা সাঁতারু তাদের হাত, পা-এর শক্তি ও দম বাড়ানোর ব্যায়াম বেশি করে করতে হবে।

বাস্কেটবল : যে সমস্ত শিক্ষার্থী বা খেলোয়াড় বাস্কেটবল খেলায় অংশগ্রহণ করবে তাদেরকে দম, ক্ষিপ্রতা ও পায়ের শক্তি বাড়ানোর ব্যায়ামের উপর জোর দিতে হবে।

ভলিবল : ভলিবল খেলোয়াড়দের হাতের শক্তি একটু ভালো হলে স্ম্যাশ করতে সুবিধে হয়। সেজন্য হাতের শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম করা উচিত।

হ্যান্ডবল : হ্যান্ডবল খেলোয়াড়দের হাত, পা ও ক্ষিপ্রতার বেশি প্রয়োজন হয়। সেজন্য হাত ও পায়ের শক্তিবৃদ্ধির ব্যায়াম এবং ক্ষিপ্রতা বাড়ানোর ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

কাবাডি : কাবাডি খেলাকে আমরা বলি শক্তির খেলা। শুধু শক্তি হলেই কোনো খেলায় ভালো করা যায় না। কাবাডি খেলায় হাতের শক্তি ও ক্ষিপ্রতার বেশি প্রয়োজন। কোন খেলায় কী ধরনের শারীরিক সক্ষমতা প্রয়োজন, নিম্নে একটি চার্টের মাধ্যমে তা দেখানো হলো।

খেলা	দম	ক্ষিপ্রতা	শক্তি			কত বয়স পর্যন্ত
			পা	তলপেট	হাত ও বাহু	
ফুটবল	বে	বে	বে	ম	বে	৩৫ বছর পর্যন্ত
ক্রিকেট	ম	ম	বে	ম	বে	৪০ বছর পর্যন্ত
হ্যান্ডবল	ম	বে	বে	ম	বে	সব বয়সের জন্য
ভলিবল	ক	ম	ম	ম	বে	৩০ বছর পর্যন্ত
হকি	বে	বে	বে	ম	বে	৩০ বছর পর্যন্ত
বাস্কেটবল	বে	বে	বে	ক	ক	৩০ বছর পর্যন্ত
সাঁতার	বে	ম	বে	ম	বে	৩০ বছর পর্যন্ত
স্প্রিন্ট	ম	ম	বে	ম	বে	৪০ বছর পর্যন্ত
দূরপাল্লার দৌড়	বে	ক	বে	ম	ম	৪০ বছর পর্যন্ত
কাবাডি	ম	বে	বে	ম	বে	৩৫ বছর পর্যন্ত
ব্যাডমিন্টন	বে	বে	বে	ম	ম	৪৫ বছর পর্যন্ত

বে= বেশি প্রয়োজন, ম= মধ্যম প্রয়োজন, ক= কম প্রয়োজন

কাজ–১ : একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের কী ধরনের শারীরিক যোগ্যতা দরকার তা বল।

কাজ–২ : একজন স্প্রিন্টার ও একজন দূরপাল্লার দৌড়বিদের শারীরিক যোগ্যতার পার্থক্য লিখে বোর্ডে উপস্থাপন কর।

পাঠ–৩ : বয়স ও লিঙ্গভেদে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে ব্যায়াম।

বয়সভেদে : শারীরিক শিক্ষা সকল বয়সের লোকদের জন্য প্রযোজ্য। তবে বয়স ভেদে শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম ভিন্নতর হয়ে থাকে। শুধু ব্যায়ামই নয় খাবার, পছন্দ-অপছন্দ, শারীরিক ক্ষমতা ইত্যাদিও ভিন্নতর হয়। যেমন–

শিশুদের শারীরিক সক্ষমতা বড়দের মতো নয়। তাই তাদের সক্ষমতা অর্জনের জন্য 'খেলার ছলে ব্যায়াম' এই কথা মাথায় রেখে ব্যায়াম তথা খেলাধুলা নির্বাচন করতে হবে। যেমন ব্যাঙের মতো লাফাও, দৌড়ে ঐ দেয়াল ছুঁয়ে আস, কাকের মতো লাফাও বা অন্য কোনো চিত্ত বিনোদনমূলক খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করাতে হবে। কিশোরদের জন্য কিছুটা নিয়মতান্ত্রিক ব্যায়াম ও খেলাধুলা নির্বাচন করতে হবে। এক লাইনে দাঁড়ানো, হাত বা পায়ের ব্যায়াম করা। বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করা, ছোঁয়াছুঁয়ি খেলা এই জাতীয় ব্যায়াম বা খেলা নির্বাচন করে শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তবে শিশু ও কিশোরদের ভারোত্তোলন জাতীয় কোনো কঠিন ব্যায়াম করানো যাবে না। এতে শরীরের উন্নতির চেয়ে অবনতি হবে। যুবকদের জন্য সময় ও ব্যায়াম নির্বাচন করে নিয়মমাফিক অনুশীলন করাতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খেলার সঠিক কৌশল এখান থেকে জানতে পারবে এবং ভবিষ্যত খেলাধুলার ভিত গড়ে উঠবে। লক্ষ রাখতে হবে অতিরিক্ত ব্যায়ামের ফলে শিক্ষার্থী যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে না পড়ে। কোনো অঙ্গের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়াম বাছাই করে অনুশীলন করতে হবে। এভাবে শারীরিক সক্ষমতা অর্জন করাতে হবে।

বয়স্কদের জন্য হালকা ব্যায়াম যেমন– হাঁটা, জগিং, আস্তে আস্তে দৌড়, এভাবে ব্যায়াম নির্বাচন করে শারীরিক সক্ষমতা ধরে রাখতে হবে।

লিঙ্গভেদে : শারীরিক শিক্ষা সকলের জন্য সমান হলেও বাস্তবে কতটুকু তা প্রয়োগ করা যায় এটাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। শারীরিক শিক্ষা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক হলেও শিশু বয়সে ছেলে ও মেয়েদের খেলাধুলা ও ব্যায়াম পৃথক করা যায় না। শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রেও তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। শিশুদের জন্য শারীরিক কার্যক্রম তৈরির ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক খেলাধুলা, অনুকরণমূলক হাঁটা, লাফ ও দৌড়াদৌড়ি ইত্যাদির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। শিশুদের শারীরিক গঠনে ও শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম তৈরি করা উচিত, যাতে শিশু মনের বিকাশ সাধনও হয়। কিশোর বয়সে অর্থাৎ ৭–১২ বছর বয়সে ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। মেয়েরা তখন ভারী কোনো খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করে না। ছেলেরা দলগত খেলার দিকে ঝুঁকে পড়ে বেশি তবে ব্যক্তিগত খেলাধুলায় ছেলেমেয়ে উভয়েই অংশগ্রহণ করে থাকে। যেমন– ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, দৌড় ইত্যাদি। এ সময় থেকেই ছেলেমেয়েদের শারীরিক সক্ষমতার জন্য শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচি পৃথক করতে হয়।

যৌবনপ্রাপ্তির সাথে সাথে ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ কারণে তাদের কার্যক্রম ভিন্নতর হতে থাকে। ছেলেরা দলগত খেলার সাথে সাথে অ্যাথলেটিকস, সাঁতার ইত্যাদি খেলা পছন্দ করে। ছেলেরা

সাহসিকতা ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে দ্বিধা করে না। মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের ফলে আচরণে সংকোচ ও লজ্জাভাব দেখা যায়। সেজন্য শারীরিক শিক্ষার কার্যক্রম আলাদা হয়ে থাকে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিযোগিতা হয় যেমন– সাঁতার, অ্যাথলেটিকস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস প্রভৃতি ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে করা হয়। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শারীরিক শক্তি ও সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে বড় ধরনের পার্থক্য থাকায় শারীরিক কার্যক্রম ভিন্ন হয়। সুতরাং লিঙ্গভেদে শিশু পর্যায়ে পার্থক্য করা না গেলেও বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কাজ–১ : বয়সভেদে শিশু ও কিশোরদের শারীরিক কার্যক্রমের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
কাজ–২ : যৌবনকালে মেয়েদের শারীরিক কার্যক্রম কেন পৃথক করা হয় উপস্থাপন কর।

পাঠ–৪ : শারীরিক সক্ষমতায় ব্যায়ামের প্রভাব : শারীরিক সক্ষমতার জন্য ব্যায়াম অপরিহার্য। ব্যায়াম না করলে কখনও শারীরিক সক্ষমতা অর্জন সম্ভব নয়। সেজন্য সব বয়সের লোকদের নিয়ম মোতাবেক নির্দিষ্ট ব্যায়াম করা প্রয়োজন। ব্যায়ামের প্রভাবে শরীরের ভিতর বিভিন্ন রকম পরিবর্তন হয় যা শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ব্যায়ামের প্রভাবে শরীরের ভিতর যে পরিবর্তন হয় তা এখানে তুলে ধরা হলো–

১. হৃৎপিণ্ডের (Heart) পেশি শক্তিশালী হয় : খেলাধুলা বা ব্যায়াম করলে শরীরের রক্ত চলাচল বেড়ে যায় ফলে হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে হৃৎপিণ্ডের পেশি শক্তিশালী, হৃৎপিণ্ড বড় ও নীরোগ হয়। এরূপ হার্টকে ''অ্যাথলেটিক হার্ট'' বলে।

২. হৃৎপিণ্ডে রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা বাড়ে : একজন সাধারণ লোকের হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিট ১৩০ মিলিলিটার রক্ত পাম্প করে। খেলাধুলা বা ব্যায়াম করার সময় রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে হৃৎপিণ্ডের পাম্প করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। এতে হৃৎপিণ্ড সবল ও কর্মক্ষম হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৩. পাল্‌স রেট (Pulse rate) বৃদ্ধি পায় : একজন সাধারণ লোক পরিশ্রম করলে তার পাল্‌স রেট বেড়ে যায়। পুনরায় স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগে। ফলে ক্লান্তি সহজে দূর হয় না। অপর দিকে একজন ভালো খেলোয়াড় যখন খেলাধুলা বা ব্যায়াম করে তখন তার পালস রেট বেশি বাড়ে না এবং দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসে। ফলে তার ক্লান্তি তাড়াতাড়ি দূর হয়।

৪. রক্ত চলাচল বাড়ে : খেলাধুলা বা ব্যায়াম করলে শরীরের রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। ফলে সাধারণ লোকের চেয়ে মাংসপেশি, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি ও মজবুত হয়।

৫. রক্ত কণিকা : রক্তে তিন ধরনের কণিকা থাকে–

ক. লোহিত কণিকা খ. শ্বেত কণিকা গ. অনুচক্রিকা

ক. লোহিত কণিকা : শরীরের লোহিত কণিকার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। পুরুষদেহে এক ঘন মিলিলিটার রক্তে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ এবং মহিলাদের রক্তে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোহিত কণিকা থাকে। এটি অস্থি মজ্জায় উৎপন্ন হয় ও ১২০ দিন পর প্লীহায় বিনষ্ট হয়। ব্যায়াম করলে লোহিত কণিকার সংখ্যাও বেড়ে যায় ও বেশি দিন বাঁচে। এটি হিমোগ্লোবিনের সহায়তায় দেহের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং শরীরের সমস্ত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. শ্বেত কণিকা : আমাদের শরীরে শ্বেত কণিকার সংখ্যা অনেক কম। এক মিলিলিটার রক্তে ছয় থেকে আট হাজার শ্বেত কণিকা থাকে। এরা বর্ণহীন ও নিউক্লিয়াসযুক্ত। এরা সাধারণত ১২–১৩ দিন বেঁচে থাকে।

ব্যায়াম করলে এরা বেশিদিন বাঁচে ও সংখ্যা বেড়ে যায়। শ্বেতকণিকা রক্তে প্রবেশকারী শত্রুকে ঘিরে ধরে বিনষ্ট করে দেহকে রক্ষা করে। ফলে শারীরিক সক্ষমতা মজবুত ও শক্তিশালী হয়।

গ. **অনুচক্রিকা** : অনুচক্রিকা দেখতে ডিম্বাকার ও বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট অনেকটা ডিস্কের মতো দেখতে। দেহের বৃহদাকার কোষ ভেঙ্গে অনুচক্রিকা সৃষ্টি হয়। দেহের কোনো স্থানে ক্ষত হলে সেখানে ৩ মিনিটের মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে।

৬. শ্বাস প্রশ্বাস (Respiration) : খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার সময় ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করতে হয়। ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ ও প্রশ্বাসের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যায়। ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাসের ফলে বুকের গভীরতাও বৃদ্ধি পায়। ফলে শারীরিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

৭. মাংসপেশি (Muscle) : শরীরে বিভিন্ন ধরনের মাংসপেশি থাকে। খেলাধুলা ও ব্যায়ামের ফলে মাংসপেশি সংখ্যায় বাড়ে না তবে আকৃতিতে বড় হয়, টিস্যুগুলো মোটা ও শক্তিশালী হয়। ফলে শারীরিক সক্ষমতাও অনেক বেড়ে যায়। ব্যায়ামের ফলে শরীরের যে বিভিন্ন পরিবর্তন বা বৃদ্ধি ঘটে তা শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে।

কাজ–১ : ব্যায়ামের ফলে হৃৎপিণ্ডের যে পরিবর্তন ঘটে তা পোস্টার পেপারে লিখে দেয়ালে লাগাও।

কাজ–২ : লোহিত কণিকা ও শ্বেত কণিকার ব্যায়ামের ফলে কী পরিবর্তন হয় তা বিশ্লেষণ কর।

পাঠ–৫ : শারীরিক সক্ষমতা অর্জনে শক্তি, দম, ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধির ব্যায়াম : ব্যায়াম করার আগে প্রত্যেকের নিজ দেহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে এই জ্ঞান আরও জরুরি। প্রত্যেকেরই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ ও তন্ত্রগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকলে অঙ্গের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট ব্যায়াম বেছে অনুশীলন করা যায়। মাংসপেশির গতি সঞ্চালনের জন্য পাঁচ ধরনের ব্যায়ামের দ্বারা শরীরকে উপযুক্ত করে গঠন করা যায়। কেবল তখনই শারীরিক সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি। যেমন–

১. দ্রুততা ২. শক্তি ৩. ক্ষিপ্রতা ৪. দম ৫. নমনীয়তা

১. দ্রুততা (Speed) : দ্রুততা বলতে গতির দ্রুততা বুঝায়। যে যত বেশি দ্রুততার সাথে যেতে পারে তার গতি বেশি বলে ধরা হয়। দ্রুততা বৃদ্ধির জন্য পায়ের মাংসপেশির শক্তি বাড়ানোর ব্যায়াম করা প্রয়োজন। যেমন–

ক. চিত হয়ে শুয়ে পায়ের পাতার উপর ভার নিয়ে পা উপরে উঠানামা করাতে হবে।

খ. জিমনেশিয়ামে পা দ্বারা লোহার ভারকে ঠেলে ভিতরে বাইরে নিতে হবে।

গ. ২৫ মিটার, ৫০ মিটার দৌড় বারবার অনুশীলন করতে হবে।

ঘ. রানিং স্ট্যান্ডের উপর দাঁড়িয়ে দৌড় অনুশীলন করতে হবে।

ঙ. বালুর মধ্যে কিছুক্ষণ দৌড়ালেও মাংসপেশি সবল হয়।

এভাবে অনুশীলন করলে পায়ের মাংসপেশি সবল ও বৃদ্ধি পায়। ফলে তার দ্রুততা বৃদ্ধি পাবে।

২. শক্তি (Strength) : শক্তি বলতে হাতের মাংসপেশির উন্নতির মাধ্যমে হাতের শক্তি বৃদ্ধি করাকে বুঝায়। নিচে হাতের শক্তি বৃদ্ধি করার কয়েকটি ব্যায়াম উল্লেখ করা হলো–

ক. ডাম্বেল হাত দিয়ে ধরে উপরে উঠানো ও নামানো।

খ. চিত হয়ে শুয়ে ভার উপরে তোলা ও নামানো।

গ. মাটিতে দু'হাত কাঁধ বরাবর ফাঁক রেখে পুশ আপ। আস্তে আস্তে এক পা উপরের দিকে তুলে পুশ আপ।

ঘ. মেডিসিন বল ছোড়া।

ঙ. মাল্টি জিমে বিভিন্ন প্রকার হাতের ব্যায়াম করা।

উল্লিখিত ব্যায়ামগুলো প্রশিক্ষকের নির্দেশে নিয়ম মাফিক করলে হাত ও কাঁধের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৩. ক্ষিপ্রতা (Agility) : শরীরের ভারসাম্য রেখে অল্প জায়গার মধ্যে কে কত দ্রুততার সাথে কাজ করতে পারে তাকেই ক্ষিপ্রতা বলে।

ক. দ্রুত দৌড়ে যাওয়া ও বাঁশির সংকেতে থামা।

খ. ১০ মিটার দৌড় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে দৌড় দিয়ে দাগ ছুঁয়ে আসা ও যাওয়া। এভাবে সময় ধরে দৌড় অনুশীলন করতে হবে।

গ. ২০ মিটার দৌড়ের সময় দুই মিনিট নির্ধারণ করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে কে কতবার দৌড়াতে পারে তা জেনে যে ভালো করেছে সে বিজয়ী হবে। এভাবে পায়ের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

৪. নমনীয়তা (Flexibility) : শরীরের নমনীয়তা বৃদ্ধি করার জন্য এই শারীরিক ব্যায়ামগুলো করতে হবে, যেমন–

ক. একটি উঁচু বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে পা সোজা রেখে শরীর বাঁকিয়ে দু'হাত কানের সাথে রেখে আস্তে আস্তে সামনের দিকে শরীর ঝুঁকাতে হবে। যার শরীর যত বেশি ঝুঁকবে তার নমনীয়তা বেশি।

খ. চিত হয়ে শুয়ে দুই কানের কাছে দুই হাত রেখে হাঁটু ভাঁজ করে শরীর উপরের দিকে তোলা ও নামানো। একে আর্চিং বলা হয়।

গ. মাটিতে বসে দু'পা সামনে সোজা করে রেখে দু'হাত কানের সাথে লাগিয়ে পায়ের আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করা।

৫. দম (Endurance) : সব খেলার জন্য দম প্রয়োজন। তবে ফুটবল, লম্বা দূরত্বের দৌড়, ম্যারাথন, বাস্কেটবল এ খেলাগুলোতে দম সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। দম বাড়ানোর ব্যায়াম হলো–

ক. আস্তে আস্তে দৌড়, তবে বেশি সময় ধরে দৌড়াতে হবে।

খ. উঁচু-নিচু জায়গা দিয়ে বা অসমতল জায়গা দিয়ে দৌড়াতে হবে।

গ. প্রথম দিন ১ কিলোমিটার, পরের দিন ১$\frac{১}{২}$ কিলোমিটার, তার পরের দিন ২ কিলোমিটার, এভাবে দূরত্ব বাড়িয়ে দৌড়াতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থী যদি এই ৫টি গুণ অর্জন করতে পারে তাহলে তার শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, কাজে কর্মে উৎসাহ ও পড়াশোনায় মন বসবে।

কাজ–১ : শক্তি বাড়ানোর ব্যায়ামগুলো পোস্টার পেপারে লিখে টাঙিয়ে দাও।

কাজ–২ : দম বাড়ানোর ব্যায়ামগুলো ধারাবাহিক বোর্ডে লিখে ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

১.১ ১০০ মিটার দৌড়ের জন্য কোন অঙ্গের শক্তি বাড়ানোর বেশি প্রয়োজন?

ক. হাতের	খ. পায়ের মাংসপেশির

গ. বুকের	ঘ. কোমরের

১.২ কোন ধরনের খেলোয়াড়ের দমের বেশি প্রয়োজন হয়?

ক. স্বল্প পাল্লা দৌড়বিদের	খ. নিক্ষেপকারীর

গ. জাম্পারের	ঘ. দূর পাল্লার দৌড়বিদের

১.৩ ব্যায়ামের সময় হার্ট বিট কি বাড়ে?

ক. বাড়ে	খ. বাড়ে না

গ. ঠিক থাকে	ঘ. কমে

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে..............জীবন যাপনে সক্ষম হব।

খ. ক্রীড়াভেদে ব্যায়ামের.............রয়েছে।

গ. খেলাধুলা বা ব্যায়াম করলে শরীরের............বেড়ে যায়, হৃৎপিণ্ডের.......... বৃদ্ধি পায়। কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে হৃৎপিণ্ড বড় ও নীরোগ হয় সেজন্য এরূপ হার্টকে ....হার্ট বলে।

৩. বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের শব্দগুলোর মিল কর।

ক. অ্যাথলেটিক হার্ট	ক. হাতের শক্তি
খ. মেডিসিন বল ছোড়া	খ. লোহিত কণা
গ. অনুচক্রিকা	গ. হৃৎপিণ্ড
ঘ. দম	ঘ. দূরপাল্লার দৌড়বিদ

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও–

ক. শারীরিক সক্ষমতা কাকে বলে?

খ. লিঙ্গাভেদে কী ধরনের ব্যায়াম করা উচিত?

গ. নিয়মিত ব্যায়াম করলে কী ফল পাওয়া যায়?

৫. রচনামূলক প্রশ্ন

ক. ব্যায়ামের প্রভাবে শারীরিক কী পরিবর্তন হয় তা বর্ণনা কর।

খ. শারীরিক সক্ষমতার গুরুত্ব আলোচনা কর।

গ. শক্তি ও দমের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

ঘ. কোন খেলায় কোন ধরনের শক্তির বেশি প্রয়োজন তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

তৃতীয় অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য ও অবসাদ

মানসিক স্বাস্থ্য ও অবসাদ সম্পর্কে আলোচনার আগে স্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি তা জানা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক সুস্থতা বা শরীরের নীরোগ অবস্থাকে বুঝি। ব্যাপক অর্থে শারীরিক সুস্থতার সাথে মানসিক সুস্থতারও প্রয়োজন। মানসিক সুস্থতা শারীরিক সুস্থতার উপর নির্ভরশীল। যে কোনো কাজে আমরা নিযুক্ত থাকি না কেন শরীর সুস্থ না থাকলে কিছুই ভালো লাগে না, কাজে উৎসাহ থাকে না, কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশের সাথে সঙ্গতি বিধানের মাধ্যমে মানসিক সুস্থতা বজায় থাকে। অতএব, যে ব্যক্তি নিজের চাহিদা ও পরিবেশের মধ্যে সাফল্যের সাথে সঙ্গতি বিধান করতে পারে, সেই মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ। একজন মানুষের ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ সামঞ্জস্যমূলক শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াকলাপকে ঐ ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য হিসেবে অভিহিত করা যায়। অতিরিক্ত কাজ বা পরিশ্রমের চাপে একজন সাধারণ মানুষ বা সাধারণ খেলোয়াড়ের কর্মক্ষমতা সাময়িকভাবে হ্রাস পায়। আবার দীর্ঘক্ষণ একই কাজ করার ফলে সেই কাজের প্রতি মানুষের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে ব্যক্তির কর্মক্ষমতার অবনতি হয়। ব্যক্তির মানসিক ও শারীরিক অবস্থার এই পরিবর্তনকেই ক্লান্তি বা অবসাদ বলা হয়।

মানসিক সুস্থ ও অবসাদগ্রস্থ ছেলেমেয়ে

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- স্বাস্থ্যকর জীবনের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানসিক আচরণের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- অবস্থাভেদে মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মানসিক অস্থিরতা দূর করার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অবসাদের ধারণা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অবসাদগ্রস্ত হওয়ার কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অবসাদ দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- অবসাদগ্রস্ততা দূর করে সুস্থ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে পারব।

পাঠ–১ : মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার্থীর জীবনে এর ভূমিকা– এই অধ্যায়ের শুরুতেই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। সাধারণভাবে মানসিক স্বাস্থ্য বলতে– "Full and harmonious functioning of the whole personality"-কে বুঝায়। খেলাধুলা যেমন আমাদের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখে, তেমনিভাবে মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের দেহ ও মনের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে। দেহের কোনো অঙ্গের ক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে যেমন দৈহিক অসুস্থতা দেখা দেয়, তেমনি মানসিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে না হলে মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয়। ক্রীড়াক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জীবনে প্রতিযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এই মানসিক অসুস্থতা প্রত্যক্ষ করা যায়। খেলাধুলা শুধুমাত্র শারীরিক কসরত নয়, এর সাথে আনন্দ ও পরাজয়ের বেদনাও জড়িত থাকে। তবে যেহেতু একজন ক্রীড়াবিদ শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে, সেজন্য তাকে মানসিকভাবেও সুস্থ থাকতে হয়। কারণ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা একে অপরের পরিপূরক। একজন শিক্ষার্থী কোনো খেলায় জয়লাভ করলে আনন্দিত হয়, পরবর্তীতে আরও ভালো করার জন্য তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে। আর তার এই সাফল্য ধরে রাখার জন্য সে প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহী হয়ে বেশি বেশি সময় ব্যয় করে এবং পরিশ্রমী হয়। তবে এরূপ জয়ের ফলে তার মধ্যে নেতিবাচক মনোভাবও গড়ে উঠতে পারে। যেমন– প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, নিজকে বড় করে দেখা কিংবা অপরের দক্ষতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতার সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং খেলোয়াড়দের বিজয়ী মানসিকতার ভালো বা খারাপ দু'ধরনের ফলাফল আসতে পারে।

আবার পরাজিত হলে হতাশার সৃষ্টি, অন্যের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা হতে পারে। অনেকে হতাশায় মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে খেলাধুলা ছেড়ে দিতে পারে। জয়-পরাজয়ের এই স্বাভাবিক ঘটনাকে সহজভাবে নিতে না পারলে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় এবং তার কর্মকাণ্ডে নানা রকম অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে ক্রীড়া শিক্ষক বা প্রশিক্ষকদের বিজয়ী বা বিজিত খেলোয়াড়দের সাথে একত্রে কাজ করে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বা মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার সর্বাত্মক চেষ্টার প্রয়োজন হয়।

কাজ–১ : শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলে তা মনের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে শিক্ষার্থীদের একটি দল ধারাবাহিকভাবে বোর্ডে লিখবে এবং দৈহিক অসুস্থতার কারণে মন ভালো থাকে না। এর কারণগুলো আরেকটি দল বোর্ডে লিখবে। অতঃপর আলোচনা করবে। আলোচনায় কোনো ভুল হলে শিক্ষক সংশোধন করবেন।

কাজ–২ : খেলাধুলায় জয়ী বা পরাজিত হলে একজন খেলোয়াড়ের যে মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় এবং কীভাবে তা একজন ক্রীড়াবিদকে প্রভাবিত করে– শিক্ষার্থী বাড়ি থেকে লিখে আনবে এবং শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে।

পাঠ–২ : মানসিক আচরণ, এর প্রকারভেদ এবং মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের উপায়– মানব প্রকৃতি বড় জটিল। মানুষের এই প্রকৃতি তথা আচরণ এভাবে বর্ণনা করা যায় যে, সৃষ্টির আদি যুগ থেকে ক্রমান্বয় বিকাশের ফলে মানুষ বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব Theory of Evolution) অনুযায়ী নিম্ন পর্যায়ের জীব থেকে উন্নত জীব হিসাবে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হতে মানুষের বহু যুগ অতিক্রম করতে হয়েছে। এই যুগ পরিক্রমকালে মানুষ ক্রমাগত তার পূর্বপুরুষদের অনেক বৈশিষ্ট্য ও প্রেষণা ধারণ করে কাল অতিক্রম করেছে। ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী এককোষী জীব থেকে

প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফলে প্রথমে জলচর প্রাণী, তারপর লাঙ্গুলযুক্ত প্রাণী সর্বশেষে মনুষ্য আকৃতি প্রাপ্তি হচ্ছে বিবর্তনের ফল। মনুষ্য আকৃতি লাভের পর মানুষ জীবতাত্ত্বিকভাবে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এই ধাপগুলো হচ্ছে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব। বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়ে শারীরিক পরিবর্তনকালে প্রতিটি মানুষ একটি সুনির্দিষ্ট আচরণের ধরন দ্বারা প্রভাবিত হয়। এক সময়ে এই আচরণ কেবলমাত্র ভৌত-রাসায়নিক কার্যসাধনের বন্দোবস্ত দ্বারা যেমন প্রভাবিত হয়, তেমনি অন্যদিকে ট্রপিজম (Tropism) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ট্রপিজম হচ্ছে নিম্নশ্রেণির প্রাণী এবং উদ্ভিদের সরলতম অভিযোজনমূলক প্যাটার্ন প্রতিক্রিয়া। এ ধরনের আচরণ ভৌত এবং রাসায়নিক উদ্দীপকের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া (Reflex action), সহজাত প্রতিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত বা উদ্দীপিত হয়। অতঃপর জীবন যখন এগিয়ে চলে তখন আচরণের ধরনে জটিলতা দেখা দেয় এবং এ সকল জটিলতা মানুষ তার স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা, যুক্তি ও অভীষ্ট সাধনের ক্ষমতা দ্বারা সমাধান করতে সক্ষম হয়।

মানসিক আচরণের প্রকারভেদ : মানব প্রকৃতি বিশদভাবে জানতে গেলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় এজন্য যে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক বিস্ময়কর বৈসাদৃশ্য পরিদৃশ্যমান। যেমন কেউ অতিমাত্রায় ফুর্তিবাজ আবার কেউ বিষাদগ্রস্ত, কেউ কৌতুকপ্রিয়, কেউ রাশভারী, কেউ প্রাণবন্ত, কেউ গম্ভীর, কেউ বুদ্ধিমান, কেউ বোকা, কেউ সতর্ক, কেউ দুঃসাহসী, কেউ অমায়িক স্নেহপ্রবণ কোমল, কেউ অমার্জিত রূঢ়, কঠোর– এভাবে দু'টি পরস্পরবিরোধী আচরণের অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় এবং তা খুবই বৈচিত্র্যময়। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যখন এসব বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় তখন আমরা তাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নামে অভিহিত করি। আর এই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একজন ব্যক্তিকে আরেক ব্যক্তি থেকে আলাদা করা যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই বিভিন্নতার কারণ কী তা জানা প্রয়োজন। কেননা একই পরিবারের একই পরিবেশে সব সন্তান একই রকমের হয় না। তাদের আচরণের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ এজন্য শারীরিক গঠন কাঠামোকে দায়ী করেন। আবার কেউ বংশগতি কিংবা পরিবেশগত অবস্থাকে এর কারণ বলে মনে করেন। মানুষের আচরণের মধ্যে এই বৈপরীত্যকে আমরা কীভাবে কোন মান বা নীতি দ্বারা বিবেচনা করব? এটাকে বলা হয় 'স্বাভাবিকতার নীতি'। মানসিক স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মানব আচরণের ঐ বৈশিষ্ট্যকে স্বাভাবিক বলা হয় যা মানুষের মনের অবস্থা ও স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তাতে ব্যক্তির সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আরেকটি ধারা হলো শারীরিক বা মানসিক প্রকৃতি বা ধাত যা মানুষের শারীরবৃত্তীয় গঠনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। আর মানসিক গঠনের ধারা হলো মানুষের স্বভাব বা মেজাজ যা পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিত্বের গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সচ্চরিত্রতা যা জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শের জন্য অর্জিত হয়। জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রেক্ষিতে কখনো কেউ ভালো বা মন্দ বলে সমাজে বিবেচিত হয়। অতঃপর মানসিক আচরণকে আমরা চারটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি; যেমন (১) প্রকৃতিগত, (২) সরল, অনাড়ম্বর, (৩) প্রতিক্রিয়া প্রবণ, (৪) মনঃস্নায়বিক পীড়া প্রবণ। এই প্রত্যেকটি আচরণকে ভিন্ন ভিন্নভাবে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা যায়। মানসিক স্বাস্থ্য উপরোক্ত ৪র্থ আচরণের ধারাতে পড়ে।

মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের উপায় : স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতাকে বুঝায়। শরীর ও মন একে অপরের পরিপূরক। মানসিক অশান্তি থাকলে শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। মানসিক অসুস্থতা মানুষের জীবনে অনেক ব্যর্থতা ও দুর্গতির সৃষ্টি করতে পারে। মানসিক অসুস্থতার কারণে শিশু মনে মানসিক বিকৃতির সূত্রপাত হয়। মাতা-পিতা বা অভিভাবক এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করে শিশু প্রকৃতির যে কোনো অস্বাভাবিকতা দূর করতে যত্নবান হবেন।

মানসিক অবস্থা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিষয়। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির মধ্যে রয়েছে মনস্তত্ত্ব, মানসিক ব্যাধি, ভেষজ, প্রাণিবিদ্যা, সমাজ বিস্তার। শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বিভিন্ন রকমের মানসিক বিকৃতি তথা অস্থিরতা, মানসিক বিকৃতি ও বিশৃংখলা প্রতিরোধের জন্য চেষ্টা করে। মানসিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানসিক ব্যাধি, বুদ্ধিবৃত্তির স্বল্পতা, স্নায়বিক মনোবিকার, অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি প্রধান। মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের তথা প্রতিরোধের জন্য সুশিক্ষা, শিশুর স্বাস্থ্য-সম্মত লালনপালন, পরিচর্যা, উন্নত পারিবারিক পরিবেশ, মাতা-পিতা অভিভাবকের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির প্রয়োজন। মানসিক আচরণের এই জটিল গতি প্রকৃতি ও অস্থিরতা দূরীকরণে ধৈর্যশীল আচরণ, সুশিক্ষা, শিশুবান্ধব পরিবেশ, পুষ্টি, পরিচর্যা, আনন্দময় জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর সরবরাহ ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে আগামীতে এক সুস্থ জাতি গড়ে উঠবে যা সামগ্রিকভাবে সকলের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

> কাজ–১ : ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে পরস্পরবিরোধী আচরণ দেখতে পাওয়া যায় তা উল্লেখ করে শিক্ষার্থীরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে এবং যুক্তি প্রদর্শন করবে।
>
> কাজ–২ : মানসিক অস্থিরতার ক্ষতিকারক দিক কী এবং মানসিক অস্থিরতা দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন ও আলোচনা করবে।

পাঠ–৩ : মানসিক অবসাদ, শ্রেণিবিভাগ ও শিক্ষার্থীর উপর এর প্রভাব– দীর্ঘক্ষণ একই কাজ করার ফলে সেই কাজের প্রতি মানুষের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। মানসিক ও শারীরিক অবস্থার এ পরিবর্তনকেই ক্লান্তি বা অবসাদ বলা হয়। তাই অবসাদ বলতে কর্মশক্তির শিথিলতা বা কর্মশক্তি হ্রাস পাওয়াকেই বুঝায়। কর্মক্ষমতা হ্রাসই হলো অবসাদের সর্বজনীন কারণ। মনোবিদগণ অবসাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন– 'কর্মক্ষমতা হ্রাসই হলো অবসাদ'। কারোর মতে– 'কাজ করার জন্য কর্মক্ষমতার হ্রাসই হলো অবসাদ, তাই যে কোনো ধরনের কর্মক্ষমতার হ্রাসই হলো অবসাদ' তবে বিশ্লেষণধর্মী সংজ্ঞা হলো– 'এক নাগাড়ে কোনো কাজ করার দরুন শরীরে কর্মক্ষমতার যে অবনতি হয় তাকে অবসাদ বলা যেতে পারে'।

অবসাদের শ্রেণিবিভাগ : মনোবিদগণ অবসাদকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করেছেন– (ক) দৈহিক অবসাদ ও (খ) মানসিক অবসাদ।

(ক) দৈহিক অবসাদ : খুব বেশি সময় ধরে দৈহিক পরিশ্রম করলে যে অবসাদ আসে তাকে দৈহিক অবসাদ বলে। এ অবসাদ দৈহিক পেশিঘটিত ও ইন্দ্রিয়গত। প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক শ্রমের একটি সীমা আছে, শ্রম এ

সীমা অতিক্রম করলে অবসাদ দেখা দেয়। সাধারণ অবস্থায় কাজের সময় যে সব শারীরিক চাহিদা অনুভূত হয় তা দেহ নিজেই পূরণ করে নেয়। যেমন দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার ফলে অতিরিক্ত অক্সিজেনের চাহিদা মেটানো যায়। আবার রক্তের চাপ ও হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেলে অতিরিক্ত শর্করা নিঃসৃত হয়। তবে কাজটি বেশি শ্রমসাধ্য হলে, ব্যক্তির সহনশীলতা কম হলে, অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরমে ব্যক্তির শারীরিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে অবসাদ দেখা দেয়।

খ. মানসিক অবসাদ : মানসিক কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে থাকলে মানসিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অবসাদ দেখা দেয়। যেমন- অনেক সময় ধরে এক নাগাড়ে অংক করতে থাকলে একটা পর্যায়ে অংক করার জন্য বিচার শক্তি, চিন্তাশক্তি ও নির্ভুল করার ক্ষমতা কমতে থাকে। এই কমতে থাকা অর্থাৎ পরিবর্তনের এই অবস্থাকে মানসিক অবসাদ বলে। এছাড়া ব্যক্তিগত পছন্দ, অপছন্দ, মানসিক অবস্থার তারতম্য, পরিবেশগত কারণেও অবসাদ আসতে পারে। তবে দৈহিক ও মানসিক কাজকে যেমন সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না, তেমনি দৈহিক অবসাদ ও মানসিক অবসাদকে আলাদা করা যায় না। অনেকক্ষণ দৈহিক পরিশ্রম করলে মানসিক অবসাদ আসতে পারে, তেমনি একটানা মানসিক কাজ করতে থাকলে দৈহিক অবসাদ আসে।

শিক্ষার্থীর উপর মানসিক অবসাদের প্রভাব : শিক্ষার্থী বলতে এখানে শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের বুঝানো হয়েছে। শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের যে দৈহিক অবসাদ আসে তা তাদের অবসাদের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তাদের শারীরিক পরিশ্রমের ফলে বিপুল পরিমাণ ঘাম নিঃসরণ, শারীরিক অঙ্গ-সঞ্চালন এবং একাগ্রতার উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু যখন তারা মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন যে সব প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায় তা নিম্নরূপ :

১। তাদের কর্মসূচি পালনকালে ভুল হতে থাকে।

২। তারা নিজেদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।

৩। তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় থাকে না।

৪। তারা কাজের ছন্দ হারিয়ে ফেলে এবং ভুল সিদ্ধান্ত নেয়।

৫। তারা অমনোযোগী হয়ে পড়ে, কর্মসূচি বাস্তবায়নের কলাকৌশল সহজে বুঝতে পারে না।

৬। কাজের একাগ্রতা কমে যায় এবং

৭। তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

কাজ-১ : অবসাদ কী এবং কী কারণে অবসাদের সৃষ্টি হয় তা শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বোর্ডে লিখবে এবং আলোচনা করবে।

কাজ-২ : মানসিক অবসাদগ্রস্ত হলে মনের উপর যে সব প্রভাব পড়ে তার একটি তালিকা তৈরি করে শ্রেণিকক্ষে দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

পাঠ–৪ : মানসিক অবসাদের কারণ ও তা দূরীকরণের উপায় : দৈহিক বা মানসিক, সামগ্রিক বা আংশিক যা-ই হোক না কেন তার পেছনে কতকগুলো কারণ রয়েছে। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি কর্মসূচিজনিত শারীরিক চাপের কারণে সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে অবসাদ আসে। তবে আরও অনেক কারণে অবসাদ আসতে পারে। মনোবিদগণ অবসাদের কারণসমূহকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন– (১) শারীরিক বা দৈহিক কারণ, (২) মানসিক কারণ এবং (৩) পরিবেশগত কারণ। দৈহিক অবসাদের জন্য মাংসপেশিতে ল্যাকটিক এসিডের সৃষ্টি, দেহকোষের ক্ষয়, শরীর থেকে লবণ বের হয়ে যাওয়া, যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন ঘাটতি, অতিরিক্ত অঙ্গ সঞ্চালন প্রভৃতি কারণে হয়ে থাকে। এই পাঠে আমরা মানসিক অবসাদ নিয়ে আলোচনা করব। মানসিক অবসাদের কারণসমূহকে আমরা নিম্নবর্ণিত উপায়ে বিশ্লেষণ করতে পারি। যেমন–

১। **মানসিক প্রস্তুতির অভাব :** কোনো কাজ করার আগে সে সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। কর্মসূচি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা স্পষ্ট না থাকলে তাড়াতাড়ি মানসিক অবসাদ আসে।

২। **কাজে অভ্যস্ত না হয়ে উঠা :** কর্মসূচি নিয়মিতভাবে পালনকালে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে ঐ কর্মসূচিতে তাড়াতাড়ি অবসাদ আসে না। তাই অভ্যাসের অভাবের কারণে অনেক সময় অবসাদ দেখা দেয়।

৩। **কর্মক্ষেত্রে প্রেষণা এবং কাজের প্রতি অনুরাগের অভাব :** যে কোনো কাজের পেছনে প্রেষণা থাকলে একঘেয়েমি কাজ করেও অনেক সময় অবসাদ আসে না। আবার যে কাজে প্রেষণা নেই, সেই কাজ তার কাছে বোঝাস্বরূপ। ঐ ধরনের চাপিয়ে দেওয়া কাজে সহজে মানসিক অবসাদ দেখা দেয়।

৪। **মানসিক ইচ্ছার অভাব :** কর্মসূচি বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীর যদি অনীহা থাকে তাহলে সে দ্রুতই মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মানসিক ইচ্ছা প্রবল হলে অনেক সময় কঠিন হলেও করা সম্ভবপর হয়। তাই মানসিক ইচ্ছার অভাব অবসাদের একটি বিশেষ কারণ।

৫। **পরিবেশগত কারণ :** দৈহিক ও মানসিক কারণ ছাড়াও কিছু পরিবেশগত কারণেও অবসাদ আসতে পারে। খুব গরম, খুব ঠান্ডা বা গুমোট আবহাওয়া কোনো কাজের অনুকূল পরিবেশ নয়। এরূপ পরিবেশে সহজেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। অনুরূপভাবে পরিমিত আলো, বাতাস ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ না থাকলে অল্পতেই অবসাদ এসে ভর করে।

মানসিক অবসাদ দূরীকরণের উপায় : দৈহিক ও মানসিক শক্তি ক্ষয়ের ফলেই যেহেতু অবসাদের উদ্ভব হয়, তাই দেহ ও মনের সুস্থতা ও সক্রিয়তা আনয়নের মাধ্যমে অবসাদ দূর করা সম্ভব। অবসাদ দূরীকরণের জন্য আমরা নিচের বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করতে পারি।

১। **কর্মসূচির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি :** শিক্ষার্থীর যদি কর্মসূচির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তাহলে তাড়াতাড়ি অবসাদ আসে না।

২। **কর্মসূচির একঘেয়েমিতা পরিহার :** বিরক্তিকর কর্মসূচির একঘেয়েমিতা শিক্ষার্থীকে অবসাদগ্রস্ত করে তোলে। অন্যদিকে কর্মসূচিকে আনন্দপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় করলে অবসাদ দূর করা যায়।

৩। **প্রেষণা :** কর্মসূচিতে প্রেষণা থাকলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে তা পালন করবে এবং শীঘ্র অবসাদ আসবে না।

৪। **অতিরিক্ত চাপমুক্ত কর্মসূচি পরিহার** : সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে চাপ দেওয়া যাবে না।

৫। **বিশ্রাম ও ঘুম** : দেহের ক্ষয়পূরণের জন্য পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজন। তেমনি অবসাদ দূর করার জন্য প্রয়োজন পরিমিত বিশ্রাম ও ঘুম। বিশ্রাম ও ঘুমের ফলে দেহ ও মস্তিষ্কের অবসাদ দূরীভূত হয় এবং পুনরায় নতুন উদ্যোগে কাজ করার স্পৃহা জন্মে।

৬। **পরিবেশগত কারণ** : অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অর্থাৎ স্যাঁতসেঁতে, আলো-বাতাসের অভাব এমন পরিবেশ পরিহার করে খোলামেলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থানে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করলে শিক্ষার্থীরা আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ করবে এবং মানসিক অবসাদের কোনো প্রভাব পড়বে না।

কাজ–১ :	মানসিক অবসাদের কারণসমূহের একটি তালিকা বাড়ির কাজ হিসেবে তৈরি করে এনে শ্রেণিকক্ষের বোর্ডে লিখবে এবং দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।
কাজ–২ :	মানসিক অবসাদ দূরীকরণের উপায়গুলি ধারাবাহিক লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা এর উপর আলোচনা করবে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

১.১ খেলাধুলা যেসব শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখে তেমনি মানসিক সুস্থতা দেহ ও মনের সমতা রক্ষায় সহায়তা করে। কোনটি সত্য–

ক. খেলাধুলা করলে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে

খ. খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক আনন্দ লাভ হয়।

গ. খেলাধুলায় বিজয়ী হলে সে অহংকারী হয়।

ঘ. পরাজিত হয়েও আনন্দিত হয়।

১.২ 'শরীর ও মন একে অপরের পরিপূরক' কথাটি

ক. আংশিক সত্য খ. মিথ্যা

গ. সত্য ঘ. কোনোটিই না

১.৩ মানসিক ভাবে অবসাদগ্রস্ত হলে :

ক. প্রত্যেকটি কাজ সুন্দরভাবে করা যায়।

খ. আস্থার সাথে সব কাজ শেষ করা যায়।

গ. সিদ্ধান্ত নিতে ভুল হয়।

ঘ. কাজের একাগ্রতা কমে যায় ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়।

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. মানসিক স্বাস্থ্য ------ ও ------ সমতা রক্ষায় সহায়তা করে।

খ. মানসিক অবস্থা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি মানসিক ------- বিষয়।

গ. দীর্ঘক্ষণ কাজ করার ফলে মানুষের দৈহিক ও মানসিক ----------- দেখা দেয় এর ফলে মানুষের -----------হ্রাস পায়। মানুষের মানসিক ও শারীরিক এই পরিবর্তনকেই --------------- বলা হয়।

৩. সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক. মানসিক স্বাস্থ্য কী?

খ. মানসিক আচরণ কাকে বলে?

গ. দৈহিক অবসাদ কী?

ঘ. প্রেষণা কাকে বলে?

৪. রচনামূলক প্রশ্ন

ক. মানসিক আচরণ কয় প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।

খ. মানসিক অবসাদ দূরীকরণের উপায়গুলো বর্ণনা কর।

গ. শিক্ষার্থীর উপর মানসিক প্রভাবগুলো আলোচনা কর।

ঘ. মানসিক অবসাদের কারণগুলো উল্লেখ কর।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসেবা

ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে বেঁচে থাকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়সমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে সাধারণভাবে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বলা হয়। এখন স্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি তা প্রথমে আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা একটা বিখ্যাত উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করতে পারি। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'প্লেটোস রিপাবলিক'-এর ৪র্থ অধ্যায়ে স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন– "Now to produce health is to part the various parts of the body in their natural relations of authority or subservience to one another, whilst to produce disease is disturb this natural relation." এই সংজ্ঞার সরল অর্থ করলে দাঁড়ায় "এখন স্বাস্থ্য অর্জন করার অর্থ হচ্ছে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একে অপরের উপর কর্তৃত্ব অথবা অধীনতার স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনকে নির্দিষ্ট করা। পক্ষান্তরে, শরীরে রোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক আন্তঃসম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হওয়াকে বুঝায়। উপরোক্ত সংজ্ঞাকে সহজ করলে আমরা স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক সুস্থতা অর্থাৎ শরীরের সুস্থ অবস্থাকে বুঝি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে কেবলমাত্র শারীরিক সুস্থতাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, শরীরের সাথে মনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে মানসিক সুস্থতাও প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের ন্যায় মূল্যবান সম্পদ লাভ করতে হলে আমাদের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আমাদের সুস্থ থাকার উপায় সম্পর্কে যেমন ধারণা দেয় তেমনি রোগগ্রস্ত হলে তা থেকে পরিত্রাণ লাভের পন্থাও জানিয়ে দেয়। অর্থাৎ স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়। তাই সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিত করে ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্যরক্ষায় সচেতন হওয়া, বিদ্যালয় ও গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলা, পুষ্টির অভাব পূরণে স্কুলে টিফিন প্রোগ্রাম চালু করা, স্কুলে নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবামূলক কর্মসূচি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

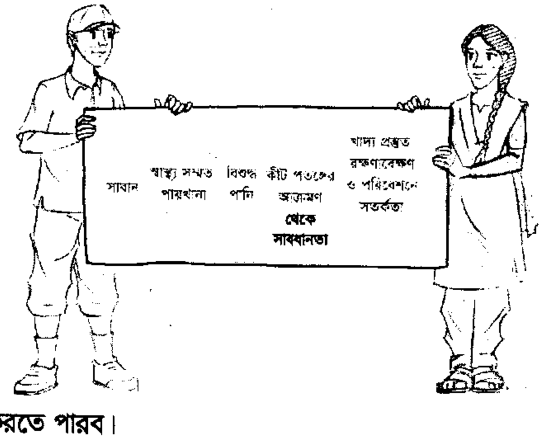

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার ধারণা ও কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাধারণ স্বাস্থ্যসমস্যা চিহ্নিত করে প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব।
- স্বাস্থ্যসেবার আওতা/পরিধি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- টিফিন প্রোগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- স্বাস্থ্যকার্ড সম্বন্ধে ধারণা পাব এবং এর উপকারিতা ব্যাখ্যা করে রোগ প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারব।

পাঠ–১ : স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও এর গুরুত্ব : স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা। আবার স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলার উদ্দেশ্য হলো রোগ প্রতিরোধ করা। মানুষ যতই রোগের কারণ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে, ততই সে রোগ প্রতিরোধের উপায় জানতে ও প্রয়োগ করতে পারবে। এর কারণ, অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া এবং সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করা। তাই সুস্থ শরীর ও দীর্ঘজীবন লাভের জন্য যা করা প্রয়োজন তা আমরা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠে জানতে পারি। 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'– এই প্রবাদ বাক্যটির মর্ম অনুধাবন করতে হলে অর্থাৎ স্বাস্থ্যের ন্যায় মূল্যবান সম্পদ লাভ করতে হলে আমাদেরকে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। আমাদের স্বাস্থ্যের উপর পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থার প্রভাব রয়েছে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, সংক্রামক ব্যাধির রোগজীবাণু একের দেহ থেকে অন্যের দেহে সংক্রমণ ঘটায়; কীভাবে সংক্রামক রোগ, ছোঁয়াচে রোগের সংক্রমণ হয়, এর প্রতিরোধে করণীয় বিশুদ্ধ পানি পান, দূষিত বায়ু থেকে রক্ষা, পুষ্টিকর সুষম খাদ্য গ্রহণ, আলো বাতাসময় গৃহে বাস, স্বাস্থ্যকর স্কুলগৃহ, নিরাপদ পথ চলা, হিংস্রপশু বা পাগলা কুকুর ও শিয়ালের কামড় থেকে আত্মরক্ষা, মলমূত্র আবর্জনা দূরীকরণ প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর সকল ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠে আমরা বিশদভাবে অবহিত হই। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান পাঠে আমরা স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে জানতে পারি। স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ করা। রোগ প্রতিরোধ ও রোগের প্রতিকার স্বাস্থ্যনীতির অন্তর্ভুক্ত। তবে রোগভেদে রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিরোধের ধরন ভিন্ন ভিন্ন হবে। কেবল কলেরা, যক্ষ্মা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের একই রকম প্রতিরোধ বা প্রতিকার হবে না। দূষিত বায়ু, পানি, পচা, বাসি ও খোলা খাবার, গৃহবর্জ্য ও মলমূত্র নিষ্কাশনের অব্যবস্থা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এসব রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। এমনিভাবে উন্নত ব্যবস্থাপনার ও চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, দুর্ঘটনার প্রাথমিক প্রতিবিধান নিশ্চিত করা স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম লক্ষ্য। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অজ্ঞতা, উদাসীনতা সুস্বাস্থ্য গঠনের প্রধান অন্তরায়। উপযুক্ত শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার, প্রভৃতি ব্যবস্থা এই অন্তরায় দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমাজের একজন সদস্য। তাই শুধু ব্যক্তির কল্যাণ নয় সমাজের সর্বস্তরের জনগণের কল্যাণে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করতে এবং স্বাস্থ্যনীতি মেনে চলতে উপদেশ দিতে হবে।

কাজ–১ : স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য বলতে কী বুঝি তা পৃথকভাবে লেখ এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

কাজ–২ : পানি ও বায়ু আমাদের প্রাণ রক্ষা করে আবার রোগের সংক্রমণও ঘটায়। এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা কর এবং যথাযথ উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

পাঠ–২ : ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার ধারণা ও এর কৌশল : শারীরিক সুস্থতা আনন্দময় জীবনের পূর্বশর্ত। শরীর সুস্থ না থাকলে পড়ালেখায় মন বসে না, কোনো কাজে আনন্দ পাওয়া যায় না অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে কোনো কাজ সম্পন্ন করা যায় না। কোনো কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা এবং সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন নিজেকে সুস্থ রাখা। স্বাস্থ্যহীন দেহকে সুস্থ ও সবল করে তোলা কঠিন। সুস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য শরীরের যত্ন নিতে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মেনে চলতে হয়।

স্বাস্থ্যরক্ষা কী? শরীরের গঠন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখা এবং নিরোগ থাকাই হচ্ছে স্বাস্থ্যরক্ষা। নিজ স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ও এ বিষয়ের সকল নিয়মকানুন মেনে চলাকেই ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা বলে। স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়টি দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত। শিশুকাল থেকে যৌবনকাল পর্যন্ত একজন মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক উন্নতি ঘটে। এ সময়ে তাকে বয়স উপযোগী স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হয়। তাই দৈহিক স্বাস্থ্যের সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্যও ঠিক রাখতে হবে। কারণ শরীরের সাথে মনের সম্পর্ক খুবই নিবিড়।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার কৌশল : সুস্থভাবে জীবন যাপনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়ে তোলার ভিত্তি হচ্ছে স্বাস্থ্যবিষয়ক নিয়মকানুন যা স্বাস্থ্যবিধি নামে পরিচিত। স্বাস্থ্যবিধির মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা যেমন বাড়ি, বিদ্যালয়, আশপাশের রাস্তাঘাট প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতা, প্রয়োজনীয় ও পরিমিত ব্যায়াম, বিশ্রাম ও ঘুম, প্রয়োজনীয় পরিমাণে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ, নিয়মিত খেলাধুলা করা ইত্যাদি। এসব স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে দেহ ও মনকে সুস্থ ও সবল রাখা যায়। শরীরের যত্ন বিষয়ক সকল কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করাও স্বাস্থ্যরক্ষার একটি প্রধান বিষয়।

হাসি-খুশি ও প্রফুল্ল থাকা মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার একটি মৌলিক বিষয়। এজন্য বিনোদনমূলক কাজকর্ম যেমন– খেলাধুলা, ভ্রমণ, আনন্দদায়ক ও শিক্ষামূলক বইপত্র পড়া, বাগান করা, সংস্কৃতি চর্চা, ধর্মীয় আচার পালন ইত্যাদি করা প্রয়োজন। সময়ানুবর্তিতাও স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সকল কাজ সময় মেনে সম্পন্ন করতে হবে। নিয়মিত ও স্বাভাবিকভাবে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস, মাদক দ্রব্য থেকে দূরে থাকা প্রভৃতি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল। সুস্থ জীবন যাপনের জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল সম্পর্কে জানা ও তা মেনে চলা একান্ত আবশ্যক।

কাজ–১ : শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক কাজ, নিয়ম, বিধি ইত্যাদির সাহায্যে নিচের ছকটি পূরণ কর।

শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক কাজ/বিধি	মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক কাজ/বিধি
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.
৫.	৫.

কাজ–২ : প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষায় তুমি কী কী কর– অভিনয় করে দেখাও।

পাঠ-৩ : শিক্ষার্থীদের মধ্যাহ্নকালীন টিফিন প্রদান : 'সর্বজনীন সাক্ষরতা' অর্জনের জন্য ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন নামক স্থানে বিশ্ব সম্প্রদায়ের এক আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ''সবার জন্য শিক্ষা'' নামে এক কর্মসূচি গৃহীত হয়। এই কর্মসূচি অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী দেশসমূহ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার নীতি ঘোষিত হয়। লক্ষ্য ছিল ২০০৫ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে হবে। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা গ্রহণ না করলে অধিকাংশ শিশু কীভাবে পড়তে বা লিখতে হয় তা শিখতে পারবে না। ফলে নিরক্ষতার দুষ্টচক্র থেকে কোনো দেশ বেরিয়ে আসতে পারবে না। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রের অনগ্রসরতা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের এক বিপুল জনগোষ্ঠী দরিদ্র এবং তাদের বসবাস গ্রামাঞ্চলে। গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহ সরকার ঘোষিত 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হচ্ছে না। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর তারা ঝরে পড়ে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শ্রেণির শিক্ষা কোর্স সম্পূর্ণ করতে পারে না। এর অনেকগুলো কারণ আছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন সময়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ক্ষুধার্ত থাকে। পেটে ক্ষুধা থাকলে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের পড়ায় মন বসে না। এজন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন খাবার কর্মসূচি চালু করে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশের প্রান্তীয় জনগোষ্ঠী দরিদ্র বিধায় তাদের সন্তানদের পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না। স্কুল পড়ুয়া এসব শিক্ষার্থীর অনেকেই আধপেটা অথবা অভুক্ত অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসে। তারা অপুষ্টিতে ভোগে, পড়াশুনায় মন বসে না এবং অন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত হয়। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্নকালীন টিফিন প্রোগ্রাম চালু করা প্রয়োজন।

মধ্যাহ্নকালীন টিফিন প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য : এই প্রোগ্রামের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো-

১। শ্রেণিকক্ষে অবস্থানকালীন সময়ে ক্ষুধা নিবারণ।

২। বিদ্যালয়ে ভর্তির পর ঝরে পড়া রোধ এবং ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি।

৩। শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি, সহাবস্থান, সহমর্মিতা বৃদ্ধি।

৪। অপুষ্টি রোধ এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচির অংশগ্রহণ।

৫। খেলাধুলা ও স্কাউট কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ।

৬। দরিদ্র শিক্ষার্থীদেরকে অভিভাবকের উপর থেকে খাদ্য সংস্থানের একটি চাপ দূরীভূতকরণ এবং তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।

স্বাস্থ্যকর টিফিন : বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীকে ৭-৮ ঘণ্টা অবস্থান করতে হয়। এই দীর্ঘ সময়ে তারা স্বাভাবিকভাবে ক্ষুধার্ত হয়। এই সময়ের মাঝে তাদেরকে টিফিন সরবরাহ করলে টিফিন খেয়ে তারা ক্ষুধা নিবৃত্ত করে বিদ্যালয়ের পরবর্তী পাঠসমূহে মনোনিবেশ করতে পারে। এতে তাদের অবসাদ ও ক্লান্তি দূর হয়। তাদের লেখাপড়ার মান উন্নত হয়। দুপুরের এই খাবারের মান যত উন্নত হবে ততই তারা শারীরিক ও

মানসিকভাবে ভালো বোধ করবে। কাজেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ের এই মধ্যাহ্নকালীন টিফিন প্রোগ্রামের সফল বাস্তবায়ন করে সার্বিকভাবে "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচিকে এগিয়ে নেবে, শিক্ষার হার বাড়বে এবং সর্বোপরি একটি সুস্থ জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কাজ–১ :	"সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে তোমার দৃষ্টিতে প্রধান অন্তরায়সমূহ কী কী তা শিক্ষকের নির্দেশে বোর্ডে লিখবে। এরপর দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করবে।
কাজ–২ :	মধ্যাহ্নকালীন টিফিন প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ যুক্তিসহ লিখে আনবে ও শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ–৪ : সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা ও তার প্রতিকার : রোগ বা অসুখ জীবনের অংশ। সারা জীবনে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে রোগ এড়ানো এবং রোগকে প্রতিরোধ করা যায়। সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা বলতে শরীর রোগাক্রান্ত হওয়াকে বুঝায়। তাই রোগের আক্রমণ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য রোগের ধরন, রোগের জীবাণু এবং কীভাবে রোগ ছড়ায় তা জানা প্রয়োজন।

রোগের কারণ : অনেক রোগের কারণ নানা রকমের জীবাণু। আমাদের চারপাশে নানারকম জীবাণু প্রতিনিয়ত ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই রোগজীবাণু নানা উপায়ে দেহে প্রবেশ করে। শরীরের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে গেলে রোগ জীবাণু দ্বারা শরীর আক্রান্ত হয় এবং শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে যার শরীর সবল ও মজবুত তাকে রোগজীবাণু সহজে কাবু করতে পারে না, সে সুস্থ থাকে।

রোগের ধরন : কোনো কোনো রোগ, আক্রান্ত রোগীর কাছ থেকে আশেপাশে অন্যদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের রোগকে সংক্রামক রোগ বলে। মানুষের শরীর ছাড়াও কোনো বস্তুর মাধ্যমেও সংক্রামক রোগ ছড়াতে পারে। যেমন– পানি, খাদ্য, বাতাস ইত্যাদি। স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে সর্দি-কাশি, চোখ উঠা, উদরাময়, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া, হাম, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, জন্ডিস প্রধান। যে সব রোগ এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যের শরীরে সংক্রমিত হয় না, রোগগ্রস্ত ব্যক্তি একাই সে রোগ বহন করে, সেসব রোগকে অসংক্রামক রোগ বলে। যেমন– ক্যান্সার, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

সাধারণ স্বাস্থ্যসমস্যা : আমাদের দেশের স্বাস্থ্যসমস্যা বহুমুখী। দেশে বসন্ত, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমলেও কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়সহ নানাবিধ পেটের পীড়ার বিস্তার অনেক বেশি। পুষ্টিহীনতা, বিশুদ্ধ পানির অভাব, স্বাস্থ্যসমস্যা ও বাসগৃহ না থাকা, যোগ্য চিকিৎসকের ও ঔষধপত্রের অভাব, মা ও শিশু মৃত্যুর উচ্চহার, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে অসচেতনতা প্রভৃতি সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে।

স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতিকার : রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধে আত্মসচেতনতা সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। রোগের সংক্রমণ যাতে না ঘটে সেজন্য সব সময়ই সতর্ক থাকতে হবে। রোগ সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার সকল উপায় অবলম্বন করতে হবে যাতে শরীর সুস্থ থাকে। শরীর সুস্থ ও সবল থাকলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাও দৃঢ় থাকে। রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে হলে প্রতিটি রোগের

প্রতিরোধের উপায়গুলো জানা প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। তবে সাধারণভাবে কতকগুলো ব্যবস্থা নিলে অধিকাংশ সংক্রামক রোগই প্রতিরোধ করা যায়। যেমন–

১। **টিকা গ্রহণ** : যে সব রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, যথাসময়ে শিশু ও বয়স্কদের সেই টিকা নিতে হবে। আমাদের দেশে যে সব রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেগুলো হলো– বসন্ত, টাইফয়েড, যক্ষা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হাম, হেপাটাইটিস ইত্যাদি।

২। **ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা** : নিজ শরীর, পোশাক, আসবাবপত্র, রান্নার তৈজসপত্র, থালা-বাসন, বসবাসের স্থান, বাথরুম, বাড়ির চারপাশ সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৩। **সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস** : প্রতিবার শৌচকাজ শেষে, খাবার তৈরি ও পরিবেশনের আগে, খাদ্য গ্রহণের আগে, অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করার পরে, শিশুদের মলমূত্র পরিষ্কার করার পরে, প্রতিবার বাইরে থেকে ঘরে ফেরার পরে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।

৪। **খাদ্য প্রস্তুত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশন** : এজন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে খাদ্য প্রস্তুত করা, খাদ্য রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হওয়া এবং খাবার সব সময় ঢেকে রাখা খুবই জরুরি।

৫। **কীট-পতঙ্গ** : কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে সাবধান থাকা, জীবাণুমুক্ত নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহার করা প্রভৃতি ব্যবস্থা সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা ও অবহেলার জন্যই প্রধানত সংক্রামক ব্যাধি বিস্তার লাভ করে। এ কারণে আমাদের দেশে প্রতি বছর বহু লোকের মৃত্যু হয়।

৬। **রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি** : রোগের প্রতিরোধের বিষয়ে ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, পোস্টার, সিনেমা, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

কাজ–১ : তোমার বাড়িতে বসবাসকারী এবং পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে গত বছর বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এমন ৫ জনের একটি তালিকা তৈরি করে নিচের ছকটি পূরণ কর।

পরিবারের সদস্য	গত বছরে তিনি যে সকল রোগে ভুগেছেন	এগুলোর কোনটি	
		সংক্রামক	অসংক্রামক
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			

কাজ–২ : প্রতিদিন তোমাদের বাড়িতে যতরকম গৃহস্থালির কাজ করা হয় (যেমন– ফলমূল কাটা, খাদ্য প্রস্তুত, পানি ফুটানো, ঘর ঝাড়ু দেওয়া ও মোছা) তেমনি তিনটি কাজ মনে কর। এই কাজগুলো করার সময় রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধমূলক করণীয়গুলো উল্লেখ করে ছকটি পূরণ কর।

গৃহস্থালির কাজ	সংক্রমণ প্রতিরোধমূলক করণীয়
১. ফলমূল কাটা ২. ৩.	১. ফল নিরাপদ ও জীবাণুমুক্ত পানি দ্বারা ধোয়া, ছুরি বা বঁটি ধুয়ে নেওয়া। ফল কেটে পরিষ্কার পাত্রে রাখা, ঢেকে রাখা। ২. ৩.

পাঠ–৫ : শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যকার্ড : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা শিক্ষা তথা জ্ঞান লাভের জন্য যায় তারা শিক্ষার্থী নামে পরিচিত। শিক্ষার্থীরা ছয় থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ে কাটায়। বছরে ৭/৮ মাস, সপ্তাহের ছয়দিন এবং প্রতিদিন ৩ থেকে ৫ ঘণ্টা পর্যন্ত তাদেরকে বিদ্যালয়ে অবস্থান করতে হয়। দেশ বা জাতির জন্য ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তাদের বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের পরিবেশ, আসবাবপত্র, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি যদি তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল না হয় তাহলে তাদের শরীর ও মন সুস্থ ও সবল হয়ে গড়ে উঠবে না। মানসিক উন্নতি তথা নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে বিদ্যালয়। আদর্শ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে সৎ গুণাবলি অর্জন করতে সমর্থ হয়। তেমনি শারীরিক সুষম বিকাশের জন্য বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্যকর বিদ্যালয় গৃহ, বিশুদ্ধ পানি, পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ মধ্যাহ্নকালীন টিফিন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা-প্রস্রাবখানা, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশ করে এমন শ্রেণিকক্ষ, উন্মুক্ত খেলার মাঠ, ফুল ও ফলের বাগান এমন ধরনের বিদ্যালয় হলো স্বাস্থ্যসম্মত বিদ্যালয়। শিক্ষার্থীদের উন্নত স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিচের বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে–

ক. বিদ্যালয় গৃহ : খোলামেলা জায়গা যেখানে চারদিক থেকে অবাধে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে এবং সহজে যাতায়াত করা যায় এমন উঁচু স্থানে বিদ্যালয় গৃহের অবস্থান হতে হবে।

খ. খেলার মাঠ : খেলাবিহীন শিক্ষার্থীর জীবন কল্পনা করা যায় না। বিদ্যালয় সংলগ্ন খেলার মাঠ থাকতে হবে। শিক্ষার্থীরা সারাবছর বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা এই মাঠে চর্চা করতে পারবে।

গ. স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি পায়খানা ও প্রস্রাবখানা : বিদ্যালয় গৃহ থেকে কিছুটা দূরে স্বাস্থ্য-সম্মত পায়খানা ও প্রস্রাবখানা থাকতে হবে এবং সাথে পানিরও ব্যবস্থা থাকবে।

ঘ. বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ : বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসেবার অন্যতম অনুষঙ্গ। শহরে সরবরাহকৃত পানি ফুটিয়ে পান করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। গ্রামাঞ্চলে গভীর নলকূপের পানি বিশুদ্ধ, তাই তা পানযোগ্য। পুকুরের পানি হলে তা ব্যবহারের পূর্বে ফুটিয়ে নিতে হবে।

ঙ. শ্রেণিকক্ষ, আসবাবপত্র : অস্বাস্থ্যকর না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কার্যক্রম : বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কার্যক্রম (School Health Programme) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার্থীরা গ্রীষ্ম, বর্ষা বা শীত ঋতুতে নানাবিধ

পীড়ায় আক্রান্ত হয়। পূর্ব থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এসব পীড়া থেকে সহজে আরোগ্য লাভ করা যায়। বিদ্যালয়ের যদি স্বাস্থ্য কার্যক্রম থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা এই কার্যক্রমের আওতায় সাধারণ পীড়া থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে–

শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা : শিক্ষার্থীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ তত্ত্বাবধান করার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। এজন্য একজন উপযুক্ত চিকিৎসক পরিদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। জেলার সিভিল সার্জনের তত্ত্বাবধানে এসব পরিদর্শক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট স্কুলে হাজির হয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পীড়ার চিকিৎসা করবেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্কুলে স্বাস্থ্য পরিদর্শককে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবেন। স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বয়স, ওজন, রক্তের গ্রুপ, রক্তের চাপ, নাড়ির গতি, দৈহিক গঠন, চোখ, কান, দাঁত, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস প্রভৃতি বিষয় পরীক্ষা করবেন এবং একটি কার্ডে তা লিখবেন। এই কার্ডকে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য কার্ড বলে।

স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র : বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি যে সব বিদ্যালয়ে নেই সেখানে একজন শিক্ষককে কিছু সাধারণ প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীর অসুস্থতা জটিল হলে নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের সহায়তা গ্রহণ করা যায় অথবা হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল কিংবা বিশেষায়িত হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য কার্ড (নমুনা) : স্বাস্থ্য কার্ডটি মোটা কাগজে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি মুদ্রিত অবস্থায় থাকবে। কার্ডে যা থাকবে তা হলো–

স্কুলের নাম ও ঠিকানা

স্বাস্থ্য কার্ড

১। শিক্ষার্থীর নাম --

২। পিতা/মাতার নাম --

৩। ঠিকানা --

৪। জন্ম তারিখ -- বয়স ------------

৫। শ্রেণি -- রোল নং ----------

৬। উচ্চতা -- ওজন -----------

৭। শরীরের গঠন কাঠামো --

৮। রক্তচাপ --

৯। চোখ/নাক/কান/গলা/ফুসফুস/হৃৎপিন্ড --

১০। অতীত অসুস্থতা --

১১। বর্তমান অসুস্থতা --

১২। পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষার তারিখ ও সময় ---------------------------------------

স্বাস্থ্য পরিদর্শকের স্বাক্ষর

কাজ–১ : একটি স্বাস্থ্যসম্মত স্কুল গৃহের বর্ণনা বাড়ি থেকে লিখে আনবে এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

কাজ–২ : বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শকের কাজ এবং একটি নমুনা স্বাস্থ্যকার্ড তৈরি কর। এরপর শ্রেণিতে দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা কর।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

১.১ 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল' কথাটি

ক. আংশিক সত্য খ. সত্য

গ. মিথ্যা ঘ. কোনটিই না

১.২ স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য কী?

ক. স্বাস্থ্য সমন্ধে জ্ঞানলাভ খ. স্বাস্থ্য নীতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ

গ. রোগ প্রতিরোধ করা ঘ. রোগজীবাণু সম্পর্কে জানা

১.৩ সংক্রামক রোগ কাকে বলে

ক. আক্রান্ত রোগীর কাছ থেকে অন্যের দেহে ছড়ালে

খ. রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়।

গ. ওজন কম হওয়ার জন্য যে রোগ হয়

ঘ. শরীরে রক্তচাপ বেড়ে গেলে যে রোগ হয়।

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর

ক. শারীরিক সুস্থতা আনন্দময় জীবনের জন্য---------------

খ. শরীরের গঠন ও স্বভাবিক বৃদ্ধি বজায় রাখা এবং নীরোগ থাকাই হচেছ-----------

গ. স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্য হলো-------------- সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা

ঘ. স্বাস্থ্য কার্ডটি মোটা কাগজে স্বাস্থ্য উল্লেখিত তথ্যাদি---------------- অবস্থায় থাকবে

ঙ. স্বাস্থ্য নীতি মেনে চলার উদ্দেশ্য হলো---------------- করা।

৩. বাম পাশের কথামালার সাথে ডান পাশের কথামালার মিল কর।

ক. ইনফ্লুয়েঞ্জা	ক. অসংক্রামক রোগ
খ. পোলিও	খ. পানিবাহিত রোগ
গ. কলেরা	গ. বায়ুবাহিত রোগ
ঘ. উচ্চ রক্তচাপ	ঘ. টিকা না নিলে

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

ক. স্বাস্থ্য নীতি কাকে বলে?

খ. স্বাস্থ্য রক্ষা কী?

গ. সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো কী?

৪. রচনামূলক প্রশ্ন :

ক. মধ্যাহ্ন কালীন টিফিন প্রোগ্রামের উপকারিতা বর্ণনা কর।

খ. একটি স্বাস্থ্য কার্ড প্রস্তুত করে দেখাও।

গ. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উন্নতমানের স্বাস্থ্য সেবার বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টি

স্বাস্থ্য কী অর্থাৎ স্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি তা প্রথমে জানা দরকার। সাধারণত আমরা স্বাস্থ্য বলতে শারীরিক সুস্থতা বা শরীরের নীরোগ অবস্থাকে বুঝি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে কেবলমাত্র শারীরিক সুস্থতাই সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, শরীরের সাথে মনের সুস্থতাও প্রয়োজন। অতএব দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থতাকে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য নামে অভিহিত করা যায়। বেঁচে থাকা, স্বাস্থ্য রক্ষা এবং শরীরের বৃদ্ধির জন্য মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন। তবে এই খাদ্য হতে হবে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। যে সকল খাদ্য শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে সেগুলো পুষ্টিকর খাদ্য। আর সুষম খাদ্য শরীরে পুষ্টি জোগায়। সুষম খাদ্য সেই সকল খাদ্যের সমাহার যাতে সকল খাদ্য উপাদান যথাযথ অনুপাতে ও পরিমাণে থাকে।

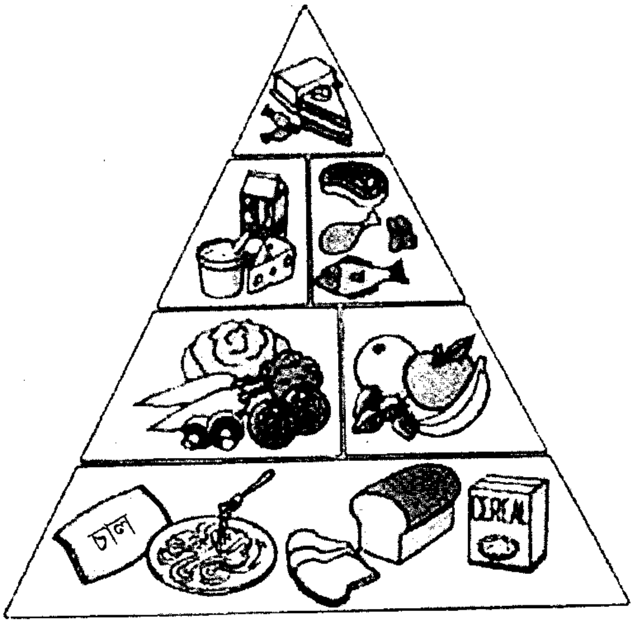

সুষম খাদ্য ও পুষ্টি

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- পুষ্টির ধারণা ও শিক্ষার্থীদের জন্য এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খেলোয়াড়দের জন্য পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পুষ্টিহীনতার ধারণা ও এর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্রীড়াক্ষেত্রে পুষ্টিহীনতার ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়স ভেদে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালরি সমৃদ্ধ খাদ্যতালিকা তৈরি করতে পারব।
- খাদ্যে বিষক্রিয়া প্রতিরোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারব।

পাঠ–১ : পুষ্টির ধারণা ও এর প্রয়োজনীয়তা : বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের দৈহিক বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত হয়। শারীরিক এই বৃদ্ধিকে সহায়তা করার জন্য পুষ্টির প্রয়োজন। শরীরে শক্তি জোগানো, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধের জন্য বাড়ন্ত বয়সে সকল উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্যসামগ্রী যথাযথ পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়। পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ খাদ্য না খেলে শরীর ও মনের বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এজন্য অন্যান্য সময়ের তুলনায় বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন অনেক বেশি। এই বয়সে ছেলে–মেয়েরা পড়াশোনা, দৌড় ঝাঁপ, খেলাধুলা প্রভৃতি নিয়ে মেতে থাকে। শারীরিক পরিশ্রমের কারণে তাদের বেশি ক্যালরি বা খাদ্যশক্তির প্রয়োজন হয়। পুষ্টিমান কম এমন খাদ্য গ্রহণ করলে দেহের বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

খাদ্য উপাদান : খাদ্যে মোট ৬টি উপাদান আছে। এগুলো হলো প্রোটিন বা আমিষ, কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা, ফ্যাট বা স্নেহ, ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ, মিনারেলস বা খনিজ পদার্থ এবং পানি। যে খাদ্যে যে উপাদান আছে সেই খাদ্য সেই উপাদানের নামে পরিচিত। যেমন যে খাদ্যে আমিষ আছে তা আমিষ জাতীয় খাদ্য, যাতে শর্করা আছে তা শর্করা জাতীয় খাদ্য ইত্যাদি।

খাদ্য উপাদানের উৎস ও এর গুণাগুণ : খাদ্যের আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় উপাদান দেহ গঠন করে, দেহের বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করে। আমিষ জাতীয় খাদ্য দেহে কর্মশক্তি জোগায় এবং রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, পনির, ছানা, সব রকম ডাল, শিম জাতীয় সবজির বীজ ইত্যাদিতে আমিষ পাওয়া যায়। শর্করা ও শ্বেতসার প্রধানত তাপ ও কর্মশক্তি জোগায়। চাল, গম, ভুট্টা, আলু, চিনি, মধু, গুল, মিষ্টি ইত্যাদি শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় খাদ্য। চর্বি বা স্নেহ জাতীয় খাদ্য দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। মাখন, ঘি, চর্বি, সয়াবিন, সরিষার তেল, দুধ, মাছের তেল, নারিকেল তেল ইত্যাদিতে স্নেহ বা ফ্যাট রয়েছে। দেহের রোগ প্রতিরোধ করা ও দেহের ভিতরে বিভিন্ন কাজকর্ম সচল রাখা, দেহকে রক্ষা করা ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের কাজ। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, মাছের তেল, সবুজ ও লাল রঙের এর শাক-সবজি, ফল, সব রকমের ডাল, তেলবীজ, ঢেকি ছাঁটা চাল, ভুষিযুক্ত আটা, অঙ্কুরিত বীজ প্রভৃতি ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য। দেহের অভ্যন্তরীণ গঠনের কাজ সম্পাদনের জন্য খনিজ পদার্থ খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেহে লোহা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ থাকে এবং তা প্রতিদিন মলমূত্র এবং ঘামের সাথে বেরিয়ে গিয়ে শরীরের ক্ষয় সাধন করে। এ ক্ষয় পূরণের জন্য খনিজ লবণ পাওয়া যায় এমন খাদ্য যেমন লবণ, দুধ, দুধজাত খাদ্য, ছোট মাছ, মাংস, ডিমের কুসুম, নানা রকম ডাল, শাক-সবজি, লেবু, কলা, ডাবের পানি ইত্যাদি খেতে হয়। দেহের শতকরা ৭০ ভাগ পানি। পানি দেহের গঠন বজায় ও দেহকে ঠান্ডা ও সচল রাখে, খাদ্য হজমে সাহায্য করে, রক্ত চলাচলে ও দেহের ভিতরে খাদ্য পরিবহন এবং দেহের বর্জ্য নিঃসরণে সহায়তা করে। শরীর রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য যথাসময়ে সঠিক খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করা প্রয়োজন। সঠিক খাদ্য বলতে সুষম খাদ্যকে বুঝায়। সুষম খাদ্য শরীরে পুষ্টি জোগায়। উপরে উল্লেখিত খাদ্য উপাদানসমূহ যে সকল খাদ্যে যথাযথ অনুপাতে ও পরিমাণে থাকে তাই সুষম খাদ্য। বিভিন্ন বয়সে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিন্ন হয়। একটি শিশুর জন্য যতটুকু আমিষ, শর্করা ও অন্যান্য উপাদান সংবলিত খাদ্য প্রয়োজন, একজন কিশোর বা কিশোরীর প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি। অতএব বয়স, লিঙ্গ, দৈহিক কাঠামো অনুযায়ী এই সুষম খাদ্যের চাহিদারও ভিন্নতা হবে।

কাজ–১ : নিচের ছকে কলাম–১ ও কলাম–২ তে যথাক্রমে খাদ্যের নাম এবং তা দেহের কোন কাজে লাগে তা এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। প্রতিটি খাদ্যে দেহের যে কাজ করে তীর চিহ্ন দিয়ে তার সাথে মিলাও।

কলাম–১ খাদ্য	কলাম–২ প্রধানত দেহের যে কাজে লাগে
• চাল	• রোগ প্রতিরোধ করে
• রঙিন শাক-সবজি	• দেহের খনিজ পদার্থের চাহিদা পূরণ করে
• সব রকমের ফল	• রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে
• আয়োডিনযুক্ত লবণ	• দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন করে
• কচু শাক	• রক্ত চলাচলে সাহায্য করে
• মাংস ও ডিম	• রোগ প্রতিরোধ করে
• পানি	• দেহের ক্ষয়পূরণ করে
• মাখন	• দেহের গঠন ও বৃদ্ধি সাধন করে
• সব রকমের ডাল	• তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে

পাঠ–২ : পুষ্টিহীনতার কারণ ও প্রতিকার : বেঁচে থাকা, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং শরীরের বৃদ্ধির জন্য মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য দেহের পুষ্টিসাধন করে। সুন্দর স্বাস্থ্য, সুস্থ মন, কাজে উৎসাহ ও পরিশ্রম করার প্রবণতা সুপুষ্টির লক্ষণ। পরিশ্রম করার জন্য শক্তির দরকার। পুষ্টিকর খাদ্য মানুষের পরিশ্রম করার জন্য শক্তির জোগান দেয়। খাদ্যের ছয়টি পুষ্টি উপাদান দেহে এসব কাজ করে দেহের পুষ্টি সাধন করে।

খাদ্য উপাদানের কাজ : খাদ্য উপাদানের কাজের ভিন্নতা রয়েছে। এসব উপাদান দেহের গঠন, বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, তাপ ও কর্মশক্তি সরবরাহ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও সচল রাখা, রক্ত চলাচল, পুষ্টি পরিবহন, দেহবর্জ্য অপসারণ, দেহ শীতলীকরণ প্রভৃতি বহুমাত্রিক কাজ করে।

সুষম খাদ্য ও চাহিদা : খাদ্যের ৬টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবারকে সুষম খাদ্য বলে। তবে বয়স ও লিঙ্গ ভেদে সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিন্ন হয়। যেমন একটি শিশুর জন্য যতটুকু আমিষ, শর্করা ও অন্যান্য উপাদান সংবলিত খাদ্য প্রয়োজন, একজন কিশোর বা কিশোরীর প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি। আবার একজন শ্রমিক বা খেলোয়াড়ের খাদ্যের পরিমাণ তার থেকে আরও বেশি হবে।

পুষ্টিহীনতার ফলে সৃষ্ট রোগ : শিশুর খাদ্যে আমিষের পরিমাণ কম হলে মাংসপেশি গড়ে ওঠার বদলে ক্ষয় পেতে থাকে। শরীরে পানি আসে, ফুলে যায় ও শিশু নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এ রোগের নাম কোয়াশিওরকর। আমিষ, শর্করা, চর্বি প্রভৃতি পুষ্টির অভাবে শিশু মেরাসমাস রোগে আক্রান্ত হয়। এটা শিশুর আমিষ ও

প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যালরির অভাবজনিত রোগ। লৌহ, আমিষ ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান রক্তের রক্তকণিকা তৈরি করে। খাদ্যে এ সব উপাদানের ঘাটতি থাকলে রক্তস্বল্পতা বা এনিমিয়া হয়। খাদ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি'র অভাব হলে শিশুর রিকেটস রোগ হয়। আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড হয়। ভিটামিনে এ'র অভাব হলে রাতে দেখতে অসুবিধা হয়। থিয়ামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ, রিবোফ্লাবিনের অভাবে ঠোঁটে, জিহ্বায় ও মুখে ঘা, ভিটামিন সি'র অভাবে স্কার্ভি প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়।

পুষ্টিহীনতার কারণ : পুষ্টিহীনতার প্রধান কারণ অজ্ঞতা ও অসচেতনতা। পরিবারের বাড়ন্ত শিশুদের চাহিদা বাদ দিয়ে বয়স্ক ব্যক্তিদের মাছের মাথা, দুধের সর, পনির, চর্বিসহ মাছ বা মাংসের বড় টুকরা পরিবেশন করা মারাত্মক ভুল। বয়স্ক লোকের যেমন আমিষ ও চর্বির চাহিদা কম হয় তেমনি এর বিপরীতে বাড়ন্ত শিশু, কিশোর-কিশোরীদের চাহিদা হয় অনেক বেশি। খাদ্য পরিবেশনে ভুল নীতির দরুণ পুষ্টিহীনতা খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

পুষ্টিহীনতার প্রতিকার

১। দামি খাদ্যের পরিবর্তে একই পুষ্টিমান ও উপাদানসমৃদ্ধ কম মূল্যের খাদ্যের বিষয়ে পরিবারের প্রধানকে জানতে ও জানাতে হবে।

২। খাদ্য সম্পর্কে কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা যেমন হাঁসের ডিম, বোয়াল মাছ, গজার মাছ, মিষ্টি কুমড়া প্রভৃতি খাওয়া যাবে না– পরিহার করতে হবে।

৩। বাবা-মাকে পুষ্টিমানযুক্ত খাবারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে হবে।

৪। অধিক সময় ধরে রান্না করলে অনেক শাক-সবজি খাবারের খাদ্যগুণ নষ্ট হয় তা মাকে জানাতে হবে।

৫। শাক-সবজি রান্নার আগে ধুয়ে নিতে হবে। কাটার পর ধোয়া চলবে না।

৬। আমিষ জাতীয় খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য বাড়িতে হাঁস, মুরগি, গাভী পালনের জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৭। বড় মাছের দাম বেশি বলে এগুলোর পরিবর্তে ছোট মাছ খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৮। খাদ্য উপাদান অনুসারে একটি তালিকা তৈরি করে সেখান থেকে দৈনন্দিন খাদ্য বাছাই করে পরিবারে জোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। পুষ্টি, পুষ্টিহীনতা, প্রতিকার প্রভৃতি বিষয়ে রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

কাজ–১ : তোমাদের এলাকায় যে সব খাদ্য স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায় সে সকল খাদ্যের নাম দিয়ে একটি সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি কর।

কাজ–২ : পুষ্টিহীনতার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ ধারাবাহিকভাবে লিখ।

পাঠ–৩ : বয়স অনুসারে খেলোয়াড়দের খাদ্য তালিকা ও ক্যালরির চাহিদা : খাদ্য দেহের পুষ্টি সাধন করে। সুন্দর স্বাস্থ্য, সুস্থ মন, কাজে উৎসাহ ও পরিশ্রম করার প্রবণতা সুপুষ্টির লক্ষণ। পরিশ্রম করার জন্য শক্তির দরকার। যে কোনো হাতিয়ার যেমন– দা, কুড়াল, ছুরি দিয়ে কাজ করলে এক সময় সেগুলো ভোঁতা হয়ে যায়, কাঠ ব্যবহারের ফলে ক্ষয় হয়, জুতা পুরনো হলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হাতের আঙুল দিয়ে অনবরত কাজ করা হলে কিংবা পা দিয়ে হাঁটা বা অন্য কাজ করা হলে তা ক্ষয় হয়ে যায় না। কারণ খাদ্য দেহের ক্ষয়পূরণ করে, পরিশ্রম করার শক্তি দেয়। মোট কথা খাদ্য দেহ যন্ত্রকে সচল ও কর্মক্ষম রাখে। খাদ্যের ছয়টি পুষ্টি উপাদান দেহে এসব কাজ করে দেহের পুষ্টি সাধন করে। ছয়টি খাদ্য উপাদান যথা আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, অজৈব লবণ, ভিটামিন ও পানি যথাযথ পরিমাণে যে খাদ্যে পাওয়া যায় তাকে সুষম খাদ্য বলে। সুষম খাদ্যের এসব উপাদানের কাজ বিভিন্ন প্রকারের। বয়স, দেহের ওজন এবং পরিশ্রমের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির খাদ্য চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন শৈশবে সর্বাধিক আমিষের দরকার। শারীরিক পরিশ্রম হয় এমন ব্যক্তির তাপ উৎপাদনকারী খাদ্য পুষ্টির প্রয়োজন। সন্তানসম্ভবা এবং প্রসূতি মায়ের খাদ্যপুষ্টির চাহিদা সাধারণ স্ত্রী লোকের চেয়ে বেশি। আবার রোগ ভোগের পর পুষ্টির চাহিদা স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা বেশি থাকে। একজন খেলোয়াড় খেলাধুলা করার জন্য অনেক বেশি পরিশ্রম করে বলে তার খাদ্য চাহিদা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকে।

শক্তি ও ক্যালরির পরিমাণ : আমিষ, শর্করা ও চর্বি জাতীয় খাদ্য পরিপাক হওয়ার পর দেহে তাপ উৎপন্ন করে। খাদ্য হতে উৎপন্ন তাপ মেপে খাদ্যের ক্যালরির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। খাদ্যের ক্যালরি মূল্য কিলোক্যালরিতে প্রকাশ করা হয়। যেমন– ২৫০ গ্রাম দুধ থেকে ১৬৫ কিলোক্যালরি এবং এক চা চামচ চিনি থেকে ১৬ কিলোক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়। খাদ্যে নিহিত তাপ দেহযন্ত্রকে সচল রাখে, শরীরে কাজ করতে শক্তি দেয়। খেলাধুলা করার জন্য, দৌড়ানো, রিকশা বা ঠেলাগাড়ি চালানো, নির্মাণ শ্রমিকের কাজ প্রভৃতিতে বেশি শক্তি ব্যয় হয়। শরীরের ওজন বেশি হলেও কাজে বেশি শক্তি ব্যয় হয়। দেহের প্রয়োজনীয় শক্তিকে তাপের আকারে এবং কিলোক্যালরির হিসাবে উল্লেখ করা যায়। হালকা, মাঝারি ও ভারী কাজ করার জন্য কতটুকু কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয় তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো। এই তালিকার মধ্যে দৌড়ানো ও খেলাধুলার জন্য শক্তির উল্লেখ রয়েছে।

প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য প্রতি ঘণ্টায় শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ–

কাজের ধরন	শক্তি (কিলোক্যালরি)
গোসল , পোশাক পরা, খাওয়া ইত্যাদি দৈনন্দিন কাজ	৩–৪
বসা বা দাঁড়িয়ে থাকা	১.৫–১.৯
পায়ে হাঁটা	৩–৫
স্কুল-কলেজে পড়াশুনা, লেখা, সেলাই, টাইপ করা, রান্নাবান্না ইত্যাদি	১.৫–২
জুতার মিস্ত্রি, মিস্ত্রির মতো মাঝারি শ্রম	২.৫–৪.৫
কাঠ চেরাই, পাথর ভাঙ্গা, বোঝা বওয়া প্রভৃতি ভারী শ্রমের কাজ	৫–১০
দৌড়ানো ও খেলাধুলা	৪–৮

কিলোক্যালরি শক্তি পরিমাপের পদ্ধতি : কোনো কাজ করার জন্য কার কতটুকু শক্তির দরকার তা উপরের তালিকা থেকে নির্ণয় করা যাবে। উদাহরণ স্বরূপ– ৫৫ কেজি ওজনের একজন খেলোয়াড়ের দুই ঘণ্টা খেলার কাজে শক্তি খরচ হবে– ৫৫ কেজি × ২ ঘণ্টা × ৪ কি: ক্যা: = ৪৪০ কিলোক্যালরি। সুতরাং কাজ করার জন্য কী পরিমাণ শক্তির দরকার তা নির্ভর করে দেহের ওজন ও কাজের ধরনের উপর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালরি দেহে মেদ বৃদ্ধি করে। একজন পুরুষ ও একজন মহিলার দৈনিক ক্যালরির চাহিদার ভিন্নতা রয়েছে। পুরুষের প্রতি পাউন্ড ওজন ২১ দিয়ে এবং মহিলার ওজন ১৮ দিয়ে গুণ করে যে গুণফল পাওয়া যাবে তাই হবে তাদের ক্যালরির দৈনিক চাহিদা। ওজন কমাতে বা বাড়াতে হলে দৈনিক ক্যালরির চাহিদা এক-তৃতীয়াংশ ক্যালরি কম বা বেশি খেতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে দৈনিক যে পরিমাণ ক্যালরির প্রয়োজন তা তিন বেলার আহার থেকে গ্রহণ করা উচিত।

বয়স অনুসারে খাদ্য উপাদানের দৈনন্দিন চাহিদা

বয়স	শক্তি (কি: ক্যালরি)	প্রোটিন (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি: গ্রাম:)	লৌহ (মি: গ্রাম:)	ভিটা–এ (মি: গ্রাম:)	ভিটা:বি-১ (মি: গ্রাম:)	ভিটা:বি-২ (মি: গ্রাম:)	ভিটা:সি (মি: গ্রাম:)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
কিশোর-কিশোরী (১৩–১৫ বছর)	২৫০০ ২২০০	৫৫ ৫০	০.৬-০.৭ ০.৬-০.৭	২৫ ৩৫	৩০০০ ৩০০০	১.৩ ১.১	১.৪ ১.২	৩০-৫০ ৩০-৫০
ছেলে–মেয়ে (১৬–১৮ বছর)	৩০০০ ২২০০	৬০ ৫০	০.৫–০.৬ ০.৫–০.৬	২৫ ৩৫	৩০০০ ৩০০০	১.৫ ১.১	১.৭ ১.২	৩০–৫০ ৩০–৫০
প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ	২৪০০	৫৫	০.৫	২০	৩০০০	১.২৫	১.৩	৫০
প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোক	১৯০০	৪৫	০.৫	৩০	৩০০০	১.০০	১.০০	৫০

বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েদের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ :

খাদ্যের মৌলিক শ্রেণি	ছেলে		মেয়ে
	১৩–১৫ বছর গ্রাম	১৬–১৮ বছর গ্রাম	১৩–১৮ বছর গ্রাম
দুধ বা দুধজাত খাদ্য	১৮৭.৫	১৮৭.৫	১৮৭.৫
ডিম (সপ্তাহে ৩ দিন)	১টি	১টি	১টি
মাছ-মাংস	৬২.৫	৬২.৫	৬২.৫
ডাল	৬২.৫	৬২.৫	৬২.৫
বাদাম (মাঝে মাঝে)	৬২.৫	৬২.৫	৬২.৫
ফল	৬২.৫	৬২.৫	৬২.৫

খাদ্যের মৌলিক শ্রেণি	ছেলে		মেয়ে
	১৩–১৫ বছর গ্রাম	১৬–১৮ বছর গ্রাম	১৩–১৮ বছর গ্রাম
সবুজ শাক	১২৫.০	১২৫.০	১৪০.০
অন্যান্য সবজি	১৮৭.৫	২৫০.০	১৮৭.৫
ভাত	১৮৭.৫	২৫০.০	১৮৭.৫
রুটি	১৮৭.৫	১৮৭.৫	১২৫.০
আলু	৬২.৫	৬২.৫	৬২.৫
চিনি/গুড়	৩১.২৫	৪৬.৫	৩১.২৫
তেল/চর্বি	৪৬.৫	৬২.৫	৪৬.৫

কাজ–১ : বিভিন্ন প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের উপর কী পরিমাণ কিলোক্যালরি শক্তি ব্যয় হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

কাজ–২ : বাড়ন্ত ছেলে-মেয়েদের দৈনিক খাদ্য চাহিদা একটি ছকে উল্লেখ কর।

পাঠ–৪ : খাদ্যে বিষক্রিয়া, কারণ ও প্রতিবিধান : আমরা যা খাই তাকেই খাদ্য বলা হয় না। বরং যা খেলে আমাদের শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন ও তাপ সংরক্ষণের কাজ সম্পন্ন হয় তাকে খাদ্য বলে। শারীরিক ক্রিয়াকর্মের কারণে প্রতিনিয়ত আমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। খাদ্য দ্বারা আমাদের শরীরের এই ক্ষয়পূরণ হয় এবং দেহ কর্মক্ষম থাকে। তবে এ সকল খাদ্য হতে হবে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এবং সুষম। পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্যও আবার শরীরের উপকার না করে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্য যদি দূষিত হয়ে পড়ে তাহলে দূষিত খাবার খেয়ে যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে। দূষিত খাদ্য বিষাক্ত এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করে। যে খাদ্য বা পানীয় খাদ্যনালির ও পাকস্থলীর অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু দ্বারা বিষাক্ত হয় সে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করলে ফুড পয়জনিং বা খাদ্যে বিষক্রিয়া হয়।

কারণ : সাধারণত ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) দ্বারা সংক্রমিত অথবা টক্সিন (Toxin) বা বিশেষ ধরনের জৈববিষ দ্বারা খাদ্যে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ব্যাকটেরিয়া নানাভাবে প্রবেশ করে। যেমন– খাবার তৈরি করে অনেকক্ষণ রেখে দেওয়া, খাবার তৈরির আগে, তৈরির সময় এবং পরে, বাজার থেকে সংক্রমিত খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের সময়, ক্ষতিকর কীট–পতঙ্গের সংস্পর্শে প্রভৃতি বিভিন্নভাবে খাদ্য বিষাক্ত হতে পারে। আবার প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করলে তা পচে গিয়ে টক্সিন বিষ তৈরি হয়। এরূপ পচা খাদ্য গ্রহণ করলে ফুড পয়জনিং হবে। এছাড়া বিষাক্ত জীবজন্তুর মাংস, বিষাক্ত জীব–জন্তুর সাথে নির্গত রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রমিত খাদ্য, অপরিস্কার ও অপরিষ্কার হাত দিয়ে তৈরি খাদ্য, বিষক্রিয়ার আক্রান্ত হাঁস-মুরগির মাংস, প্রভৃতিও খাদ্যে বিষক্রিয়ার অন্যতম কারণ।

বিষক্রিয়ার লক্ষণ : ব্যাকটেরিয়াজনিত দূষিত খাবার থেকে পাকস্থলীর অন্ত্রে উত্তেজনা সৃষ্টি করে; ফলে বমি বমি ভাব, বমি, তলপেটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা এবং পানি শূন্য হয়ে শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। আর টক্সিনজাত বিষাক্ত খাদ্য শরীরের জন্য মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। বমি, কোষ্ঠবদ্ধতা, দৃষ্টিশক্তির বিকৃতি, স্নায়ুর পক্ষাঘাত, দুর্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। এ ধরনের ফুড পয়জনিংকে বটিউলিজম বলা হয়। এরূপ বিষক্রিয়ার লক্ষণ খাদ্য গ্রহণের ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা পরে দেখা যায়। যথাসময়ে চিকিৎসা গ্রহণ না করলে রোগী কয়েক দিনের মধ্যে মারা যায়।

প্রতিবিধান

১। খাদ্য প্রস্তুত করার পূর্বে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।

২। সংক্রমণ থেকে খাদ্যকে সুরক্ষিত করার জন্য খাদ্যের প্রস্তুতি, সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। নিরাপদ দূষণমুক্ত পানি পান করতে হবে।

৪। কাঁচা তরিতরকারি, মাছ-মাংস যাতে রান্না করা খাবারের সংস্পর্শে না থাকে সে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫। রান্না করা খাবার নির্ধারিত তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। রান্নার কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে।

চিকিৎসা : বমি বমি ভাব বা বমি হলে বমি নিরোধক ঔষধ গ্রহণ করতে হবে। পানিশূন্যতা রোধে মুখে খাওয়ার স্যালাইন ORS- (Oral Rehydration Solution) খেতে হবে। ফুড পয়জনিংয়ের ফলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে অথবা দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

কাজ–১ : কীভাবে খাদ্যে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা ধারাবাহিকভাবে লিখ এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

কাজ–২ : খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে বিষাক্ত খাবার খেলে কী কী লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং কীভাবে এর প্রতিবিধান করা যায় তার দুটি তালিকা আলাদাভাবে তৈরি করবে।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও

১.১ সুষম খাদ্য কাকে বলে?

ক. দুধ মিশ্রিত খাবারকে
খ. মাংস দ্বারা তৈরি খাবারকে
গ. ৬টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবারকে
ঘ. শাক-সবজি দ্বারা তৈরি খাবারকে

১.২ খাদ্য দ্রব্য কীভাবে দূষিত হয়?

ক. খোলা রাখলে
খ. গরম করলে
গ. ভালোভাবে সিদ্ধ না করলে
ঘ. ফ্রিজে রাখলে

১.৩ ব্যাকটেরিয়াজনিত দূষিত খাবার খেলে কী হয়?

ক. জ্বর হয়
খ. তলপেটে ব্যথা হয়
গ. শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়
ঘ. কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. ভিটামিন সি-এর অভাব হলে............রোগ হয়।

খ. ভিটামিন এ-এর অভাব হলে..............রোগ হয়।

গ. সয়াবিন............জাতীয় খাদ্য।

ঘ. আয়োডিনের অভাবে...........রোগ হয়।

ঙ. ....অভাবে জিহ্বায় ও মুখে ঘা হয়।

৩. বাম পাশের কথামালার সাথে ডান পাশের কথামালার মিল কর।

ক. মাছ, মাংস	ক. বিষক্রিয়া
খ. চাল, গম	খ. স্যালাইন
গ. মাখন, ঘি	গ. তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে
ঘ. টক্সিন	ঘ. তাপ ও কর্মশক্তি জোগায়
ঙ. পানিশূন্যতা	ঙ. কর্মশক্তি ও রোগ প্রতিরোধ করে

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. পুষ্টিকর খাদ্য কাকে বলে?

খ. পুষ্টিহীনতা বলতে কী বুঝ?

গ. শক্তি ও ক্যালরি কাকে বলে?

৫. রচনামূলক প্রশ্ন :

ক. পুষ্টিহীনতার কারণ ও এর প্রতিকারগুলো বর্ণনা কর।

খ. বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের দৈনিক খাবারের তালিকা প্রস্তুত কর।

গ. খাদ্যে বিষক্রিয়ার প্রতিরোধের উপায়গুলো বর্ণনা কর।

ঘ. বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের গুণাগুণ বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাদকাসক্তি ও এইডস

মাদকাসক্তি হলো ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর এমন একটি মানসিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা জীবিত ব্যক্তি ও মাদকের পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। যে দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটে এবং ঐ দ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীলতা সৃষ্টি, পাশাপাশি দ্রব্যটি গ্রহণের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এমন দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। ব্যক্তির এই অবস্থাকে বলে মাদকাসক্তি। তাই মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি বা নেশাকে বুঝায়। সিগারেট, বিড়ি, তামাক, চুরুট, মদ, গাঁজা, চরস, আফিম, মারিজুয়ানা, হেরোইন, মরফিন, ফেনসিডিল, ইয়াবা ইত্যাদি মাদকদ্রব্য। এ এক ভয়ংকর নেশা, এ নেশা থেকে সহজে কেউ পরিত্রাণ পায় না। আমাদের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকার কারণে শরীরে কোনো রোগজীবাণু প্রবেশ করলে সহজে শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু এমন কিছু ক্ষতিকর ভাইরাস আছে যা শরীরের রোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে। এইচআইভি তেমনই একটি ভাইরাস। এইচআইভি ভাইরাস রক্ত, বীর্য, যোনিরস, বুকের দুধ প্রভৃতির মাধ্যমে অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়। কোনো মানুষের শরীরে এই ভাইরাস প্রবেশ করলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, প্রচলিত চিকিৎসায় সে সুস্থ হয়ে ওঠে না। এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত ব্যক্তির অবস্থাকে এইডস বলে।

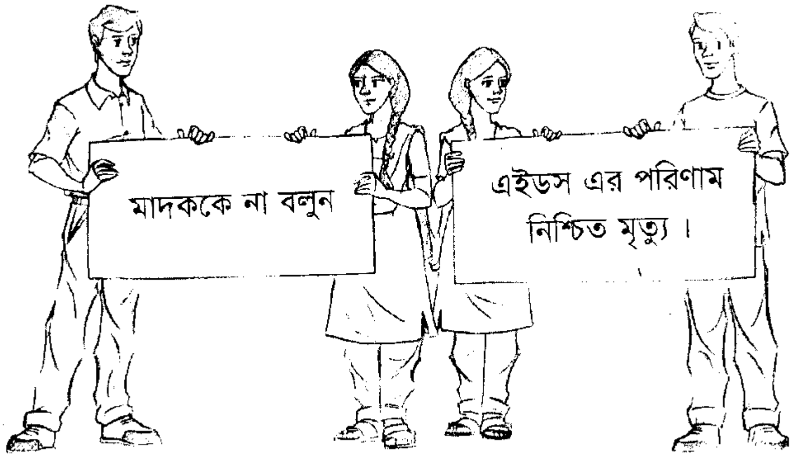

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- মাদকাসক্তির কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারব।
- তামাক ও মাদক দ্রব্য সেবনের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধূমপান ও মাদক থেকে বিরত থাকার কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ মাদকমুক্ত থাকার ব্যাপারে অন্যদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- HIV-AIDS-এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

- HIV-AIDS-এর বিস্তার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- HIV-AIDS-এর বিস্তার প্রতিরোধে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- HIV-AIDS-থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- HIV-AIDS-প্রতিরোধে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবাদানের ধরন সম্পর্কে জানতে পারব।
- ধূমপান ও মাদকের/কুফল উপলব্ধি করে এগুলি পরিহার করার ব্যাপারে সচেতন হব।
- মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে সমর্থ হব।
- HIV-AIDS-এর পরিণতি উপলব্ধি করে পরিশীলিত জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হব।
- অটিজমের লক্ষণ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারব।

পাঠ-১ : মাদকাসক্তি, তামাক ও মাদকদ্রব্য এবং তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল : মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি বা নেশাকে বুঝায়। যে সব দ্রব্য সেবন বা পান করলে তীব্র নেশার সৃষ্টি হয় সেগুলো মাদকদ্রব্য। কোনো কোনো ঔষধকে ব্যবহারগত কারণে মাদকদ্রব্য বলা হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ঔষধ অতিরিক্ত সেবন করলে এবং এর প্রতি আসক্তি জন্মালে সেটাও মাদকদ্রব্যের আওতায় পড়ে। অতএব যেসব দ্রব্য সেবন করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এবং সেগুলোর প্রতি সেবনকারীর প্রবল আসক্তি জন্মে সে সব দ্রব্যকে মাদকদ্রব্য বলে। যেমন- বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, মদ, গাঁজা, ভাং, হেরোইন, আফিম, পেথিডিন, ফেনসিডিল, ঘুমের ঔষধ ইত্যাদি। যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে মাদকদ্রব্যের প্রতি তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। তারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। যদি কোনো কারণবশত তারা মাদক গ্রহণ করতে না পারে, তাদের মধ্যে মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক উপসর্গের সৃষ্টি হয়। যেমন- মেজাজ খিটখিটে হয়, ক্ষুধা ও রক্তচাপ কমে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়, আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে।

ঔষধ ও মাদকদ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য :

১. ঔষধ সেবন করলে রোগমুক্তি ঘটে, মাদক সেবনে শরীরের নানা রোগের সৃষ্টি হয়।

২. ঔষধ গ্রহণের মাত্রা নির্ধারিত থাকে, মাদকের মাত্রা নির্ধারিত থাকে না।

৩. অসুখ সেরে গেলে ঔষধ খাওয়ার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মাদকে আসক্ত হলে সহজে ছাড়া যায় না।

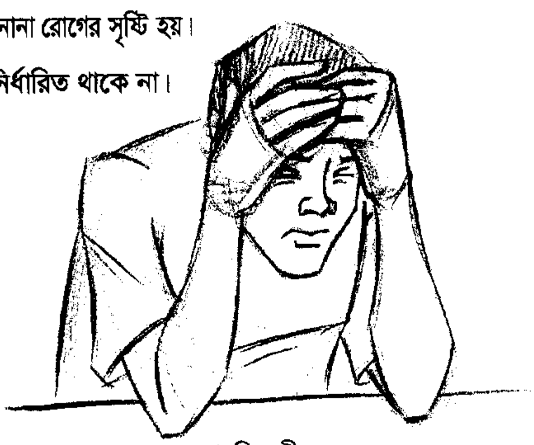
মানসিক পীড়ন

বাংলাদেশে যে সকল মাদকদ্রব্য প্রচলিত আছে সেগুলো হলো হেরোইন, আফিম, পেথিডিন, ফেনসিডিল, গাঁজা জাতীয়- মারিজুয়ানা, ভাং, চরস, ইয়াবা এবং ঘুমের ঔষধ, মদ এবং তামাক জাতীয় মাদকদ্রব্য। তামাক গাছের পাতা থেকে তামাক জাতীয় মাদকদ্রব্য তৈরি হয়। তামাক পাতায়

নিকোটিন থাকে যা এক ধরনের মাদক। তামাক পাতা দিয়ে বিড়ি, সিগারেট, চুরুট,পানের জর্দা , গুল, নস্যি ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

মাদকদ্রব্য গ্রহণের মাধ্যম : যারা মাদকসেবী তারা নানা পদ্ধতি ও মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সেবন করে। যেমন ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো, ট্যাবলেট, পাউডার বা সিরাপ হিসেবে খাওয়া, পানীয় হিসেবে পান করা, ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করা। ধূমপানেরও আবার নানা ধরন আছে। যেমন–সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, হুঁকা ইতাদি।

তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল : তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবন বলতে প্রধানত ধূমপানকে বুঝায়। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে পৃথিবীতে প্রতি ৮ সেকেন্ডে শুধু ধূমপানজনিত কারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে। যারা ধূমপান করে তারা ও ধূমপায়ী ব্যক্তির ছেড়ে দেওয়া ধোঁয়া থেকে অন্যরা নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মাদকদ্রব্য সেবনের কুফলসমূহ হচ্ছে–

১. মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। যেমন– শেখার ও কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস করে, চাপ সহ্য করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে। তাছাড়া মানসিক পীড়ন বাড়িয়ে দেয়।

২. পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যন্ত্রণাদায়ক প্রভাব ফেলে। মাদকসেবী পরিবারের সদস্যদের সাথে উগ্র আচরণ করে, পরিবারের শান্তি বিনষ্ট করে।

৩. শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। মাদকদ্রব্য সেবন মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে ধ্বংস করে, খাদ্যাভ্যাস নষ্ট করে, চোখের দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দেয়।

৪. কিছু কিছু মাদক এইচআইভি ও হেপাটাইটিস–বি-এর সংক্রমণের আশংকা বাড়িয়ে দেয়। খাদ্যনালি ও ফুসফুসের ক্যান্সার, কিডনির রোগ, রক্তচাপ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের সৃষ্টি করে।

৫. আর্থিক ক্ষতি হয়। নেশার টাকা জোগাতে গিয়ে সংসারে অভাব ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

কাজ–১ : মাদক সেবনকারীদের মাদকের উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। এই নির্ভরশীলতার ফলে কী কী ঘটে তা নিচে উল্লেখ কর।

১.

২.

৩.

৪.

কাজ–২ : মাদকদ্রব্য গ্রহণের ৪টি কুফল লিখ।

১.

২.

৩.

৪.

পাঠ–২ : ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকার উপায় এবং এ সম্পর্কে অন্যদের ভূমিকা : ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে পূর্ববর্তী পাঠে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য বিষয়টি সম্পর্কে শুধুমাত্র জানাই যথেষ্ট নয়। মানুষের জীবনের জন্য ক্ষতিকর এমন মারাত্মক অভ্যাসটি যাতে ত্যাগ করা যায় এবং এখনই সে বিষয়ে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য প্রথমই দরকার কখনো কোনো অবস্থাতেই ধূমপানসহ অন্য কোনোভাবে মাদকদ্রব্য গ্রহণ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কারণ কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে অজানা বিষয়ের প্রতি প্রচণ্ড কৌতূহল থাকে। এই কৌতূহল ও উত্তেজনাবশে কিংবা বন্ধুবান্ধবসহ কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা ধূমপান বা মাদক সেবন করতে পারে। এই কৌতূহল বা উত্তেজনা পরে তার সারা জীবনের জন্য অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই কৌতূহল মিটাবার পূর্বে ঐ কিশোর বা কিশোরীকে ভাবতে হবে ধূমপান বা মাদক সেবনের কী কী কুফল দেখা দেবে এবং এই কুফলসমূহ বিবেচনা করলে তার মাদক সেবন করা উচিত হবে কি না। ধূমপান ও মাদক সেবন থেকে বিরত থাকতে হলে নিচের ধারাবাহিক কার্যক্রমগুলো অনুসরণ করতে হবে। যেমন–

১। ধূমপান ও মাদক সেবনের ফলে কী অবস্থা হয়, প্রথমে তা মনে মনে ভাববে।

২। ধূমপান বা মাদক সেবনের ফলে মা-বাবা, ভাই-বোন বা অভিভাবক এক অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়বেন, লজ্জিত হবেন। শিক্ষকেরা বিষয়টিকে ভালোভাবে গ্রহণ করবেন না। এ অবস্থা যাতে না হয় সেজন্য ভাবতে ও বিবেচনা করতে হবে।

৩। এরপর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মনস্থির করবে। ধূমপান বা মাদক সেবন না করার বিষয়ে প্রথমেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারলে এই সর্বনাশা কাজ থেকে বিরত থাকা যায়।

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রথমে পরিস্থিতি, সমস্যা, বিপদ চিহ্নিত করে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা অন্য কোনো সূত্রে সংগ্রহ করতে হবে। তথ্যের প্রেক্ষিতে করণীয় সমাধান চিহ্নিত করে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।

৫। ধূমপান ও মাদক সেবন থেকে শুধু নিজে বিরত থাকলে চলবে না, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠী, পরিচিতজনকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে তারা যেন এই মারাত্মক নেশা থেকে দূরে থাকে।

৬। মাদকদ্রব্য সেবনের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর দিক জেনে সবার উচিত এ থেকে নিজে মুক্ত থাকা, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যদেরকে এর কবল থেকে মুক্ত থাকতে অর্থাৎ মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে সবাইকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা।

মাদকমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে অন্যদের ভূমিকা : মাদকাসক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধবদের ক্ষতিকর প্রভাব বেশ বড় ভূমিকা পালন করে। তবে সব বন্ধুই কি মাদকাসক্ত, নিশ্চয়ই না। দু'একজন হয়ত দুর্ভাগ্যক্রমে মাদকাসক্ত হয়, তবে বেশির ভাগ বন্ধুই ভালো হয়। এই ভালো বন্ধুরাই অন্য বন্ধুদেরকে মাদক গ্রহণ না করার জন্য প্রভাবিত করতে পারে। মাদকমুক্ত থাকার ক্ষেত্রে বন্ধু বা সমবয়সী ছাড়াও আরও অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন– সন্তানের প্রতি অভিভাবকের সতর্ক দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রদের কাছে শিক্ষক আদর্শস্বরূপ। শিক্ষকের আদেশ ও উপদেশ ছাত্ররা আন্তরিকভাবে পালন করে। শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষকের আদেশ ও উপদেশে

ছাত্ররা মাদক পরিহার করে চলতে পারে। আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীরাও স্নেহ, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা দিয়ে ছেলেমেয়েদের মাদকমুক্ত থাকতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম যেমন– পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন মাদক বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। এর বাইরে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেও মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায়।

কাজ–১ : মাদকদ্রব্য গ্রহণের এমন ৪টি কুফল লিখ যা ভাবলে তুমি কখনো ধূমপান ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে পারবে না।
১. ২. ৩. ৪.
কাজ–২ : তোমাদের স্কুলকে ধূমপানমুক্ত রাখার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার ?

পাঠ–৩ : মাদকাসক্তির ঝুঁকি, ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল : যারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাদের সংখ্যা অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। মাদকাসক্তদের একটা বড় অংশ হচ্ছে কিশোর-কিশোরী ও তরুণ। এ ছাড়াও রয়েছে পথশিশু, শ্রমজীবী শিশু, বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকজন যেমন– শ্রমিক, ব্যবসায়ী, রিক্সাচালক, বাস-ট্রাক চালক, অন্যান্য পেশার লোকজন এবং যৌনকর্মী। তাদের মধ্যে মাদকাসক্তি বিস্তারের বিভিন্ন কারণের মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে মাদক প্রাপ্তির সহজলভ্যতা। অন্যান্য যে সব কারণ রয়েছে তা হলো হতাশা, বেকারত্ব, পারিবারিক অশান্তি, কৌতূহল, মন্দ বন্ধুদের কাছ থেকে এক ধরনের চাপ ইত্যাদি।

মাদকাসক্তির ঝুঁকি : মাদকদ্রব্য গ্রহণের জন্য কিশোর-কিশোরীদের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়। বন্ধু বা সহপাঠীদের মধ্যে কেউ মাদক-সেবী থাকলে সে প্রস্তাব দিতে বা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া যারা মাদক ব্যবসায়ী বা মাদক বিক্রেতা তারাও কিশোর-কিশোরীদের মাদক গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করতে পারে। এভাবে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বন্ধুরা চাপ সৃষ্টি করলে যদি কেউ চাপের কাছে নতি স্বীকার করে মাদক গ্রহণ করা শুরু করে তবে তার সর্বনাশ ঘটে। আবার মাদক গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বন্ধুত্ব নষ্ট হয়। বন্ধু বা সহপাঠী ছাড়া অন্য কেউ যদি মাদক গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করে এবং তা প্রত্যাখ্যান করলে তার দ্বারা ক্ষতির আশংকা থাকে। এ ধরনের ঝুঁকির পরিস্থিতি যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলা : প্রথমেই দেখতে হবে মাদক গ্রহণের জন্য যে বা যারা প্ররোচনা দিচ্ছে তার বা তাদের আচরণ, ক্ষমতা, প্রভাব কেমন। এসব দিক বিবেচনা করে মাদক গ্রহণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হবে যাতে কোনো ক্ষতির আশংকা না থাকে। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার সময় নিজেকে সংযত রাখতে হবে। আর যদি সরাসরি 'না' বলতে পারা না যায় তাহলে কৌশলে পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য সে স্থান ত্যাগ করতে হবে। চাপ সৃষ্টি করা ব্যক্তি যদি বন্ধু বা পরিচিত জন হয় তবে এমনভাবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হবে যেন সম্পর্ক নষ্ট না হয়। আর যদি মনে হয় যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কোনো সমস্যার সৃষ্টি হবে না তাহলে তাকে মাদকের কুফল সম্পর্কে বোঝাতে হবে এবং এ পথ থেকে তাকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। আর মাদক গ্রহণের জন্য যদি চাপ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি কোনো ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তবে অবিলম্বে মা-বাবা বা অভিভাবক কিংবা স্কুলের শিক্ষকদেরকে বিষয়টি জানাতে হবে। সর্বনাশা মাদক থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হলে কৌতূহলের বশবর্তী হয়েও কোনো মাদক গ্রহণ করা যাবে না। যে কোনো মাদক নিঃসন্দেহে নিজের, পরিবারের ও সমাজের জন্য খারাপ। সর্বোপরি মাদক গ্রহণ না করার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে।

কাজ–১ : মাদকাসক্তির ফলে নিজের ও পরিবারের উপর কী কী প্রভাব পড়ে?

কাজ–২ : কোনো ব্যক্তি মাদকগ্রহণ করে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এর মধ্যে একটি ক্ষেত্রের সমস্যা উল্লেখ করে তার সমাধান কী হবে তা সংক্ষেপে লিখ।

পাঠ–৪ : মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে জনমত গঠন : মাদকাসক্তি বর্তমান সমাজের জন্য একটি বড় সমস্যা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও মাদকাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে এবং তা ক্রমান্বয়ে প্রকট আকার ধারণ করছে। যারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে তারা তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না বটে, কিন্তু মাদক গ্রহণের কারণে তারা নানা ধরনের শারীরিক, সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। মাদকের কারণে শুধু যে মাদকাসক্ত ব্যক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, মাদকাসক্ত ব্যক্তির মা-বাবা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার জীবনে এর প্রভাব পড়ে। সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা মাদকের অর্থ জোগাড় করার জন্য চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানিসহ বিভিন্ন অসামাজিক ও বেআইনি কাজকর্মে লিপ্ত হয় যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য খুবই ক্ষতিকর। মাদকাসক্তির ভয়াবহ পরিণতি থেকে যুব সমাজসহ দেশের সবাইকে রক্ষা করতে হলে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন ও সোচ্চার করতে হবে। মাদকদ্রব্য যাতে সহজে না পাওয়া যায় তার জন্য যে আইন আছে সে আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন তৈরি করতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন করে তুলতে জনমত গঠন করতে হবে।

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে স্লোগান ব্যবহার করা ছাড়াও আরও যে যেভাবে মাদকের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করা যায় সেগুলো হচ্ছে–

১. রেডিও-টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য গ্রহণের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরা।

২. মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও ভয়াবহতা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রচার করা।

৩. মাদকবিরোধী সভা-সমিতি, পথ নাটক, গান, কবিতা, নাটক, যাত্রা পালা, অভিনয়, র‍্যালি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

৪. মসজিদ, মন্দির, গির্জায় মাদকবিরোধী ধর্মীয় বিধান তুলে ধরা ও মাদক গ্রহণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা এবং মাদক গ্রহণ থেকে বিরত থাকার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা।

৫. মাদক ও ধূমপানবিরোধী দিবস পালনসহ অন্যান্য সময়ে বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। যেমন– দলীয় আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, লিফলেট বিতরণ, পোস্টার প্রদর্শন ইত্যাদি।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন অফিস, সংস্থা, দপ্তরকে ধূমপান ও মাদকমুক্ত এলাকা ঘোষণাপূর্বক তা কার্যকর করা।

৭. স্কুলের খাতা, নোটবুকের মলাটে মাদকবিরোধী স্লোগান দিয়ে সকলকে সচেতন করা।

জনসচেতনতা সৃষ্টির সময় "মাদক কিছুই দেয় না বরং কেড়ে নেয় সবকিছু" এরূপ স্লোগান দিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারণা চালাতে হবে। মাদকসেবীরা মনে করে মাদক মানুষকে দুঃখ ভুলতে সাহায্য করে এবং আনন্দ দেয়– এটা একেবারেই ভুল ধারণা। মাদক বরং আরও যন্ত্রণা টেনে আনে। কাজেই পরিচিতজনের মধ্যে কেউ

মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই মিলে তাকে এই সর্বনাশা পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা উচিত।

> কাজ–১ : এমন একটি স্লোগান তৈরি কর যার সাহায্যে মাদকের বিরুদ্ধে জনগণকে আকৃষ্ট ও সচেতন করা যাবে।
>
> কাজ–২ : তোমার এলাকায় ধূমপানবিরোধী প্রচারণা চালাতে তুমি কী করবে?
>
> ১.
>
> ২.
>
> ৩.
>
> ৪.
>
> ৫.

পাঠ–৫ : HIV-AIDS-এর ধারণা ও বিস্তার : বিশ্বে যে কয়টি ঘাতক ব্যাধিতে মানুষ বেশি আক্রান্ত হচ্ছে তার মধ্যে এইডস অন্যতম। বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক বা নিরাময় ব্যবস্থা থাকলেও এইডস সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করতে পারে এমন ঔষধ এখনও তেমনভাবে আবিষ্কার করা যায়নি। ফলে এইডস-এর পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। আমাদের প্রত্যেকের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকার কারণে শরীরে কোনো রোগের জীবাণু প্রবেশ করলে সেটা সহজে শরীরের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু এমন কিছু ভাইরাস আছে যা শরীরের এ বিশেষ ক্ষমতাকে আস্তে আস্তে দুর্বল করে এবং এক সময় তা সম্পূর্ণভাবেই নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। এমনই একটি ভাইরাসের নাম এইচআইভি HIV।

এইচআইভি (HIV) ও এইডস (AIDS) কী : এইচআইভি ও এইডস দুটি ইংরেজি শব্দ। শব্দ দুটির পূর্ণাংগ রূপ হচ্ছে– Human Immunodeficiency Virus (HIV) এবং Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)। এইচআইভি একটি অতি ক্ষুদ্র বিশেষ ধরনের ভাইরাস যা কোনো মানুষের শরীরে নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে প্রবেশ করে রক্তের শ্বেতকণিকা ধ্বংসের মাধ্যমে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তখন সে ব্যক্তি নানা ধরনের রোগ যেমন ডায়রিয়া, যক্ষা, নিউমোনিয়া প্রভৃতিতে ঘন ঘন আক্রান্ত হয় এবং কোনো চিকিৎসায় এ সমস্ত রোগ ভালো হয় না। এইচআইভি সংক্রমিত কোনো ব্যক্তির এরূপ অবস্থাকে এইডস (AIDS) বলে। এইচআইভি কোনো ব্যক্তির শরীরের প্রবেশের পর সাথে সাথে কোনো লক্ষণ দেখা দেয় না। এইডস হিসেবে প্রকাশ পেতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। সাধারণত এটা মনে করা হয়ে থাকে যে এইচআইভি সংক্রমণের শুরু থেকে এইডস হওয়ার সময় ৬ মাস থেকে বেশ কয়েক বছর হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫ থেকে ১০ বছর অথবা তারও বেশি সময় পরে এইডস ধরা পড়ে। এই সময়কালকে সুপ্তাবস্থা বলে। এই সময়ের মধ্যে এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে সুস্থ ব্যক্তি সংক্রমিত হতে পারে।

এইডস এর লক্ষণসমূহ : এইডস-এর নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ নেই। তবে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অন্য যে রোগে আক্রান্ত হয় সে রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এর মধ্যে কিছু সাধারণ লক্ষণ আছে। যেমন– (১) এক মাসের বেশি সময় ধরে এক টানা কাশি, (২) সারা দেহে চুলকানিজনিত চর্মরোগ, (৩) মুখ ও গলায় এক ধরনের ঘা, (৪) লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া, (৫) স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা কমে যাওয়া ইত্যাদি।

এইডস-এর প্রধান লক্ষণগুলো হলো–

১। শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পাওয়া।

২। এক মাসের বেশি সময় ধরে একটানা বা থেমে থেমে পাতলা পায়খানা হওয়া।

৩। বার বার জ্বর হওয়া বা রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া।

৪। অতিরিক্ত ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করা।

৫। শুকনা কাশি হওয়া ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, কারোর মধ্যে উপরের একাধিক লক্ষণ দেখা দিলেই তার এইডস হয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে HIV সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

এইচআইভি এবং এইডস–এর বিস্তার : এইচআইভি একটি নীরব ঘাতক। এই নীরব ঘাতকের বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়ার আগে এইচআইভি ও এইডস কীভাবে বিস্তার লাভ করে তা আমাদের জানা প্রয়োজন। বায়ু, পানি, খাদ্য বা সাধারণ ছোঁয়ায় এইচআইভি ছড়ায় না। মানুষের শরীরের ভিতরে উৎপন্ন বিভিন্ন তরল পদার্থ যেমন রক্ত, বীর্য, যোনিরস, মায়ের বুকের দুধ এগুলোতে HIV বাস করে। HIV আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, বীর্য, যোনিরস সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করলে বা মায়ের বুকের দুধ খেলে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটে। সুনির্দিষ্টভাবে যে যে উপায়ে এইচআইভি বিস্তার লাভ করে, তা হলো :

১। অনৈতিক ও অনিরাপদ দৈহিক মিলন– এইচআইভি ছড়ানোর সবচেয়ে বড় কারণ অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সারা বিশ্বের এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিদের ৮০% অনিরাপদ যৌন মিলনের কারণে হয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তির বীর্য বা যোনিরসের মাধ্যমে যৌনসঙ্গীর দেহে এইডস-এর ভাইরাস প্রবেশ করে।

২। আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ- কোনো অঙ্গ প্রতিস্থাপন কিংবা তার ব্যবহৃত সুচ–সিরিঞ্জের ব্যবহার হলে গ্রহণ বা ব্যবহারকারীর শরীরে এই ভাইরাস ছড়িয়ে যেতে পারে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই একই সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করে মাদক গ্রহণ করে থাকে। কোনো এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমণ হয়।

৩। মায়ের শরীর থেকে শিশুর শরীরে সংক্রমণ–

এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত মায়ের নিকট থেকে তিনটি পর্যায়ে শিশুর শরীরে এইচ আই ভি সংক্রমিত হতে পারে। যেমন–

(ক) গর্ভকালীন সময়ে।

(খ) প্রসবকালীন সময়ে।

(গ) মায়ের দুধ পান করে।

যে সব কারণে এইচআইভি-এইডস-এর বিস্তার লাভ করে না তা নিচে উল্লেখ করা হলো–

(১) হাঁচি, কাশি, কফ-থুথু বা শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে।

(২) এক সাথে এক ঘরে বসবাস করলে, একসাথে বা একই থালা-বাসনে খাওয়া দাওয়া করলে।
(৩) একসাথে খেলাধুলা বা একই ক্লাসে পড়াশোনা করলে।
(৪) আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে হাত মেলালে, কোলাকুলি করলে এবং তার কাপড় ব্যবহার করলে।
(৫) মশা বা কোনো পোকা-মাকড়ের কামড়ে।
(৬) আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে।
(৭) একই গোসলখানা বা শৌচাগার ব্যবহার করলে।

এইচআইভি ও এইডসের মতো মরণব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সকলের এ বিষয়ে জানতে হবে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কাজ-১ : এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত হলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তা বোর্ডে লিখ এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

কাজ-২ : এইচআইভি কীভাবে ছড়ায় এবং ছড়ায় না এ বিষয়ে নিচের বিবৃতির বিপরীতে সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখ

বিবৃতি	স/মি	বিবৃতি	স/মি
১. এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা করলে		৭. আক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবা করলে	
২. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে একই থালায় খাবার খেলে		৮. আক্রান্ত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় ব্যবহার করলে	
৩. আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত নিজ শরীরে গ্রহণ করলে		৯. আক্রান্ত ব্যক্তি ব্যবহৃত সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করলে	
৪. সুস্থ ব্যক্তির শরীরে জীবাণুমুক্ত রক্ত সঞ্চালন করলে		১০. আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি-কাশির মাধ্যমে	
৫. মশা বা পোকা-মাকড়ের কামড়ে		১১. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে	
৬. আক্রান্ত মায়ের দুধ পান করলে			

পাঠ-৬ : বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডসের ঝুঁকি এবং ঝুঁকিমুক্ত থাকার উপায় : এইডস একটি আর্থ-সামাজিক ও জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশেও এইডস-এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। তবে সাধারণ জনগণের মধ্যে এটি এখনও মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কারণে অচিরেই আমাদের দেশেও এইডস মারাত্মক রূপ নিতে পারে। যেহেতু প্রতিকারহীন এ রোগের চরম পরিণতি মৃত্যু, তাই সকলকে বিশেষ করে অল্পবয়সী মেয়েদেরকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ বাংলাদেশের কিশোরীরাই কিশোরদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এর প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে-

১। আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে মেয়েদের দুর্বল অবস্থান।

২। মেয়েরা এইচআইভি/এইডস বিষয়ে ছেলেদের তুলনায় কম অবহিত।

৩। নারী-পুরুষ বৈষম্যের কারণে পুরুষ দ্বারা মেয়েদের নিগৃহীত হওয়া।

৪। মেয়েদের অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধাদানের ক্ষমতার অভাব।

৫। মেয়েদের বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্য।

৬। অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক ইত্যাদি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হচ্ছে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে তাদের চিন্তা ও আচরণে অনেক কৌতূহল জন্মে। পরিবারের বড়দের কাছে এসব বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারে না। তাই তারা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ থাকে এবং অনেকে অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ রকম পরিস্থিতিতে তারা এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়ে যায়।

এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণসমূহ : মানুষের শরীরে এইচআইভি ভাইরাস থাকে বীর্যে, যোনিরসে, রক্তে ও মায়ের দুধে। এই চার জাতীয় তরল পদার্থের আদান-প্রদানের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমিত হয়। অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, বীর্য বা যোনিরস নিজ শরীরে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হলে এইচআইভির সংক্রমণ ঘটে। এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ আচরণসমূহ হচ্ছে–

(ক) মাদকগ্রহণ বা অন্য কোনো প্রয়োজনে ইনজেকশনের একই সুচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহার।

(খ) অপরীক্ষিত রক্ত শরীরে গ্রহণ।

(গ) অপারেশনের সময় অপরিশোধিত জীবাণুযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার।

(ঘ) এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের সন্তান গ্রহণ।

(ঙ) অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন।

এইচআইভি এবং এইডস থেকে ঝুঁকিমুক্ত থাকার উপায় :

১. **ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ :** পরিহার করতে হবে।

২. **আবেগ প্রশমন :** প্রধানত কৌতূহল ও আবেগের বশবর্তী হয়েই কিশোর-কিশোরীরা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ করে। এজন্য কিশোর-কিশোরীদের কৌতূহল বা আবেগ প্রশমনের দক্ষতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। বড়দের সাথে বিশেষ করে মা-বাবার সাথে সব বিষয়ে খোলামেলা কথা বলতে পারলে এই কৌতূহল দূর ও আবেগ প্রশমিত হয়।

৩. **ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান :** অনাকাঙ্ক্ষিত বা অনৈতিক প্রস্তাবে 'না' বলার দক্ষতা ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

৪. **ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন ও রীতিনীতি মেনে চলা :** নেশা করা বা মাদকাসক্ত হওয়া, অনৈতিক দৈহিক বা যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি কোনো ধর্ম বা সমাজই অনুমোদন করে না। তাই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে এইডসে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা অনেক কমে যায়।

৫. এইচআইভি এবং এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি : এইচআইভি এবং এইডস-এর ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এই উদ্দেশ্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার, র‍্যালির আয়োজন, ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ধারক বয়াতির গ্রামীণ পালাগান, পথ নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণকে সহজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এসব কার্যক্রম ব্যক্তির আত্মসচেতনতা সৃষ্টি এবং জনগণের মধ্যে গণ সচেতনতা বৃদ্ধিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কাজ–১ : শিক্ষার্থীরা একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে এইচআইভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করে প্রত্যেক দল একটি আচরণের উপর শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে।

কাজ–২ : এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তোমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে কার্যকর কৌশল কোনটি তা উল্লেখ করে এর সপক্ষে যুক্তি দাও, শ্রেণিতে দলীয় ভিত্তিতে উপস্থাপন কর।

পাঠ–৭ : বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডস–এর ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থান : বর্তমান বিশ্বে এইডস এবং যৌনরোগ সংক্রমণ বহুল আলোচিত বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম এইডস শনাক্ত হয়। এইডস এমনই মারাত্মক যে, তা মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কমিয়ে দেয় ও একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এইডস মানব সভ্যতা এবং উন্নয়নের ক্রমাগত বিকাশের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে। জাতিসংঘের এইডস বিষয়ক সংস্থা UNAIDS-এর সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১০ সালের শেষ অবধি বিশ্বে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি তেত্রিশ লাখ। বর্তমানে বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ৬,৮০০ জন মহিলা ও পুরুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত হচ্ছে এবং আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। UNAIDS-এর তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীব্যাপী প্রতি বছর নতুনভাবে এইচআইভি আক্রান্তদের অর্ধেকই হচ্ছে ২৫ বছরের কম বয়সী কিশোর-কিশোরী/যুবক-যুবতী। আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন কারণ, যেমন– শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগের অভাব ও আর্থিক অসামর্থ্য বিশ্বের দরিদ্র দেশসমূহের অল্পবয়সী জনগোষ্ঠীকে এইচআইভি সংক্রমণে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। বাংলাদেশেও এইচআইভি/এইডস-এর প্রাদুর্ভাব হয়েছে। তবে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এটি এখনো মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। তবুও বিশ্ব পরিস্থিতি বিশেষ করে আঞ্চলিক পরিস্থিতির কারণে আমাদের নিষ্ক্রিয় থাকার কোনো অবকাশ নেই। আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহ যথা– ভারত এবং মায়ানমারসহ চীন, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডে এইচআইভি/এইডস-এর ব্যাপক বিস্তৃতি লক্ষ করা যাচ্ছে। তাই এ দেশ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠার আগেই আমাদের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর যেমন মাদক গ্রহণকারী, মহিলা ও পুরুষ যৌনকর্মী, সমকামী, পেশাদার রক্ত বিক্রেতা, ভ্রাম্যমাণ জনগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্যে সামগ্রিকভাবে এইচআইভি সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব ১% এর নিচে। ২০১০ সালে প্রাপ্ত সরকারি তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সম্ভাব্য সংখ্যা প্রায় ৭,৫০০, এইচআইভি সংক্রমিত চিহ্নিত ব্যক্তির সংখ্যা ২৮৭১, এইডস-এ আক্রান্তের সংখ্যা ১২০৪ এবং এইডস-এ মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা ৩৯০। একই সুচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহারের মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার প্রায় মহামারী পর্যায়ে পৌঁছেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের হার সামগ্রিকভাবে কম হলেও (অর্থাৎ শতকরা এক ভাগের নিচে) আগামীতে এ হার এরকমই থাকবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এইডস মহামারী আকারে শুরুতেই প্রকাশ পায় না। বাংলাদেশেও যে এ মহামারীর বিস্ফোরণ ঘটবে না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

এইডস-এর কোনো কার্যকর প্রতিকার ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। তাই এর প্রতিরোধের ব্যবস্থার কথাই বলতে হয়। সমগ্র বিশ্ববাসী প্রতি বছর ১লা ডিসেম্বর "বিশ্ব এইডস দিবস" পালন করে। এই বিশেষ দিনে বিশ্বের সকল দেশ স্ব স্ব অবস্থান থেকে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে এইডস প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

> কাজ–১ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে কী কী ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস মহামারীর রূপ নিতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি কর এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।
>
> কাজ–২ : বিশ্ব এইডস দিবস পালনের জন্য একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন কর।

পাঠ–৮ : এইচআইভি-এইডস প্রতিরোধে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বে একটি প্রতিকারহীন রোগের নাম এইডস, যার অনিবার্য পরিণতি আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু। বাংলাদেশেও এই রোগের কিছু প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এবং এইচআইভি আক্রান্তদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। যেহেতু এইচআইভি-এর কোনো প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক টিকা আবিষ্কৃত হয়নি, তাই এর সংক্রমণ প্রতিরোধই এটাকে নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়। কাজেই এর প্রতিরোধের ব্যবস্থার উপরই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বাংলাদেশ সরকার এইডস প্রতিরোধকল্পে ১৯৮৫ সালে জাতীয় এইডস কমিটি গঠন করে। ১৯৮৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আর্থিক সহায়তায় স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তবে গত শতাব্দীর নব্বই দশক থেকে বাংলাদেশ সরকার এইডস নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এইচআইভি এবং এইডস আক্রান্তদের সহায়তা দানের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোতে এইচআইভি সংক্রমিত রোগীদের রক্ত পরীক্ষা, পরামর্শদান এবং কিছুটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আশার আলো সোসাইটি, জাগরণী মেডিকেল ক্লিনিক, মুক্ত আকাশ বাংলাদেশ, হাসাব (HSAB-HIV/AIDS AND STD ALLIANCE IN BANGLADESH), ক্যাপ (CAAP-CONFIDENTIAL APPROACH TO AIDS PREVENTION) প্রভৃতি এইচআইভি এবং এইডস আক্রান্তদের সেবাদানসমূহ এ বিষয়ে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সেবাদানমূলক কার্যক্রমের মধ্যে (১) কাউন্সেলিং বা পরামর্শদান এবং (২) পুনর্বাসন উল্লেখযোগ্য।

কাউন্সিলিং বা পরামর্শদান : এইচআইভি এবং এইডস-এর কোনো প্রতিষেধক টিকা বা ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে মানসিক সমর্থন ও শক্তি, সঠিক চিকিৎসা ও সেবাযত্ন পেলে এইচআইভি এবং এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন সুস্থ ও সবল থাকতে পারে। তাই তাদেরকে পরামর্শদান বা কাউন্সেলিং অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রথমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে বেসরকারি সেবাদান প্রতিষ্ঠানসমূহ এইডস আক্রান্তদের বাড়ির আশেপাশে সুবিধাজনক স্থানে উঠান বৈঠক করে থাকেন। এইচআইভি ও এইডস কী, এর বিস্তার, আক্রান্তদের সাথে ব্যবহার ও সহমর্মিতা ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অভিজ্ঞ পরামর্শক নিয়ে এইডস আক্রান্তদের বাড়িতে গিয়ে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তাদেরকে বিভিন্ন সেবাদানসহ চিকিৎসা সুবিধাও দিয়ে থাকে।

রোগ উপশমের পরামর্শ দেওয়ার কৌশল : কোনো ব্যক্তির রক্তে এইচআইভি আছে কিনা তা রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়। রক্ত পরীক্ষার আগে ও পরে পরামর্শ বা কাউন্সেলিং করা হয়। এই কাউন্সেলিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তি এইচআইভি পজিটিভ হলে সে মারাত্মকভাবে ঘাবড়ে যায়। কারণ এইডস একটি মরণব্যাধি এবং এর তেমন কোনো চিকিৎসা নেই। তবে সেবাযত্ন, উপযুক্ত খাদ্য, সহমর্মিতা ও সাহস পেলে এইডস আক্রান্তরাও দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে। পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিচে বর্ণিত বিষয়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারে–

১। **রক্ত পরীক্ষার পর পরামর্শ** : কোনো ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষায় তার রক্তে এইচআইভি ধরা পড়লে সে ব্যক্তি প্রথমেই মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। তাই রক্ত পরীক্ষার পর এই পরামর্শ দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরামর্শ বা কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে তাকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও ঘুমের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করে তার মনোবল অটুট রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। **অন্যান্য রোগ থেকে সতর্ক থাকা** : কোনো ব্যক্তির রক্ত এইচআইভি পজিটিভ হলে ধীরে ধীরে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে বিভিন্ন সুযোগ–সন্ধানী রোগ যেমন– ডায়রিয়া, যক্ষা, মুখে ঘা, নানা প্রকার চর্মরোগ, নিউমোনিয়া, প্রচন্ড জ্বর ইত্যাদি আক্রমণ করে। তখন অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মতো ঔষধ খেতে ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে হবে।

৩। **ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করা** : এইডস থেকে সেরে উঠার কোনো চিকিৎসা এখনও বের হয়নি। তবে এন্টিরেট্রোভাইরাল জাতীয় ঔষধের মাধ্যমে অনেকটা সুস্থ থাকা যায়, জীবন দীর্ঘায়িত করা যায়। তবে এ ঔষুধ খুবই ব্যয়বহুল।

পুনর্বাসন : অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এইডস আক্রান্তদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়। তাছাড়া তাদের পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান দিতে পারে।

কাজ–১ : একটি বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা হিসেবে এইচআইভি ও এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিকে কীভাবে পরামর্শ দেবে ধারাবাহিকভাবে লিখ।

কাজ–২ : একজন এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের যে সকল পরামর্শ দেবে তার একটা তালিকা তৈরি করো।

পাঠ– ৯ : অটিজম (Autism) :

দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করি। সুখ-দুঃখ হাসি কান্না আমাদের প্রতিদিনের ঘটনা। একটি পরিবারে যখন একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন ঐ পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মা-বাবা শিশুটির সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য নানা ধরনের পরিকল্পনা করতে থাকে। তাদের এই পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ। শিশুদের শারীরিক, মনো-সামাজিক, ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে ঘটলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। যখন কোনো বাবা-মা বুঝতে পারে যে, তার শিশুটি অন্যান্য সাধারণ শিশুদের থেকে

ভিন্ন আচরণ করছে অথবা বিকাশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করছে না বা বয়সের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে, তখন তাদের মাঝে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে পরিবারটিতে নেমে আসে হতাশা। সন্তানের এই ভিন্নতাকে মেনে নেওয়ার জন্য মা-বাবাকে প্রথমত সংগ্রাম করতে হয় নিজের মনের সাথে। আবার সেই সাথে শিশুটির প্রতি সমাজের ও পরিবারের সদস্যদের বিরূপ/নেতিবাচক মনোভাবের কারণে মা-বাবাকে প্রতিনিয়তই অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

জন্মের পর শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে শারীরিক (বসা, দাঁড়ানো, হাঁটা, হাতের সূক্ষ্ম কাজ), মানসিক (বুদ্ধি, আবেগ, স্মরণশক্তি, চিন্তা, আচরণ, ব্যক্তিত্ব), সামাজিক ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বয়স অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করাকেই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বলা হয়। আর বিকাশজনিত সমস্যা হলো এমন এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা যা শিশুর মস্তিষ্ক বিকাশের সময় ঘটে থাকে এবং শিশুর শরীরের যে কোনো অংশ অথবা সম্পূর্ণ শারীরিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুদের নানা ধরনের বিকাশজনিত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, অটিজম সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি।

অটিজম কী?

অটিজম কোনো রোগ নয়। এটি স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যার একটি বিস্তৃত রূপ যা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার নামে পরিচিত। এখানে 'স্নায়ু' শব্দটি স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্কের সাথে স্নায়ুর সম্পর্ক বুঝায়। 'বিকাশজনিত' শব্দটির মাধ্যমে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়াকে বুঝানো হয়েছে।

প্রাকশৈশব কাল থেকে এই সমস্যাটি শুরু হয়, যা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। সাধারণত শিশুর জন্মের দেড় বছর থেকে তিন বছরের মধ্যে অটিজমের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়। সামাজিক সম্পর্ক, যোগাযোগ এবং আচরণের ভিন্নতাই এই সমস্যাটির প্রধান বিষয়। এছাড়াও অটিজম রয়েছে এমন শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিভিত্তিক, শিক্ষণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি সংক্রান্ত সমস্যাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এটা মনে রাখা জরুরি যে, সব অটিস্টিক শিশুই এক রকম নয়। যেমন- অটিজমের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা সব অটিস্টিক শিশুর মধ্যে কম-বেশি পরিলক্ষিত হয় আবার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রতিটি শিশুর জন্য আলাদা আলাদা হয়ে থাকে।

অটিজম স্পেকট্রামে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অটিজম লক্ষ করা যায়। অটিজম স্পেকট্রামকে একটি রংধনুর সাথে তুলনা করা যায়। রংধনুতে যেমন অনেক রং থাকে, অটিজম স্পেকট্রামেও তেমনি বিভিন্ন ধরনের অটিজম থাকে। এগুলোর মধ্যে একটি হলো অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম।

অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম

এটিও এক ধরনের অটিজম যা অটিজম স্পেকট্রামে দেখা যায়। এই শিশুদের আচরণগত সমস্যা থাকলেও বুদ্ধিভিত্তিক ও ভাষাগত বিকাশে কোনো সমস্যা থাকে না। তবে ভাষার বিকাশ স্বাভাবিক এবং শব্দভাণ্ডার পর্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক আলাপচারিতায় অংশ নিতে এদের সমস্যা হয়। এরা একই ধরনের আচরণ পুনরাবৃত্তি করে থাকে। বিশেষত অন্যের সাথে যোগাযোগের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো যেমন-চোখে চোখ রেখে তাকানো, অন্যের মৌখিক অভিব্যক্তি, ইশারা ইঙ্গিত, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং আবেগের বহিঃপ্রকাশ তারা বুঝতে পারে

না। এরা কথার আক্ষরিক ব্যাখ্যা করে, ফলে বাগধারা, প্রবাদ, রসিকতা বা ব্যঙ্গ বুঝতে পারে না। এমন শিশুদের বিকাশ বিলম্বিত হয় না, শিক্ষাক্ষেত্রেও তারা এগিয়ে থাকে, এমনকি বুদ্ধিমত্তাও থাকে সাধারণের চাইতে বেশি। অটিজমের তুলনায় অনেক দেরিতে এমনকি বয়ঃসন্ধিকালে বা পূর্ণবয়স্ক সময়ে তাদের সমস্যাটি শনাক্ত হয়। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যে অ্যাসপার্জার্সের হার দশগুণ বেশি।

এরা যে কোনো বিষয় সঠিক ও সাবলীলভাবে পড়তে শেখে তবে বিষটির প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে পারে না। সাধারণত অ্যাসপার্জার্স শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডার অনেক বেশি। খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারে ও অনেক সময় তাদের পছন্দের বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনাও করতে পারে। তবে সে সময় খেয়ালই করে না যে আশেপাশের মানুষেরা সে বিষয়টিতে আগ্রহী কিনা।

ইন্দ্রিয়ানুভূতি প্রক্রিয়ার সমস্যা এবং শারীরিক নড়াচড়ায় অসুবিধা হবার পাশাপাশি তাদের কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ কম থাকে, সময়জ্ঞান কমে যায় এবং মাংসপেশিও শিথিল থাকে, ফলে খেলাধুলার মাধ্যমেও সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

সাংগঠনিক ক্ষমতা ও মনোযোগে সমস্যা থাকার কারণে অ্যাসপার্জার্স শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বিগ্নতা দেখা যেতে পারে। নিয়ম নীতি, বিধি, রুটিন ইত্যাদি মেনে চলতে তারা পছন্দ করে। নিয়মের হেরফের ঘটলে তারা মানসিক টানাপোড়নে পড়ে যায়।

অটিজম আছে এমন শিশুদের সাধারণ কিছু আচরণ

- চোখে চোখ না রাখা বা কম রাখা
- ডাকলে সাড়া দেয় না
- বিকাশ জনিত দক্ষতার মধ্যে অসামঞ্জস্যতা
- প্রাত্যহিক রুটিন পরিবর্তনে বাধা দান
- অতিরিক্ত চঞ্চলতা বা উত্তেজনা
- আবেগ প্রকাশে অসুবিধা
- অস্বাভাবিক শারীরিক অঙ্গভঙ্গি
- সত্যিকার বিপদে ভয় না পাওয়া, উল্টোদিকে তেমন বিপজ্জনক নয় এমন অবস্থা বা পরিবেশে অস্বাভাবিক ভয় পাওয়া
- অসংগতিপূর্ণ হাসি-কান্না
- কোনো কিছুর প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ
- খাওয়া, ঘুম, মল-মূত্র ত্যাগে অস্বাভাবিকতা
- নিজের বা অপরের জন্য বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর ব্যবহার
- অখাদ্য খাওয়া

অটিজমের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

অটিজমের বৈশিষ্ট্য ও মাত্রা প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে আলাদা। মূল শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো- সামাজিক মেলামেশা, যোগাযোগ ও পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই অটিজমের মূল লক্ষণ হিসেবে পরিচিত। অটিজমের কারণে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অপরের সাথে যোগাযোগ করার কৌশল এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলো বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে তাদের মধ্যে একই ধরনের আচরণ অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের উৎসাহ দেখা যায়। এটা জানা জরুরি যে, অটিজমের লক্ষণগুলো স্নায়বিক কারণে হয় এবং একজনের সাথে আরেকজনের হুবহু মিল নেই।

ক. সামাজিক লক্ষণসমূহ

অটিজম আছে এমন শিশুদের অধিকাংশের মধ্যেই অন্যের সাথে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় গুরুতর সমস্যা দেখা যায়। জীবনের প্রথম কয়েক মাসে তারা অন্যের চোখে চোখ রেখে তাকায় না। তারা অন্যের প্রতি নির্লিপ্ত থাকে এবং একা থাকতে পছন্দ করে। তারা অন্যের মনোযোগ পেতে চায় না এবং জড়িয়ে ধরা পছন্দ করে না। তারা অন্যের রাগ বা আদরের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

অটিস্টিক শিশুদের কোনো কিছু শিখতে অনেক সময় লাগে এবং তারা অন্যের চিন্তা ও অনুভূতি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখায় না। সাধারণ ইশারা ইঙ্গিত যেমন- মুচকি হাসি, চোখ পিট পিট করা বা মৌখিক অভিব্যক্তি তাদের কাছে কম অর্থপূর্ণ বিষয়। এই সব শিশু যারা ইশারা বুঝতে পারে না তাদের কাছে 'এদিকে এসো' বাক্যটি সবসময় একই অর্থ বহন করে। অথচ এই বাক্যটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করতে পারে। দেহভংগি ও মৌখিক অভিব্যক্তি না বোঝার কারণে এসব শিশুর কাছে তার সামাজিক জগৎ বোধহীন হয়ে ওঠে।

অটিস্টিক শিশুদের উত্তেজিত ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠার প্রবণতা তাদের সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে বাধা হয়ে দাড়ায়। যখন তারা অপরিচিত ও বাইরের পরিবেশে যায় তখন তারা রেগে যায় বা হতাশ হয়, আবার তাদের কেউ কেউ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এসময় তারা জিনিসপত্র ভাঙচুর করতে পারে, অন্যকে আঘাত করতে পারে অথবা নিজের শরীরেও আঘাত করতে পারে।

খ. যোগাযোগের সমস্যা

যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। ভাষাগত অসুবিধার কারণে অটিস্টিক শিশুদের অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সমস্যা দেখা দেয়। ভাষাগত বিকাশের ক্ষেত্রে অটিস্টিক শিশুদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কিছু অটিস্টিক শিশু কখনই কথা বলতে শেখে না, তারা সারা জীবন নিশ্চুপ থেকে যায়। কোনো কোনো শিশু জন্মের কয়েক মাস পরে বাবলিং বা আধো আধো কথা বলতে শেখে কিন্তু কিছুদিন পর সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। আবার কারো ক্ষেত্রে ভাষা শিখতে ৫ থেকে ৯ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তবে অটিস্টিক শিশুরা ছবি, ইশারা ভাষা বা স্পর্শের সাহায্যে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা শিখতে পারে। অটিজম আছে এমন অনেক শিশুর ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। তারা শব্দ বিন্যাস করে সঠিক বাক্য গঠন করতে পারে না, কেউ কেউ একটি শব্দ দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে, কেউ কেউ যে শব্দটি শোনে সেটিই বারবার বলতে থকে। কোনো কোনো অটিস্টিক শিশু কোন একটি নির্দিষ্ট শব্দ বলে এবং টিয়া পাখির মতো শব্দটি বার বার এক নাগাড়ে বলতে থাকে; যাকে ইকোলালিয়া বলে ।

অনেক অটিস্টিক শিশু রয়েছে যাদের ভাষার ক্ষেত্রে খুব সামান্য সমস্যা থাকে। এরা অনেক শব্দ ব্যবহার করে ভালোভাবে কথা বলতে পারে তবে সঠিকভাবে কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারে না। তারা বাক্যের অর্থের তারতম্য বুঝতে পারেনা। আরেকটি বিষয় হলো শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, কন্ঠস্বর উঠানামার ফলে কথার অর্থের যে ধরনের তারতম্য হয় তা তারা সঠিকভাবে বুঝে না।

গ. পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ

অটিজম আছে এমন শিশুরা শারীরিকভাবে স্বাভাবিক এবং প্রায় সবারই পেশি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ভালো, কিন্তু অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ তাদেরকে অন্য শিশুদের থেকে আলাদা করে রাখে। এই অস্বাভাবিক পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ তীব্র থেকে মৃদু হতে পারে। তাদের অনেকেই বার বার হাত নাড়ায়, পায়ের সামনের অংশের উপর ভর দিয়ে হাঁটে, অথবা কোনো একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দীর্ঘসময় স্থিরভাবে দাড়িয়ে থাকে। তারা অনেক সময় খেলনা গাড়ি বা ট্রেন দিয়ে খেলা করার বদলে এগুলোকে এক লাইনে সাজায়। যদি অসাবধানতা বশত কেউ তাদের এই সাজানো গাড়ি বা ট্রেন নাড়িয়ে ফেলে তবে তারা খুব হতাশ/বিচলিত হয়ে পড়ে।

অটিস্টিক শিশুরা চায় তাদের চারপাশের সবকিছু যেমন আছে তেমনই থাকুক। তারা কোনো পরিবর্তন পছন্দ করে না। তাদের দৈনন্দিন রুটিনের নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী খাওয়া, গোসল করা, একই রাস্তায় নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে সামান্যতম হেরফের হলে তারা খুব বিরক্ত হয়। পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ তাদের আচরণকে আগে থেকেই যুক্ত করে রাখে যেমন– শিশু দীর্ঘ সময় পার করে দেয় ফ্যান ঘোরা ও আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে। তাদের কারো কারো মধ্যে দারুণ আগ্রহ দেখা যায় সংখ্যা, চিহ্ন বা বিজ্ঞান বিষয়ে।

অটিজমের সাথে সম্পর্কিত কিছু স্বতন্ত্র গুণাবলি ও সবল দিক

অটিস্টিক শিশুদের কোনো বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা বা ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়। এর সংখ্যা অতি নগণ্য তবুও এ ধরনের বিশেষ দক্ষতা তাদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং তাদেরকে করে তুলতে পারে অসাধারণ। এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, প্রতিটি অটিস্টিক শিশুর মধ্যে এ ধরনের বিশেষ প্রতিভা থাকবে। তবে এ বিষয়ে সচেতন থাকলে তাদের সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে বের করা সহজ হবে, শিশুটি সমাজে সমাদৃত হবে এবং তার অন্যান্য দিকের ঘাটতি কিছুটা হলেও পূরণ হবে।

অটিস্টিক শিশুরা যে বিষয়টির উপর বেশি মনোযোগ দেয় সে দিকেই তাদের প্রতিভা বিকশিত হতে পারে । দেখা যায় ক্যালেন্ডারের দিকে মনোযোগ আছে এমন শিশুটি অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মতারিখ বা বার সঠিকভাবে মনে রাখতে পারে, এভাবে সে একসাথে অনেক তথ্য মনে রাখতে পারে। আবার একটি কঠিন ও কৌশলী কাজকে ছোট ছোট সহজভাগে ভাগ করে এবং সেটার দিকে মনোযোগ দিয়ে তারা সেই কঠিন ও কৌশলী কাজটি সমাধা করতে পারে।

অটিজম আছে এমন শিশুদের কিছু সবল দিক

- সুনিপুণভাবে দেখার ক্ষমতা
- সুশৃংখল নিয়মনীতির ধারণা, সিকোয়েন্স (ধারাবাহিকতা), প্যাটার্ন ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে ও মনে রাখতে পারে।

- বিস্তারিত ও মুখস্থ করার মতো বিষয় (গণিত, ট্রেনের সময়সূচি, খেলার স্কোর) মনে রাখতে পারে
- দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা
- সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহ
- বিশেষ পছন্দনীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ
- শৈল্পিক দক্ষতা
- অল্প বয়সে লিখিত ভাষা পড়তে পারা (বুঝতে পারুক বা না পারুক)
- বানান মনে রাখা
- সততা
- সমস্যা সমাধানের দক্ষতা

অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার-এর কারণ কী?

এককথায় বলতে গেলে অটিজম কেন হয় এখন পর্যন্ত তার সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে কারণ অনুসন্ধানের কাজটিও বেড়ে চলেছে।

বিভিন্ন কারণে যে অটিজম হয়ে থাকে এ বিষয়টি বর্তমানে বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত।

বিভিন্ন পর্যায়ে অটিজমের যে জটিল লক্ষণ দেখা যায় তা থেকে বলা যায় যে, একাধিক কারণে অটিজম হতে পারে। জন্মপূর্ব ও জন্মকালীন ও জন্ম পরবর্তী যে কোনো সময়ে জেনেটিক (বংশগতি) এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের প্রভাবে অটিজম হতে পারে।

কোনো শিশুর মধ্যে অটিজমের কিছু লক্ষণ থাকলেই তার অটিজম আছে এমন সিদ্ধান্ত দ্রুত নেওয়া যাবে না। কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই বলতে পারবেন শিশুটির অটিজম আছে কিনা। শিশু বিশেষজ্ঞ, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, শিশু স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী কিংবা অটিজম-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকই অটিজম নির্ণয় করবেন ।

অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা ও মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ

অটিস্টিক শিশুদের জন্য শিক্ষাদান কার্যক্রম খুবই নিবিড় ও বিশদভাবে হওয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পেশাজীবীদের প্রয়োজন আছে এবং শিক্ষার্থীর আচরণ, বিকাশ, সামাজিক ও একাডেমিক প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে সপ্তাহে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য কত সময় ব্যয় করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়। কেবলমাত্র একটি পদ্ধতিতে অটিস্টিক শিশুর শিক্ষাদান সম্ভব নয়, একসাথে বা ক্রমান্বয়ে একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হয়। প্রায়োগিক আচরণ বিশ্লেষণ (এপ্লাইড বিহেভিয়ার এনালাইসিস) নীতিমালার উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ।

অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সহায়তা প্রদান ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। শিশুর সবলদিক ও চাহিদার সহায়তার জন্য প্রস্তুতি নিতে অভিভাবকসহ সকল সদস্যের মধ্যে যোগাযোগ থাকা জরুরি এবং ইতিবাচক সফলতার জন্য কার্যকর কৌশল নির্ধারণ, সমন্বয়, সহযোগিতার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের শুধু শ্রেণীকক্ষে বসিয়ে দেওয়াই নয়, তাদের মূলধারার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও কার্যকর অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের সফলতার জন্য তাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। সেজন্য ছোট ছোট সাফল্যও উল্লেখ করতে হবে। অটিজমের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর গুণাবলি জানা থাকলে উপযুক্ত পরিকল্পনা করতে সুবিধা হয়।

তোমাদের শ্রেণি কক্ষে অটিস্টিক বন্ধুদের তোমরা কীভাবে সহায়তা প্রদান করতে পার

অটিস্টিক শিশুদের সহপাঠীদের 'সহযোগী বন্ধু' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সহপাঠীদের মধ্যে বন্ধুত্বের ধারণা এবং লক্ষ্য অর্জনে একতাবদ্ধতার পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে অটিস্টিক শিশুরা যথাযথ সহায়তা, সম্মান নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে। অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সংবেদনশীলতা ও ইতিবাচক মানসিকতায় প্রায় সবাই আমরা উপকৃত হব কেননা এদের মধ্যে কেউ আমাদের ভাই, বোন, প্রতিবেশী বা আত্মীয়। অটিজম-সংক্রান্ত শিক্ষা বা সংবেদনশীলতার প্রশিক্ষণ কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর উপর ভিত্তি করে হবে না, তা সার্বিকভাবে হতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে নির্দেশনা বুঝতে ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া বাড়াতে সহপাঠীদের করণীয়

১. এক শ্রেণিকক্ষ থেকে অন্য শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যাওয়া।

২. শ্রেণিকক্ষের কাজ ও শিক্ষাসংক্রান্ত উপকরণ গুছিয়ে রাখা।

৩. শ্রেণিকক্ষের জন্য নির্ধারিত রুটিন মেনে চলা।

৪. সহপাঠীদের সাথে মেলামেশার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।

৫. শ্রেণি শিক্ষকের পড়ানোর বিষয়টির সারমর্ম বলা এবং মূল বিষয়টি পুনরায় বলা।

৬. শ্রেণিকক্ষের আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

৭. মৌখিকভাবে অথবা যোগাযোগ সহায়ক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত উত্তরসমূহ লিখিতরূপে প্রকাশে সাহায্য করা।

৮. হতাশ হলে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করা।

৯. অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য সর্বদা তাকে পুরস্কৃত করা।

১০. শ্রেণিকক্ষের কাজ সঠিকভাবে করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।

সাধারণত সারা জীবন ধরে অটিজমের লক্ষণগুলো একজনের মধ্যে থাকতে পারে, তবে যথাযথ সাহায্য, নির্দেশনা ও উপযুক্ত শিক্ষা পেলে সময়ের সঙ্গে কিছু কিছু লক্ষণের উন্নতি হয়। যাদের মাঝে অল্প মাত্রার সমস্যা থাকে তাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় এবং তারা মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। মাঝারি ও বেশি সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা ঠিকমতো কথা বলতে পারে না, এবং নিজের

যত্নও নিতে পারে না। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা গেলে এবং নিবিড় প্রশিক্ষণ ও নির্দেশনা পেলে অটিস্টিক শিশুরা নানাক্ষেত্রে সফলতা পেতে পারে।

অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য বাংলাদেশেও কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে উঠেছে, যেমন– প্রয়াস, অটিজম ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, সোয়াক, অটিস্টিক চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ইত্যাদি। এ ছাড়া কিছু স্কুলও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যারা অটিজম শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে কর্মরত রয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে ও উন্নতিতে অবদান রাখতে পারবে।

কাজ–১: অটিজমের লক্ষণগুলি লিখ।

কাজ–২: শ্রেণিকক্ষে অটিস্টিক শিশুদের সাথে সহপাঠীদের কী করণীয় তা বোর্ডে লিখ।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

১.১ বাংলাদেশে মাদকাসক্তি বিস্তারের প্রধান কারণ কী?

ক. জীবনের প্রতি হতাশা　　খ. মাদকের প্রতি কৌতূহল

গ. বাবা–মার বিচ্ছেদ　　ঘ. মাদক দ্রব্যের সহজলভ্যতা

১.২ এইডস আক্রান্ত হওয়ার কারণ কী?

ক. অনিরাপদ যৌনকর্মে লিপ্ত　　খ. পেশাদার রক্তদাতার রক্তগ্রহণ

গ. যৌন আচরণে সমকামী　　ঘ. একই সুঁচ দিয়ে মাদক গ্রহণ করলে

১.৩ এইডস আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে গৃহবধুর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ কোনটি?

ক. অসচেতনতা　　খ. দারিদ্র

গ. এইডস আক্রান্ত অভিবাসী স্বামী　　ঘ. কন্ট্রাসেপটিভ পিল ব্যবহার না করা

১.৪ গাঁজা জাতীয় মাদকদ্রব্য কোনটি?

ক. মারিজুয়ানা　　খ. ফেনসিডিল

গ. আফিম　　ঘ. পেথিড্রিন

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি প্রচণ্ড .... বুঝায়।

খ. ফেনসিডিল .... জাতীয় মাদক।

গ. তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবন বলতে প্রধানত .... বুঝায়।

ঘ. এইডসে আক্রান্ত হলে দ্রুত ....হ্রাস পায়।

ঙ. অতিরিক্ত ক্লান্তি বা .... অনুভব করা।

৩. বাম পাশের কথা মালার সাথে ডানপাশের কথামালার মিল কর।

ক. পুনঃ পুন জ্বর হওয়া	ক. সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান
খ. পেথিড্রিন	খ. গাঁজাজাতীয়
গ. ভাং	গ. এইডস
ঘ. হাসাব	ঘ. আফিমজাতীয়
ঙ. নিকোটিন	ঙ. তামাক

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. মাদক দ্রব্য বলতে কী বুঝায়?

খ. মাদক গ্রহণের তিনটি কুফল লিখ।

গ. এইডস বলতে কী বুঝায়?

ঘ. এইডস এর লক্ষণগুলো কী কী?

ঙ. অ্যাসপার্জার্স সিনড্রোম বলতে কী বুঝায়?

৫. রচনামূলক প্রশ্ন

ক. মাদক গ্রহণের কুফল বর্ণনা কর।

খ. মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে কীভাবে জনমত গঠন করবে বর্ণনা কর।

গ. এইডস এর বিস্তার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা আলোচনা কর।

ঘ. অটিজমের লক্ষণগুলি বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

বয়ঃসন্ধিকাল ও প্রজনন স্বাস্থ্য

একটি শিশু জন্মগ্রহণের পর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। শিশুটির বড় হওয়ার বিভিন্ন পর্যায়কে কাল হিসেবে ধরা হয়। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর শৈশবকাল। শৈশবকালে ছেলে বা মেয়ে সকলকে শিশু বলা হয়। ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত বয়সকে আমরা বলি বাল্যকাল। বাল্যকালে শিশু মেয়ে হলে বালিকা এবং ছেলে হলে বালক বলা হয়। দশ থকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে বা মেয়েকে কিশোর বা কিশোরী হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ সময়ে তাদের শরীর যথাক্রমে পুরুষের বা নারীর শরীরে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বয়ঃসন্ধিকাল হচ্ছে বাল্যকাল ও যৌবনকালের মধ্যবর্তী সময়। শরীরের যে সব অঙ্গ সন্তান জন্মদানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত সে সব অঙ্গের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়কে প্রজনন স্বাস্থ্য বলে। প্রজনন স্বাস্থ্য প্রজননতন্ত্র এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। একটি শিশু ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক, তার জন্ম থেকে শুরু করে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব প্রতিটি স্তরেই তার সাধারণ স্বাস্থ্যের সাথে প্রজনন স্বাস্থ্যর ব্যাপারটি জড়িত। তাই প্রজনন স্বাস্থ্য কী এবং এটা রক্ষা করার বিষয়ে সবারই জানা প্রয়োজন।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়ে

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- বয়ঃসন্ধিকাল ও বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের সময় করণীয় নির্ধারণ করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার মানসিক চাপ মোকাবেলার কৌশলগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- প্রজনন স্বাস্থ্য ও তা সুরক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিধিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।
- গর্ভকালীন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ–১ : বয়ঃসন্ধিকাল ও বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন : মানুষের জীবনে বয়সের ভিত্তিতে অনেকগুলো পর্যায় আসে। যেমন– শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য। শিশুর জন্ম থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শৈশবকাল, ছয় থেকে দশ বছর বাল্যকাল, এগারো থেকে উনিশ বছর কৈশোরকাল বলা হয়। কৈশোরকালে একটি ছেলে বা মেয়েকে কিশোর বা কিশোরী বলা হয়। কৈশোরকালে কিশোর বা কিশোরীরা শারীরিকভাবে পুরুষ বা নারীতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই কৈশোরকালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল আগে শুরু হয়। মেয়েদের আট থেকে তেরো বছর বয়সের মধ্যে বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয়। ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল শুরু দশ থেকে পনেরো বছর বয়সে। কারো কারো ক্ষেত্রে এর আগে বা পরেও বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে দৈহিক বা শারীরিক পরিবর্তনগুলোই প্রথমে চোখে পড়ে। এই পরিবর্তন দেখলেই বোঝা যায় যে কারো বয়ঃসন্ধিকাল চলছে। বয়ঃসন্ধিকালে যে সব পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো প্রধানত ৩ প্রকার।

১. শারীরিক ২. মানসিক ৩. আচরণগত

বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তন

কিশোরদের ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে–

ক. উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।

খ. শরীরে দৃঢ়তা আসে, বুক ও কাঁধ চওড়া হয়।

গ. এ বয়সে দাড়ি গোঁফ ওঠে।

ঘ. স্বরভঙ্গ হয় ও গলার স্বর মোটা হয়।

ঙ. বীর্যপাত হয়।

কিশোরীদের পরিবর্তনসমূহ নিম্নরূপ–

ক. উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।

খ. শরীর ভারী হয়, শরীরের বিভিন্ন হাড় মোটা ও দৃঢ় হয়।

গ. ঋতুস্রাব শুরু হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে সবার ক্ষেত্রে শারীরিক পরিবর্তনগুলো একই সময়ে ও একই রকম নাও হতে পারে। যেমন কিশোরীদের ক্ষেত্রে কারো আগে বা পরে ঋতুস্রাব শুরু হতে পারে। কিশোর কিশোরীদের ক্ষেত্রে সকলের উচ্চতা একইভাবে নাও বাড়তে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি নানা রকম মানসিক পরিবর্তনও হয়। এই পরিবর্তন স্বাভাবিক এবং সময়ের সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীরা এই সব পরিবর্তনের নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। বয়ঃসন্ধিকালে যেসব মানসিক পরিবর্তন সাধারণভাবে দেখা যায়–

ক. অজানা বিষয়ে জানার কৌতূহল বাড়ে।

খ. শারীরিক পরিবর্তনের ফলে চলাফেরায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও লজ্জা কাজ করে।

গ. স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা করে।

ঘ. নিকটজনের মনোযোগ যত্ন ও ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা তীব্র হয়।

ঙ. আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে।

চ. ছেলে ও মেয়েদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে।

ছ. মানসিক পরিপক্কতার পর্যায় শুরু হয়।

আচরণিক পরিবর্তন : বয়ঃসন্ধিকালে আচরণগত পরিবর্তনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই–

ক. প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ করে।

খ. বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নিজেকে একজন আলাদা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

গ. প্রত্যেক বিষয়ে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।

ঘ. দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে।

কাজ–১ : শিক্ষকের নির্দেশ মতো ৫/৭ জনের দল গঠন কর। তোমার সহপাঠী/সমবয়সীদের কথা ভাব। প্রায় সবার ক্ষেত্রেই ঘটেছে এমন পরিবর্তনগুলো দিয়ে নীচের ছক দুইটি পূরণ কর। এর শিরোনাম দাও "সাধারণ পরিবর্তন"। এরপর অবশিষ্ট পরিবর্তনগুলো দিয়ে একটি তালিকা তৈরি কর। এর শিরোনাম হবে "অন্যান্য পরিবর্তন"। এটা হবে দলীয় কাজ।

বয়ঃসন্ধিকালে সাধারণ পরিবর্তন	
শারীরিক পরিবর্তন	**মানসিক পরিবর্তন**
১.	১.
২.	২.
৩.	৩.
৪.	৪.

বয়ঃসন্ধিকালে অন্যান্য পরিবর্তন	
১.	
২.	
৩.	
৪.	

পাঠ–২ : বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক চাপ ও পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো : আমরা পূর্বেই জেনেছি যে সাধারণত ছেলে–মেয়েদের ১০-১৯ বছর বয়সের সময় কালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। এ সময়ে ছেলে-মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তবে আবহাওয়া, স্থান, খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও মানের তারতম্যের কারণে এক একজনের বয়ঃসন্ধিকালের শুরুর সময়ে কিছুটা তারতম্য হতে পারে। হরমোন এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যার কারণে বয়ঃসন্ধিকালের পরিববর্তনগুলো ঘটে। মেয়েদের শরীরে ও মনে বিভিন্ন পরিবর্তন ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন নামে দুটি হরমোন কাজ করে আর ছেলেদের যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনসমূহ ঘটে তা টেস্টোস্টেরন নামক হরমোনের কারণে।

বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক চাপ : ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের কারণে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়। কারণ পরিবর্তনগুলো অনেকটা আকস্মিকভাবে শুরু হয়। এর সাথে পরিচিত না থাকার কারণে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের মনে কোনো অপরাধবোধ কাজ করে না। এ ধরনের অপরাধবোধ ও মানসিক দুশ্চিন্তা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ফলে ছেলেমেয়েদের মনে সর্বক্ষণ একটা অস্বস্তি কাজ করে। তারা মানসিক চাপের সম্মুখীন হয় এবং অনেক সময় পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজে বিঘ্নিত হয়।

বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো : বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে জানা থাকলে এবং এ সম্বন্ধে করণীয় বিষয়ে পূর্ব ধারণা থাকলে, কিশোর-কিশোরীদের মানসিক প্রস্তুতি থাকে। ফলে তারা বিষয়টি সহজভাবে নিতে পারে, তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ব্যাহত হয় না এবং সম্ভাব্য রোগব্যাধিও প্রতিরোধ করা যায়। বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তন ঘটলে মা-বাবা, বড় ভাই-বোন বা নির্ভরযোগ্য অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করে এ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যেতে পারে। ফলে সংকোচ কেটে যাবে এবং একা থাকার প্রবণতা কমে যাবে। বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে সাথে আবেগিক পরিবর্তন ঘটে। এ বয়সে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটে তার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের সাথে মা বাবা ও অভিভাবকদের বন্ধুসুলভ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। তাদেরকে মানসিক দিকসহ অন্য সব ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান ও সাহস জোগাতে হবে। কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য তাদের নিজেদেরকেও সচেষ্ট থাকতে হবে। তাদের প্রথম কাজ হবে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা। ভালো গল্পের বই পড়া, সাথীদের সাথে খেলাধুলা করলে মনে প্রফুল্লতা আসবে এবং মানসিক চাপ সামলানো সম্ভব হবে।

কাজ–১ : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে তালিকার মাধ্যমে বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক চাপ থেকে উত্তরণের কয়েকটি উপায় লিখতে বলবেন।

বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক চাপ থেকে উত্তরণের উপায়

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	
৬.	

পাঠ–৩ : বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা : বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। সুস্থ দেহেই বাস করে সুন্দর মন। শরীর সুস্থ না থাকলে কোনো কিছুতেই আনন্দ পাওয়া যায় না। লেখাপড়া করতেও ইচ্ছে করে না। সেজন্য খাদ্য ও পুষ্টির দরকার। আবার যে কোনো খাবার খেলেই যে শরীর ভালো থাকবে তা নয়। কারণ সব ধরনের খাদ্যেই শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে না। সেজন্য খাদ্য নির্বাচনের সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন প্রতিদিনের খাবারে আমিষ, শর্করা, চর্বি বা তেল, খনিজ দ্রব্য, ভিটামিন ও পানি প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাওয়া যায়।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা ও সুষম খাদ্য : বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে-মেয়েদের পুষ্টির প্রয়োজন খুব বেশি। কেননা এই সময়ে ছেলে-মেয়েরা হঠাৎ বেড়ে উঠে এবং তাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। সেজন্য তাদেরকে প্রতিদিনই যথাযথ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু অনেক ছেলে-মেয়ে ও তাদের অভিভাবকেরা এ বিষয়ে গুরুত্ব দেন না। কেউ কেউ মনে করেন যে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান ও পুষ্টি শুধুমাত্র দামি খাবার ও ফলমূলেই পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধারণা ভুল। একটু সচেতন হলেই সহজপ্রাপ্য ও সুলভমূল্যের খাদ্যদ্রব্য থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়।

বয়স, দৈহিক গঠন ও কাজের ধরনভেদে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা : ৬টি খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন বিভিন্ন খাদ্যের প্রয়োজনীয় পরিমাণের সমাহারকে সুষম খাদ্য বলে। বয়সভেদে এই "প্রয়োজনীয় পরিমাণের" তারতম্য হতে পারে। যেমন ১৩/১৪ বছর বয়সের কোনো কিশোর বা কিশোরীর পুষ্টির প্রয়োজন একটি ৮/৯ বছরের শিশুর চেয়ে বেশি। একই বয়সের মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণীর পুষ্টির প্রয়োজনে কোনো তারতম্য নেই। আবার দু'জন একই বয়সের তরুণ একজন বেশ দীর্ঘকায় ও স্বাস্থ্যবান এবং অপরজন ছোটখাটো ও সাধারণ স্বাস্থ্যের হলে, দৈহিক গঠনের কারণে প্রথমজনের প্রয়োজনীয় পুষ্টির তথা

খাদ্যের পরিমাণ দ্বিতীয়জনের চেয়ে বেশি হবে। এটি অনুরূপ দু'জন মেয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। দু'জন একই বয়সী ও একই রকম দৈহিক গঠনের পুরুষের মধ্যে যিনি বেশি দৈহিক পরিশ্রম করেন তার খাদ্যের প্রয়োজন বেশি হতে পারে। দু'জন সমবয়সী এবং একই রকম দৈহিক গঠন সম্পন্ন মেয়ের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। এভাবে বয়স, দৈহিকগঠন ও কাজের ধরনভেদে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তার তারতম্য হয়। কারণ খাদ্যের ৬টি উপাদানের প্রত্যেকটিই বয়ঃসন্ধিকালের ছেলে-মেয়েদের দৈহিকবৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য খুব প্রয়োজন। এগুলো দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। অন্যথায় যথাযথ পুষ্টির অভাবে দৈহিকবৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে ছেলেমেয়েরা নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়।

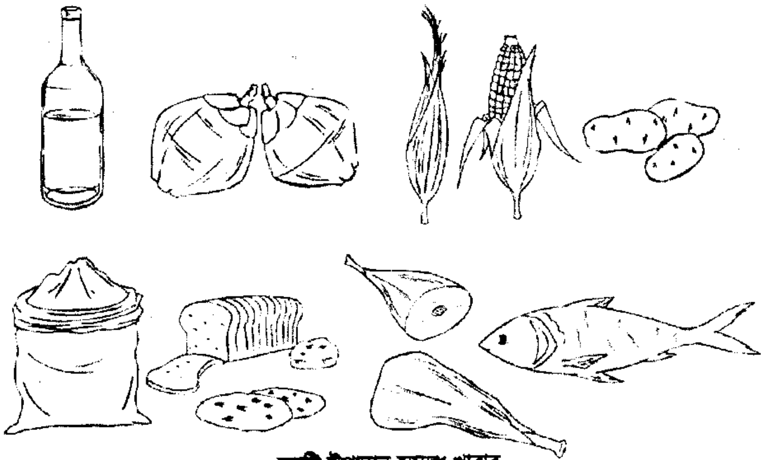

ছয়টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার

কাজ–১ : কিশোর-কিশোরীদের জন্য সকল খাদ্য উপাদান সমৃদ্ধ একটি দৈনিক সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি কর। এই তালিকায় সহজে পাওয়া যায় এবং দাম কম এমন খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কাজ–২ : বয়স, শরীরের গঠন ও কাজের ধরন অনুযায়ী ছেলে-মেয়েদের খাদ্য উপাদানসমৃদ্ধ প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ এবং পুষ্টিকর খাবার না খেলে কী কী অসুবিধা হয় তা লিখে আনবে এবং শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে।

পাঠ–৪ : প্রজনন স্বাস্থ্য ও তা সুরক্ষার উপায় : শরীরের যে সব অঙ্গ সন্তান জন্মদানের সাথে সরাসরি জড়িত সে সব অঙ্গের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়কে প্রজনন স্বাস্থ্য বলে। প্রজনন স্বাস্থ্য প্রজননতন্ত্র ও প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই প্রজনন বলতে সন্তান জন্মদানকে বুঝায়। পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ জন্ম ও সুস্বাস্থ্য বর্তমান প্রজন্মের সুস্বাস্থ্য তথা সুস্থ প্রজনন তন্ত্রের উপর নির্ভর করে। তাই স্বাস্থ্যকর, নিরাপদ ও আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য প্রত্যেকের প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় : হরমোনজনিত কারণে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ব ধারণা না থাকলে ছেলে ও মেয়েরা ভয় পেয়ে যায় এবং ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের ক্ষতি করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঋতুস্রাব ঘটলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ও নিয়মিত গোসল করা দরকার। এ সময়ে পুষ্টিকর খাবার ও প্রচুর পানি পান করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রাথমিক অবস্থায় মা-বাবা, নিকটাত্মীয় বা স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে হবে। এ সময়ের মানসিক পরিবর্তনের বিষয়টি মনে রেখে ছেলে বা মেয়েদের সাথে বন্ধুসুলভ ও সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। সহযোগিতামূলক আচরণ তাদের অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে, তাদের মানসিক প্রফুল্লতা বজায় থাকবে এবং সুস্থভাবে বেড়ে উঠবে। প্রজনন স্বাস্থ্যের বড় ঝুঁকি হচ্ছে অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে হওয়া ও সন্তান ধারণ। এ কারণে রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়াও মা ও শিশুর মৃত্যু ঝুঁকি থাকে। এ সময়ে প্রজনন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রাপ্তবয়সে বিয়ে হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ সম্পর্কে সরকারি নির্দেশ মেনে চললে এই ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। নানা কারণে প্রজনন অঙ্গের রোগ দেখা দিতে পারে। প্রজনন অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে তা লুকানো যাবে না। ডাক্তারের নির্দেশমতে ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে সংক্রামক রোগ এবং যৌনরোগের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

কাজ–১ : প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যা করা প্রয়োজন সেগুলো নিচের ছকে লিখ।

করণীয় কাজ
১.
২.
৩.

পাঠ–৫ : প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি ও গর্ভকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যসেবা : মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের একটি বিশেষ অংশ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য। প্রজনন স্বাস্থ্য বলতে শুধু প্রজননতন্ত্রের কাজ এবং প্রজনন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত রোগ বা অসুস্থতার অনুপস্থিতিকে বুঝায় না। এটা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণকর এক সুস্থ অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পাদনের একটি অবস্থা। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের নিরাপদ জন্ম ও সুস্বাস্থ্য বর্তমান প্রজন্মের সার্বিক সুস্থতা প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে।

প্রজনন স্বাস্থ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

১। **বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন স্বাস্থ্যবিধি :** বয়ঃসন্ধিকালে প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

২। **উপযুক্ত বয়সে গর্ভধারণ :** মেয়েদের ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ করা যাবে না। উপযুক্ত বয়সে গর্ভধারণ করলে মা ও শিশু উভয়ই সুস্থ থাকে।

৩। **নিরাপদ মাতৃত্ব :** নিরাপদ মাতৃত্ব বলতে বুঝায় গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সময়ে মায়ের সুস্থতা বজায় রাখা। বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশি। এর অন্যতম কারণ গর্ভকালীন সময়ে মায়ের যত্ন হয় না। তিনি পর্যাপ্ত খাদ্য, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা পান না। তাছাড়া অপরিণত বয়সে বিয়ে ও গর্ভধারণের ফলে মা ও শিশুর অসুস্থতাও ঘটে।

৪। **শিশুর জন্য পূর্ব যত্ন** : মায়ের গর্ভে সন্তান আসার পর পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্য, চিকিৎসা, বিশ্রাম, ঘুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হয়।

৫। **নবজাতকের পরিচর্যা** : জন্মের পর থেকে ২৮ দিন বয়স পর্যন্ত শিশুকে নবজাতক বলা হয়। জন্মের পর পরই শিশুকে শালদুধ খাওয়ানো, প্রয়োজনীয়তা ও সার্বিক পরিমাণ খাদ্য যোগান, টিকা প্রদান প্রভৃতি পরিচর্যামূলক সেবা শিশুর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৬। **মা ও শিশুর পুষ্টি** : আমাদের দেশে অধিকাংশ মা ও শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। গর্ভবতী মা ও প্রসূতি মা অপুষ্টিতে ভোগেন বলেই শিশু অপুষ্টির শিকার হয়। ঘন ঘন গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব মা ও শিশুর অপুষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ।

৭। **প্রজননতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের সেবা ও রোগ প্রতিরোধ** : এ সমস্ত রোগের মধ্যে রয়েছে সংক্রামক রোগ, যৌনরোগ, প্রজনন অংগের ক্যান্সারসহ সব রকম রোগ এবং এইচআইভি/এইডস। এসব রোগের সেবা প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনমতো সেবা গ্রহণ করতে হবে।

গর্ভকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যসেবা : গর্ভধারণ হচ্ছে শরীরের একটি বিশেষ পরিবর্তন। সন্তান গর্ভে এলেই শুধু মায়ের শরীরের এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরে কিছু কিছু অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায়। যেমন– ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, মাথা ঘোরা, বারবার প্রস্রাব হওয়া। পরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে শারীরিক ও মানসিক তেমন কোনো জটিলতা দেখা যায় না। গর্ভকালীন পালনীয় স্বাস্থ্যবিধি ও সেবা হচ্ছে–

ক. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা।

খ. নিয়মিত গোসল করা।

গ. পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ, বিশ্রাম ও ঘুম।

ঘ. গর্ভধারণের প্রথম থেকেই চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা।

ঙ. গর্ভকালীন সমস্যা মোকাবেলার জন্য নিকটস্থ স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রাখা।

চ. প্রজননতন্ত্রের যে কোনো সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

ছ. ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন মেনে চলা। এজন্য পড়াশুনাসহ বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক কাজে নিজেকে জড়িত রাখা ইত্যাদি।

কাজ–১ : একজন গর্ভবতী মায়ের যে যে বিষয়ে যত্ন নিতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

কাজ–২ : গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরের যে সব অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায় তা ধারাবাহিকভাবে লেখ।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

১.১ বয়ঃসন্ধিকালের ছেলেমেয়েরা দেহের চাহিদার তুলনায় কম খাবার খেলে–

ক. তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। খ. দেহের সুষ্ঠু বিকাশে বাধাগ্রস্ত হয়।

গ. তারা শারীরিক অসুস্থতা এড়াতে পারে। ঘ. তাদের মানসিক বিকাশ ঘটে।

১.২ বয়ঃসন্ধিকালে কী শারীরিক পরিবর্তন হয়?

ক. উচ্চতা ও ওজন বাড়ে। খ. স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা হয়।

গ. জানার কৌতূহল বাড়ে। ঘ. ছেলে ও মেয়েদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে

১.৩ বয়ঃসন্ধিকালে কী মানসিক পরিবর্তন হয়?

ক. ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে ইচ্ছা হয়। খ. অজানা বিষয়ে জানার কৌতূহল বাড়ে।

গ. দাড়ি গোঁফ ওঠে। ঘ. হাত-পা লম্বা হয়।

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. শরীরের যে সব অঙ্গ শিশু --- সাথে জড়িত সে সব অঙ্গের --- বিষয়কে প্রজনন স্বাস্থ্য বলে।

খ. ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ------ আগে শুরু হয়।

গ. বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের ----- প্রয়োজন।

ঘ. পুষ্টিগুণসমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় খাদ্যকে ----- বলে।

৩. বাম পাশের কথামালাগুলো ডানপাশের যার যার নির্দিষ্ট ঘরে লেখ।

ক. স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছে হয়	ক. শারীরিক পরিবর্তন
খ. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া	১.
গ. স্বরভঙ্গ ও গলার স্বর মোটা হয়	২.
ঘ. আবেগ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ে	খ. মানসিক পরিবর্তন
ঙ. প্রত্যেক বিষয়ে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা	১.
	২.
	গ. আচরণিক
	১.
	২.

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. বয়ঃসন্ধিকালে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন কেন?

খ. প্রজনন স্বাস্থ্য কী?

গ. বয়ঃসন্ধিকালে আচরণগত পরিবর্তনগুলো লিখ।

ঘ. নবজাতকের পরিচর্যা কীভাবে করতে হয়?

৫. রচনামূলক প্রশ্ন :

ক. বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো বর্ণনা কর।

খ. বয়ঃসন্ধিকালের পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

গ. প্রজনন স্বাস্থ্য ও তা সুরক্ষার উপায় বর্ণনা কর।

ঘ. গর্ভকালীন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবাগুলো আলোচনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

দলগত খেলা

খেলাধুলা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অপরিহার্য। খেলাধুলা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটায় এবং সামাজিক গুণাবলি অর্জনে সাহায্য করে। খেলাধুলার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি চিত্ত বিনোদনের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করা। খেলাধুলা শরীর ও মনকে সতেজ রাখে এবং শরীর গঠনের সাথে সাথে সুন্দর চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। দলের সদস্য হয়ে খেলার ফলে দলীয় আনুগত্য, আইন মেনে চলা, নেতার নির্দেশ পালন করা, শৃঙ্খলাবোধ সমুন্নত রাখা ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলি অর্জন করার মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

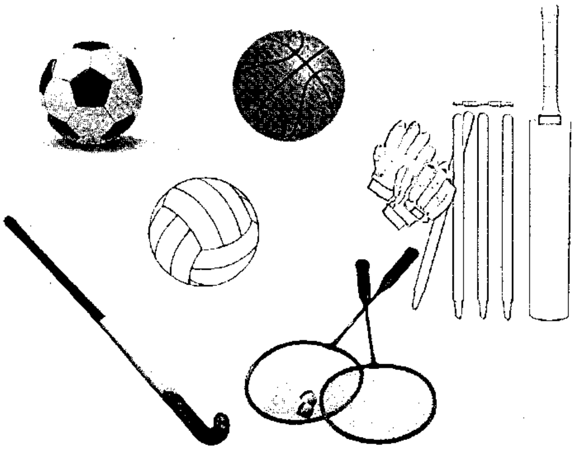

বিভিন্ন খেলার সরঞ্জাম

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি ও ব্যাডমিন্টন খেলার আইন-কানুন বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন খেলার কলা-কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন খেলার বিভিন্ন পজিশনের কী কী যোগ্যতা দরকার তা বর্ণনা করতে পারব।
- খেলার আইন মেনে খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারব।
- খেলোয়াড়দের যোগ্যতা ও গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি খেলায় পারদর্শী হয়ে উঠতে পারব।
- দলগত খেলার মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি করতে পারব।
- দলগত খেলার মাধ্যমে নেতৃত্বদানে সক্ষম হব।
- দলগত খেলার মাধ্যমে আইন-কানুন মানা ও আনুগত্য বোধ বৃদ্ধি করতে পারব।

পাঠ–১ : খেলার আইনকানুন

ফুটবল : ফুটবল খেলা অতি প্রাচীন। কালের বিবর্তনে এ খেলা বর্তমানে একটি আধুনিক খেলায় পরিণত হয়েছে। আধুনিক ফুটবল খেলার জন্মস্থান ইংল্যান্ডে। ফুটবল খেলার আইন-কানুন প্রণয়ন হয় ইংল্যান্ডেই। এই খেলা জনপ্রিয় হওয়ার কারণে খুব দ্রুততার সাথে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ হলেও ফুটবল খেলা এখানেও কম জনপ্রিয় নয়। ফুটবল খেলায় রয়েছে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সংস্থা 'ফিফা' (FIFA) ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল দি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। ১৯০৪ সালের ২১ মে প্যারিসে এই সংগঠনটি আত্মপ্রকাশ করে। এই সংগঠনের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় ফুটবল খেলা বিভিন্ন দেশে প্রসার লাভ করেছে। বাংলাদেশও ফিফার সদস্যভুক্ত হয়ে এই খেলাকে সারা দেশে জনপ্রিয় করে তুলছে। ফুটবল বর্তমানে বিশ্বে সর্বজনীন খেলা। এ খেলা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৭টি আইন আছে। অন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন খেলার আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করে থাকে। ফলে একই নিয়মে বিশ্বের সর্বত্র এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। খেলোয়াড়রা যেমন নিয়ম মেনে চলে তেমনি রেফারি নিয়মের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ প্রয়োগ করেন। তাই খেলাটি হয়ে ওঠে চির আনন্দময়। নিচে আইনগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো–

১. মাঠ : ফুটবল আইনের প্রথমটি হলো মাঠ। মাঠের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ১৩০ গজ বা ১২০ মিটার। সর্বনিম্ন ১০০ গজ বা ৯০ মিটার। প্রস্থ সর্বোচ্চ ১০০ গজ বা ৯০ মিটার, সর্বনিম্ন ৫০ গজ বা ৪৫ মিটার।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাঠের মাপ হবে–

ক. দৈর্ঘ্য– ১২০ গজ, প্রস্থ – ৮০ গজ।

খ. দৈর্ঘ্য– ১১৫ গজ, প্রস্থ – ৭৫ গজ।

গ. দৈর্ঘ্য– ১১০ গজ, প্রস্থ – ৭০ গজ।

এই তিনটি মাপের মাঠের যে কোনো একটি মাঠ আন্তর্জাতিক, জাতীয় প্রতিযোগিতার জন্য প্রযোজ্য। তবে স্কুলের ছোট ছেলেদের জন্য দৈর্ঘ্য– ১০০ গজ ও প্রস্থ– ৫০ গজ নেওয়া যেতে পারে।

১.১ দাগ : প্রত্যেকটি দাগ চওড়া হবে ৫ ইঞ্চি। দৈর্ঘ্যের দাগকে টাচ লাইন ও প্রস্থের দাগকে গোল লাইন বলে।

১.২ গোল এরিয়া : দুই গোল পোস্টের উভয় দিকে ৬ গজ এবং সামনের দিকে ৬ গজ নিয়ে উভয় দাগকে একটি সরলরেখা দ্বারা যোগ করতে হবে, যার দৈর্ঘ্য হবে ২০ গজ। এই দাগের ভিতরের জায়গাকে গোল এরিয়া বলে।

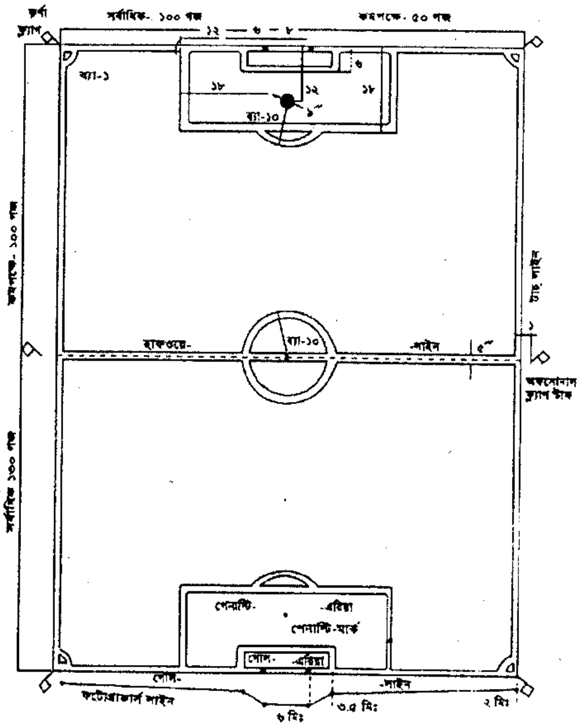

ফুটবল মাঠ

১.৩ পেনাল্টি এরিয়া : গোল পোস্টের উভয় দিকে ১৮ গজ এবং সামনের দিকেও ১৮ গজ নিয়ে একটি সরলরেখা টানতে হবে যার দৈর্ঘ্য হবে ৪৪ গজ এই ভেতরের এরিয়াকে পেনাল্টি এরিয়া বলে।

১.৪ পেনাল্টি মার্ক : যে চিহ্নতে বল বসিয়ে পেনাল্টি কিক মারে তাকে পেনাল্টি মার্ক বলে। দুই গোল পোস্টের মাঝ থেকে সামনের দিকে ১২ গজ দূরে চিহ্ন দিতে হবে যার ব্যাস হবে ৯″।

১.৫ কর্নার পতাকা : মাঠের চার কোনায় ৪টি পতাকা থাকবে। পতাকা দণ্ডের উচ্চতা কমপক্ষে ৫′। পোস্টের মাথা চোখা হবে না এবং মাথায় পতাকা লাগানো থাকবে। মাঠের মাঝখানের দুইদিকে টাচ লাইন থেকে ১ গজ দূরে দুটি পতাকা থাকবে। একে ঐচ্ছিক পতাকা বলে।

১.৬ কর্নার এরিয়া : কর্নার পতাকাদণ্ড থেকে ১ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ আঁকতে হবে। যার মধ্যে বল বসিয়ে কর্নার কিক মারতে হয়।

১.৭ : গোল পোস্ট : মাটি থেকে ক্রসবারের নিচ পর্যন্ত উচ্চতা ৮ ফুট ও দুই গোল পোস্টের মাঝের দূরত্ব ৮ গজ। গোল পোস্টের পিছনে জাল টাঙ্গাতে হবে। জাল এমনভাবে টাঙ্গাতে হবে যেন গোল কিপারের চলাফেরায় কোনো অসুবিধে না হয়।

১.৮ সেন্টার সার্কেল : মধ্য রেখার মাঝখান থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অংকন করতে হবে যাকে সেন্টার সার্কেল বলে।

২. খেলার বল : বলের পরিধি ৬৮–৭০ সেন্টিমিটার, খেলা আরম্ভের সময় বলের ওজন হবে ৪১০–৪৫০ গ্রাম।

৩. খেলোয়াড়ের সংখ্যা : একটি দল ১৮ জন খেলোয়াড়ের সমন্বয়ে গঠিত হবে। ১১ জন মাঠে খেলবে বাকি ৭ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে মাঠের বাইরে থাকবে। তবে আঞ্চলিক বা আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতায় দলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা কমানো যেতে পারে।

৪. খেলোয়াড়দের সরঞ্জাম : একজন খেলোয়াড়ের বাধ্যতামূলক সাজপোশাক হচ্ছে শার্ট বা জার্সি, শর্টস বা হাফ প্যান্ট, মোজা, শিনগার্ড ও বুটস। অন্য খেলোয়াড়ের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে এমন কোনো বস্তু বা পোশাক পরা যাবে না।

৫. রেফারি : খেলা পরিচালনার জন্য একজন রেফারি থাকেন।

৬. ডেপুটি রেফারি : রেফারিকে সাহায্য করার জন্য ২ জন ডেপুটি রেফারি থাকেন। এছাড়া মাঠের বাইরে একজন চতুর্থ রেফারি থাকেন। তিনিও খেলা পরিচালনার ব্যাপারে রেফারিকে সাহায্য করেন।

৭. খেলার সময় : আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে খেলার সময় প্রতি অর্ধে ৪৫ মিনিট মাঝে বিরতি ১৫ মিনিটের বেশি হবে না।

৮. খেলা আরম্ভ : খেলা আরম্ভের সময় উভয় দলের খেলোয়াড়গণ নিজ নিজ অর্ধে অবস্থান করে। রেফারির সংকেতের সাথে সাথে কিক অফের মাধ্যমে খেলা শুরু হয়।

৯. বল খেলার মধ্যে ও বাইরে : বল গড়িয়ে বা শূন্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে গোল লাইন বা টাচলাইন যখন অতিক্রম করে তখন সে বলকে বাইরে ধরা হয়। বল দাগের উপরে থাকলে খেলার মধ্যে গণ্য হবে।

১০. গোল হওয়া : বল শূন্যে বা মাটি দিয়ে গড়িয়ে দুই পোস্টের ও বারের নিচ দিয়ে গোল লাইন সম্পূর্ণ অতিক্রম করলে গোল হয়েছে বলে ধরা হবে।

১১. অফ সাইড : বল ছাড়া কোনো খেলোয়াড় বিপক্ষের অর্ধে অবস্থান করে এবং তার সামনে বিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় না থাকে ঐ অবস্থায় যদি সে নিজ দলের খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল পায় তাহলে অফ সাইড হবে।

১২. ফাউল ও অসদাচারণ : ফাউল বা অসদাচারণ হলে দু'ধরনের কিক দেওয়া হয়। ক. ডাইরেক্ট ফ্রি কিক, খ. ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক। নিচের ১০টি অপরাধের জন্য প্রত্যক্ষ বা ডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেওয়া হয়–

১. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে লাথি মারা বা লাথি মারার চেষ্টা করা।

২. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ল্যাং মারা।

৩. বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উপর লাফানো।

৪. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আক্রমণ করা।

৫. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা।

৬. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধাক্কা মারা।

৭. বল খেলার পূর্বে বিপক্ষের সাথে সংঘর্ষ করা।

৮. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধরে রাখা।

৯. বিপক্ষ খেলোয়াড়কে থুথু মারা।

১০. বল হাত দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ধরা, বহন করা, আঘাত করা বা সামনে চালিত করা। (গোল কিপারের জন্য এই নিয়ম পেনাল্টি এরিয়ার ভিতর প্রযোজ্য নয়।)

নিম্নের অপরাধগুলোর জন্য পরোক্ষ ফ্রি কিক দেওয়া হয়–

ক. এমনভাবে খেলা যা রেফারির নিকট বিপজ্জনক বলে মনে হয়।

খ. বল আয়ত্তে না থাকা অবস্থায় কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দেওয়া।

গ. গোলরক্ষক বল ছুড়ে দেওয়ার সময় তাকে বাধা দেওয়া।

ঘ. বল নিজে খেলছে না অহেতুক অপরকে বাধা দেওয়া।

ঙ. গোলরক্ষককে আক্রমণ করা, গোলরক্ষক যখন তার সীমানার মধ্যে থাকে।

চ. গোলরক্ষক বল ছেড়ে দেওয়ার পর অন্য খেলোয়াড় টাচ করার পূর্বেই পুনরায় টাচ করা।

ছ. গোলরক্ষক ইচ্ছাকৃতভাবে সময় নষ্ট করলে।

১৩. ফ্রি কিক : যে কিকে সরাসরি গোল হয় তাকে প্রত্যক্ষ ফ্রি কিক বলে। যে কিকে সরাসরি গোল হয় না তাকে পরোক্ষ ফ্রি কিক বলে।

১৪. পেনাল্টি কিক : পেনাল্টি এরিয়ার ভিতর রক্ষণদলের কোনো খেলোয়াড় উক্ত ১০টি অপরাধের যে কোনো একটি করে তাহলে বিপক্ষ দল একটি পেনাল্টি কিক পাবে। (গোল কিপারের জন্য ১০ নং প্রযোজ্য নয়)।

১৫. থ্রো-ইন : কোনো খেলোয়াড়ের স্পর্শে টাচ লাইন সম্পূর্ণ অতিক্রম করলে বিপক্ষ দল ঐ স্থান থেকে নিক্ষেপের মাধ্যমে খেলা শুরু করে ঐ নিক্ষেপকে থ্রো-ইন বলে।

থ্রো-ইন

১৬. গোল কিক : দুই গোল পোস্ট বাদে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের স্পর্শে যখন গোল লাইন অতিক্রম করে তখন যে কিকের মাধ্যমে খেলা শুরু হয় তাকে গোল কিক বলে।

১৭. কর্নার কিক : কোনো খেলোয়াড় গোলপোস্ট বাদে বল যখন নিজ গোল লাইন অতিক্রম করায় তখন বিপক্ষ দল একটি কর্নার কিক পায়।

কলাকৌশল : ফুটবল হচ্ছে গতির খেলা, প্রচণ্ড শারীরিক সামর্থ্যের ও শৈলীর খেলা। ইংরেজিতে যাকে বলে Speed, Stamina ও Skill এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে ঘটলে সে ভালো খেলোয়াড় হয়ে উঠবে। ফুটবল খেলার মৌলিক কলাকৌশলসমূহ যথা–

১. কিকিং, ২. হেডিং, ৩. ড্রিবলিং, ৪. ট্র্যাপিং, ৫. ট্যাকলিং, ৬. গোলকিপিং।

১. কিকিং : ফুটবল পায়ের খেলা। পায়ের সাহায্যে বলের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে ফুটবল খেলার প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করা যায়। পায়ের তিনটি দিক রয়েছে– পায়ের ভিতরের দিক (Inside), পায়ের বাইরের দিক (Outside) এবং পায়ের পাতার উপরের দিকে (Instep)। কিক করার সময় পায়ের এসব অংশ ব্যবহার করতে হয়। পায়ের বিভিন্ন অংশ দিয়ে বিভিন্নভাবে কিক মারা যায়। তবে ইনসাইড কিক সহজ ও সঠিকভাবে করা যায় এবং কাছাকাছি হলে এই কিকের মাধ্যমে বল পাস দেওয়া যায়। অনেক সময় ডানদিকের খেলোয়াড়ের কাছে বল পাস দেওয়ার সময় আউটসাইড কিক ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ পায়ের পাতার বাইরের অংশ দিয়ে পাস দেওয়া। সোজা ও মাটি ঘেঁষে বল পাঠানোর জন্য বাম পা বলের বামপাশে স্থাপন করে দৃষ্টি বলের উপর রেখে ডান পায়ের পাতার উপরের অংশ দিয়ে বলের মাঝ বরাবর জোরে আঘাত করতে হবে।

হাত দুটো প্রসারিত করে শরীরের ব্যালান্স রাখতে হবে। কিকিং ফুট সামনে দিকে যাবে। বল উঁচুতে পাঠাতে হলে বলের নিচের দিকে কিক করতে হবে।

কিকিং

২. হেডিং : হেড করার সময় মনে রাখতে হবে বলকে মাথা দিয়ে আঘাত করতে হবে। হেড করার নিয়ম–

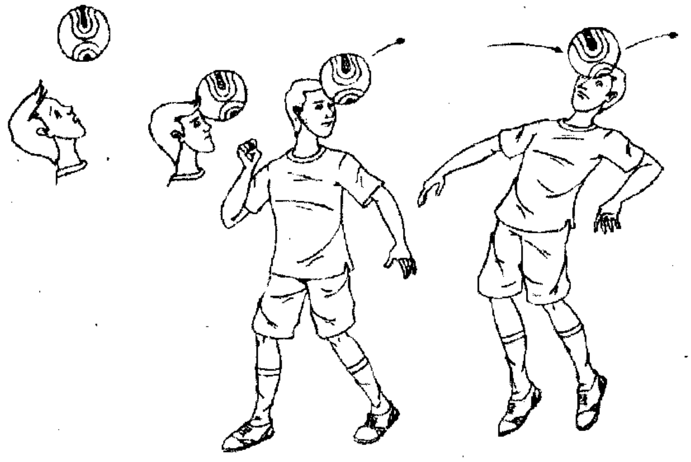

হেডিং

ক. চুলের নিচে কপালের চ্যাপ্টা অংশ দিয়ে হেড করতে হয়।

খ. বলের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

গ. শরীরের উপরের অংশ পিছনের দিকে এনে কপাল দিয়ে আঘাত করতে হবে।

ঘ. হাত দুটো সামান্য প্রসারিত থাকবে।

ঙ. ডানে বামে যে দিকেই হেড করা হোক না কেন কপাল দিয়েই হেড করতে হবে শুধু মাথা ঘুরিয়ে সেদিকে বল পাঠাতে হবে।

৩. ড্রিবলিং : পায়ে পায়ে বলকে গড়িয়ে নেওয়াকে ড্রিবলিং বলে। সতীর্থকে সঠিকভাবে বল যোগান দেওয়ার জন্য ড্রিবলিং করা হয়। ড্রিবলিং দু'রকমের–

ক. পায়ের কাছাকাছি বল রেখে ড্রিবলিং : এই ড্রিবলিং- এর সময় দুপায়ের ভিতরের অংশ ব্যবহার করে ড্রিবল করা হয়।

খ. বল সামান্য দূরে রেখে ড্রিবল : এই প্রকার ড্রিবলিং সাধারণত দ্রুততার জন্য করা হয়। বল সামনে বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুত দৌড়িয়ে পুনরায় আয়ত্তে আনা।

অনুশীলন : মাঠের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে মধ্যমাঠ পর্যন্ত ড্রিবল করে আসবে। একবার ডান পা দিয়ে একবার বাম পা দিয়ে এবং পরবর্তীতে দু'পা ব্যবহার করে অনুশীলন করবে। পায়ের বিভিন্ন অংশ ব্যবহার করে অনুশীলন করবে।

৪. ট্র্যাপিং : হাত ছাড়া শরীরের যে কোনো অংশ দিয়ে বলকে আয়ত্তে আনা বা থামানোকে ট্র্যাপিং বলে। ট্র্যাপিং বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন–

ক. সোল ট্র্যাপ (Sole trap)

খ. শিন ট্র্যাপ (Shin trap)

গ. থাই ট্র্যাপ (Thigh trap)

ঘ. চেস্ট ট্র্যাপ (Chest trap)

ঙ. হেড ট্র্যাপ (Head trap)

ক. সোল ট্র্যাপ : মাটি গড়ানো বা উপরের বল পায়ের তলা দিয়ে থামানোকে সোল ট্র্যাপ বলে।

খ. শিন ট্র্যাপ : উঁচু বল মাটিতে ড্রপ খাওয়ার পর শিন দিয়ে বল থামানোকে শিনট্র্যাপ বলে।

গ. থাই ট্র্যাপ : উপরের বল থাই দিয়ে থামিয়ে নিচে ফেলাকে থাই ট্র্যাপ বলে। বল থাই স্পর্শ করার সাথে সাথে থাইটা নিচের দিকে টানতে হবে। তাহলে বলের গতি কমে সামনে পড়বে।

ট্র্যাপিং

ঘ. চেস্ট ট্র্যাপ : উঁচু বল বুক দিয়ে থামানো বুঝায়। বল টাচ করার সাথে সাথে বুক ভিতরের দিকে টানতে হবে তাহলে বলের গতি থেমে সামনে পড়বে।

ঙ. হেড ট্র্যাপ : কপাল দিয়ে বল ঠেকিয়ে সামনে ফেলাকে হেড ট্র্যাপ বলে। মাথা পিছনের দিকে বাঁকাতে হবে এবং বল টাচ করার সাথে সাথে পিছনের দিকে নিতে হবে।

অনুশীলন : দু'জন সামনাসামনি মুখ করে দাঁড়াবে। একজন বল নিক্ষেপ করে দেবে, অপরজন সেই বল ট্র্যাপ বা থামাবে। বল যে উচ্চতায় পাবে ট্র্যাপও সেভাবে করতে হবে। বল যদি সামনে পড়ে তাহলে সোল বা শিন ট্র্যাপ করতে হবে। বল যদি উপরে আসে তাহলে হেড বা চেস্ট ট্র্যাপ করতে হবে। এভাবে অনুশীলন করে পারদর্শিতা অর্জন করবে।

৫. ট্যাকলিং : ট্যাকলিং ফুটবল খেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাত্মক কৌশল। এই কৌশলের সাহায্যে বিপক্ষের নিকট থেকে বলকে কেড়ে নেওয়া যায়। বিপক্ষের নিকট থেকে বলকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার নামই ট্যাকলিং।

৬. গোলকিপিং : ফুটবল খেলায় গোলকিপারের দায়িত্ব অনেক বেশি। গোলকিপার শরীরের যে কোনো অংশ দিয়ে বল থামাতে পারে। হাত দিয়ে বল ধরা বা থামানোই প্রধান। যেমন–

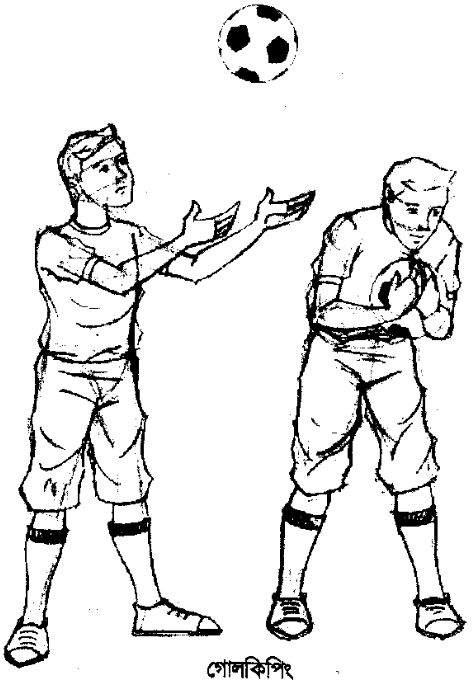

গোলকিপিং

ক. নিচু বল ধরা : কেবল মাটি দিয়ে গড়িয়ে আসে বা সামান্য উপর দিয়ে আসে সে বলকে এক পা সামনে ও অপর পা পিছনে দিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে কোমর থেকে উপরের অংশ সামনে ঝুঁকিয়ে বলটির পিছনে যেয়ে দু'হাত দিয়ে বল ধরে বুকের কাছে আনতে হবে।

খ. কোমর সমান উঁচু বল ধরা : প্রথমে বলের লাইনে যেতে হবে। দৃষ্টি বলের দিকে থাকবে, দু'হাত বলের নিচে দিয়ে জড়িয়ে বুকের সাথে আটকিয়ে রাখতে হবে।

গ. মাথার উপরের বল ধরা : উঁচু বল ধরার সময় লাফিয়ে বলের পিছনে গিয়ে দু'হাত সামনে উপরের দিকে প্রসারিত করে দু'হাতের তালু বলের পিছনে রেখে বল ধরবে। এছাড়াও যে সমস্ত বল আয়ত্তের বাইরে সেগুলোকে ধরার চেষ্টা না করে পাঞ্চ করে সরিয়ে দিতে হবে।

কাজ–১ : একটি আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল মাঠ অংকন করে বিভিন্ন এরিয়ার মাপগুলো উপস্থাপন কর।

কাজ–২ : পায়ের পাতার অংশগুলো ছবি এঁকে দেখাও ও নাম বল।

কাজ–৩ : কপালের কোন অংশ দিয়ে হেড করতে হয়। ব্যবহারিক ক্লাসে প্রদর্শন করে দেখাও।

পাঠ–২ : ক্রিকেট : ক্রিকেট খেলার জন্ম ইংল্যান্ডে। একে 'রাজার খেলা' নামেও অভিহিত করা হয়। ক্রিকেট খেলার মধ্যে একটি আভিজাত্যের ছাপ পরিলক্ষিত হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক, দিনব্যাপী খেলা, পানি পান, দুপুরের খাবার, বিকেলের চা-নাশতা, নিয়ম-কানুনের মধ্যে ভদ্র আচরণ এসব কিছু মিলে একে অভিজাত খেলা হিসেবে গণ্য করা হয়। ক্রিকেট খেলার বিপুল জনপ্রিয়তার প্রেক্ষিতে এর নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, প্রচার, ব্যবস্থাপনা, প্রভৃতি বিষয়ের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিটির প্রয়োজন অনুভূত হয়। টেস্ট খেলুড়ে দেশ যথা– ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত, পাকিস্তান এসব দেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯০৯ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল বা আই.সি.সি গঠিত হয়। ক্রিকেটের বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এই কমিটি। এই ৭টি দেশের পর শ্রীলংকা, জিম্বাবুই ও বাংলাদেশ টেস্ট খেলার মর্যাদা লাভ করেছে।

ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন

১. **পিচ** : পিচ দৈর্ঘ্য ২২ গজ (২০.১২ মি:), প্রস্থ ১০ ফুট। (৩.০৪ মি:) পিচের দুই মাথায় তিনটি করে স্টাম্প থাকে স্টাম্পের উচ্চতা ২৮″, তিন স্টাম্পের প্রস্থ ৯″। স্টাম্পের মাথার উপর দুইটি বেল বসান থাকে। বেলসহ স্টাম্পের উচ্চতা ২৮ ১/২″।

২. **ক্রিকেট মাঠ** : স্টাম্পের মাঝখান থেকে কমপক্ষে ৬০ গজ থেকে ৭৫ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি একটি অর্ধবৃত্ত আঁকতে হবে পরে দুই দাগের মাথা সোজা করে রেখা দ্বারা সংযোগ করে দিলেই বাউন্ডারি লাইন হয়ে যাবে। একে ওভাল সাইজ মাঠ বলে। আবার পিচের মাঝখান থেকে ৬০-৭৫ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে বাউন্ডারি লাইন টানা যায়। একে রাউন্ড সাইজ মাঠ বলে।

৩. **খেলোয়াড়** : ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করা হয়। এদের মধ্যে ১১ জন মাঠে খেলায় অংশগ্রহণ করে একজন দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে থাকে। দ্বাদশ খেলোয়াড় শুধু ফিল্ডিং করতে পারে।

৪. **বল** : বলের ওজন ৫.৫০-৫.৭৫ আউন্স, পরিধি-২২.০৪ থেকে ২২.০৯ সে:মি: এর বেশি হবে না।

৫. ব্যাট : ব্যাটের দৈর্ঘ্য ৩৮″ বেশি নয়, প্রস্থ ৪ ১/৪″ ইঞ্চির বেশি হবে না।

ফিল্ডিং এর বিভিন্ন অবস্থান ও নাম

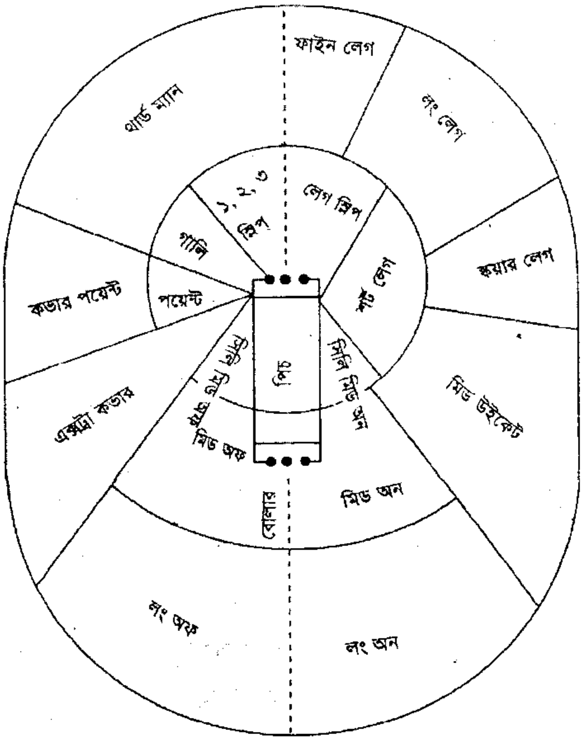

মাঠে খেলোয়াড়দের অবস্থান

৬. মাঠে খেলোয়াড়দের অবস্থান : একটি দল মাঠে ফিল্ডিং করার সময় বিভিন্ন অবস্থানে দাঁড়াতে হয়। এটা নির্ভর করে বোলারের বোলিং কৌশলের উপর। প্রতি দলে ১১ জন খেলোয়াড় থাকে। তাই ফিল্ডিং করার সময় ১১ জন খেলোয়াড়কে ১১টি স্থানে দাঁড়াতে হয়। তবে মাঠে এর চেয়ে অনেক বেশি অবস্থান রয়েছে। এই অবস্থানগুলি নিম্নরূপ–

থার্ড ম্যান, ডিপ ফাইন লেগ, লং লেগ, ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট, সেকেন্ড স্লিপ, থার্ড স্লিপ, ফার্স্ট স্লিপ, লেগ স্লিপ, স্কয়ার লেগ, গালি, কভার পয়েন্ট, শর্ট একস্ট্রা কভার, সিলি মিড অফ, সিলি মিড অন, শর্ট লেগ, একস্ট্রা কভার, মিড অফ, মিড অন, মিড উইকেট, লং অফ, লং অন।

৭. ওভার : ৬টি শুদ্ধ বলে এক ওভার হয়।

৮. বাউন্ডারি : ব্যাটে লেগে বল মাটি স্পর্শ করে যখন বাউন্ডারি রেখা অতিক্রম করে তাকে বাউন্ডারি বলে। বাউন্ডারি হলে ব্যাটসম্যানের নামে ৪ রান যোগ হয়।

৯. ওভার বাউন্ডারি : ব্যাটের আঘাতে বল যখন শূন্যে দিয়ে বাউন্ডারি রেখা অতিক্রম করে তখন তাকে ওভার বাউন্ডারি বলে। ওভার বাউন্ডারি হলে ব্যাটসম্যানের নামে ৬ রান যোগ হয়। বল রশির উপরে পড়লেও ওভার বাউন্ডারি হিসেবে গণ্য হবে।

১০. বাই রান : ব্যাটসম্যানের শরীরে লেগে যদি বল দূরে যায় ঐ সময় যদি ব্যাটসম্যান রান নেয় তাকে লেগ বাই রান বলে।

১১. নো-বল : বোলার নিয়ম-মাফিক বল না করলে নো-বল হয়। নিম্নের কারণগুলোর জন্য নো-বল ডাকা হয়–

ক. বোলারের কনুই ভেঙ্গে গেলে।

খ. ডেলিভারির পূর্বে বোলার পপিং ক্রিজের ভিতর ঢুকে পড়লে।

গ. বোলার বল করার সময় উইকেটের কোনো ক্ষতি করলে।

ঘ. বল পিচের অর্ধেকের এপাশে পড়লে।

ঙ. বল সরাসরি ব্যাটসম্যানের কাঁধের উপর দিয়ে চলে গেলে।

চ. নিয়ম মাফিক ফিল্ডার অবস্থান না করলে।

১২. ওয়াইড বল : বল ব্যাটসম্যানের খেলার নাগালের বাহির দিয়ে গেলে নো-বল হয়। তবে টেস্ট খেলা ও একদিনের খেলার নো-বলের মধ্যে দূরত্বের পাথর্ক্য আছে।

একজন ব্যাটসম্যান কী কী কারণে আউট হয়–

১৩. রান আউট : রান নেওয়ার সময় ব্যাটসম্যান যদি ক্রিজে পৌছার আগেই ফিল্ডারগণ বল দ্বারা বেল ফেলে দেয় তখন ব্যাটসম্যান রান আউটের আওতায় পড়বে।

১৪. এল.বি.ডব্লিউ : আম্পায়ার যদি মনে করেন বল ব্যাটসম্যানের পায়ে না লাগলে অবশ্যই উইকেটে লাগত তখন আম্পায়ার আবেদনের প্রেক্ষিতে ঐ ব্যাটসম্যানকে আউট দেবেন।

১৫. বোল্ড আউট : বোলারের বল সরাসরি বা ব্যাটের আঘাতে স্টাম্পে লেগে বেল পড়ে যায় তাহলে ব্যাটসম্যান আউট হবে। একে বোল্ড আউট বলে।

১৬. কট আউট : ব্যাটসম্যান বল মারার পর বল শূন্যে থাকা অবস্থায় ফিল্ডারগণ বল ধরে ফেললে তখন ঐ ব্যাটসম্যান আউট হবে। এই আউটকে কট আউট বলে।

১৭. স্টাম্প আউট : ব্যাটসম্যান বল খেলার জন্য ক্রিজ ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ সময় যদি উইকেট কিপার বল ধরে বেল ফেলে দেয় তাহলে ব্যাটসম্যান স্টাম্প আউট হবে।

১৮. টাইমড আউট : একজন ব্যাটসম্যানকে আউট হওয়ার পর নতুন ব্যাটসম্যান গার্ড নিতে ৩ মিনিটের বেশি সময় নেয় তখন ঐ ব্যাটসম্যান টাইমড আউটের আওতায় পড়বে। টি টোয়েন্টি খেলার এই সময় ১১/২ মিনিট।

১৯. হিট উইকেট আউট : ব্যাটসম্যান বল খেলার সময় যদি শরীর বা পোশাকে লেগে বেল পড়ে যায় তখন ব্যাটসম্যান হিট উইকেট আউট হবে।

২০. হিট দ্য বল টোয়াইস : ব্যাটসম্যানের ব্যাটে বা শরীরে বল একবার লাগার পর ব্যাটসম্যান নিজের উইকেট রক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার বলে আঘাত করলে বা খেললে আবেদনের প্রেক্ষিতে এই আউটের আওতায় পড়বে।

২১. ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দিয়ে বল ধরা : ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে হাত দ্বারা বল ধরলে বা খেললে বা বাধা প্রদান করলে ঐ ব্যাটসম্যান আউট হবে।

২২. ফিল্ডারদের বল ধরতে বাধা প্রদান : ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে ফিল্ডারদের বল ধরতে বাধা প্রদান করলে ঐ ব্যাটসম্যান আউট হবে।

২৩. শতক ও অর্ধশতক : একজন ব্যাটসম্যান বল খেলে ১০০ রান করলে শতক বা সেঞ্চুরি এবং ৫০ রান করলে অর্ধশতক বা হাফ সেঞ্চুরি হয়।

২৪. মেডেন ওভার : একজন বোলার এক ওভারে কোনো রান না দিলে তাকে মেডেন ওভার বলে। সে ওভারে কোনো উইকেট পেলে তাকে উইকেট মেডেন বলে।

কলাকৌশল : ক্রিকেট খেলায় কলাকৌশলকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. ব্যাটিং, খ. বোলিং, গ. ফিল্ডিং ও ক্যাচিং, ঘ. উইকেট কিপিং

ক. ব্যাটিং : ব্যাটিং-এর প্রাথমিক কলাকৌশলের মধ্যে রয়েছে– গ্রিপ, স্ট্যান্স, ব্যাকলিফট, স্ট্রোক, গ্ল্যান্স, ড্রাইভ ও হুক। এই সমস্ত কলাকৌশল একজন ব্যাটসম্যান সঠিকভাবে প্রয়োগ করে দর্শকদের সহজে আনন্দ দিতে পারে। ব্যাটসম্যান এই কৌশলগুলো প্রদর্শন করে দ্রুত রান নিয়ে কিংবা দর্শনীয় মারের সাহায্যে বাউন্ডারি মেরে দর্শকদের আনন্দে উত্তেজনায় মাতিয়ে তুলতে সক্ষম হয়।

১. গ্রিপ : ব্যাটিং-এ গ্রিপ গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক গ্রিপ উইকেটের উভয় দিকে স্ট্রোক খেলতে সাহায্য করে। একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান ব্যাটের হাতলের উপরিভাগ বাম হাতে এবং নিচের অংশ ডান হাতে ধরবে। হাত দুটি পাশাপাশি থেকে উভয় হাতের আঙ্গুল ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে হাতলটিতে ভালোভাবে আটকিয়ে ধরবে। এতে উভয় হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুল ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো দেখাবে।

২. স্ট্যান্স : একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান পপিং ক্রিজের দুদিকের দু'পা অর্থাৎ ডান পা ক্রিজের মধ্যে এবং বাম পা বাইরে বোলারের দিকে থাকবে। দুপায়ের উপর ভর রেখে সহজ ও স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে হবে। বাম হাত থাকবে বাম উরুর উপর এবং বাম কাঁধ ও চোখের দৃষ্টি বোলারের দিকে থাকবে।

৩. পিছনে ব্যাট উঠানো বা ব্যাক লিফট : পিছনে ব্যাট তোলা ব্যাটিং-এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় দৃষ্টি বলের দিকে এবং বাম কাঁধ ও কনুই বোলারের দিকে থাকবে।

৪. স্ট্রোক বা বল মারা : বলের ধরন অনুযায়ী ব্যাটসম্যানকে বিভিন্ন প্রকার স্ট্রোক খেলতে হয়। এই স্ট্রোক কখনো আক্রমণাত্মক আবার কখনো রক্ষণাত্মক। সামনে এগিয়ে যখন আত্মরক্ষামূলক খেলা হয় তখন তাকে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ স্ট্রোক বলে। এ সময় বাম পা সামনে এগিয়ে যাবে এবং ব্যাট মাটিতে ৩০° থেকে ৪০° কোণ হবে। এ সময় মাটি ও ব্যাটের অবস্থান ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো দেখাবে। আবার পিছনে অর্থাৎ উইকেটের দিকে সরে গিয়েও রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলা যায়। একে ফরওয়ার্ড ডিফেন্সিভ স্ট্রোক বলে।

৫. ড্রাইভ : সজোরে আক্রমণাত্মক খেলা খুবই দর্শনীয় হয়। পপিং ক্রিজের বাইরে বাম পা এগিয়ে নিয়ে ব্যাট ডানে উপরে উঠিয়ে সজোরে বলে আঘাত করে বল দূরে পাঠিয়ে দেওয়াকে ফরোয়ার্ড ড্রাইভ বলে।

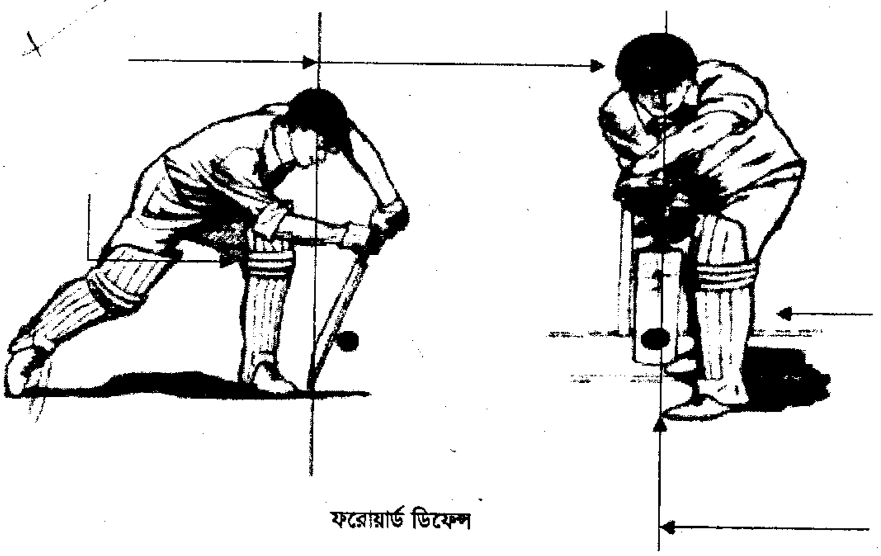

ফরোয়ার্ড ডিফেন্স

৬. হুক শট : বোলার যখন শর্টপিচ বল করে তখন বল ব্যাটসম্যান থেকে বেশ কিছুটা দূরে পড়ে লাফিয়ে ওঠে। এই লাফিয়ে ওঠা বলকে একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান তার ডানপায়ের উপর ভর করে ব্যাট শূন্যে ঘুরিয়ে আঘাত করে এবং বল তার অনসাইডে যায়। হুকশটের জন্য ব্যাটসম্যানের দৃষ্টি, পা ও হাতের কব্জি খুব দ্রুত চালাতে হয়। তবে হুকশট খুবই বিপজ্জনক। দক্ষতা না থাকলে এই শট না নেওয়াই ভালো।

৭. কাট শট : বোলার যদি শট বল করে তাহলে সামনের পা বাড়িয়ে দিয়ে অথবা পিছনের পা ভিতরে দিয়ে বল কাট করা যায়। যারা খেলা শিখছে তাদের জন্য এই কৌশলটি প্রথমে আয়ত্ত করতে যাওয়া ঠিক নয়। এই শটে বল নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অফ স্টাম্পের ২ ফুট বাইরে দিয়ে যাওয়া বলের লাইন ঠিক করে ব্যাট চালাতে হয়।

৮. লেগ গ্ল্যান্স : এই স্ট্রোকে হাতের কব্জি ও হাতকে খুব জোরের সাথে ব্যবহার করতে হয়। ব্যাট করা বল সাধারণত স্কয়ার লেগ ও ফাইনলেগ অঞ্চল দিয়ে বেরিয়ে যায়। লেগ গ্ল্যান্স দু'ভাবে হয়– প্রথম সামনের বাড়িয়ে দেওয়া পা থেকে, আর দ্বিতীয় পা উইকেটের দিকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে গ্ল্যান্স করতে হয়। ব্যাটসম্যানের বাম পায়ের সামনে বা একটু বাইরে বল পড়লে ডান পা মিডল স্টাম্পের দিকে একটু ঘুরে বলে গ্ল্যান্স করতে হয়।

খ. বোলিং : বোলিং ক্রিকেটের অন্যতম প্রধান কৌশল। উঁচুমানের বোলিং-এ ব্যাটসম্যান ব্যাটিংয়ে তেমন সুবিধা করতে পারে না। অনেক সময় আক্রমণাত্মক বোলিং–এ ব্যাটসম্যান দ্রুত আউট হয়ে যায় এবং এর ফলে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা সহজ হয়। বোলিং-এর প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু কলাকৌশল নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. বলের উপর সঠিক গ্রিপ : কোন ধরনের বল করা হবে তার উপর নির্ভর করে বলের গ্রিপে তারতম্য হয়। ফাস্ট বল ও স্পিন বলের গ্রিপ এক রকম হয় না। তবে যে কোনো ধরনের বল হোক না কেন বলের গ্রিপ নিতে হবে আঙ্গুলের সাহায্যে, হাতের তালু দিয়ে নয়। এতে বল বোলারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

২. রান আপ : বোলার দৌড়ে এসে বোলিং ক্রিজ থেকে ব্যাটসম্যানের উদ্দেশে বল করে। এই দৌড়ে আসার প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দৌড়ানোর ফলে হাত থেকে ছেড়ে দেওয়ার বলের গতি বৃদ্ধি পায়। গতি সম্পন্ন বলে অনেক ব্যাটসম্যান স্বচ্ছন্দে খেলতে পারে না। রান আপে পায়ের পাতা ব্যবহার করতে হয় এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে বারবার দৌড়ে এসে পায়ের পদক্ষেপ ঠিক করে নিতে হয়। এ সময় শরীরের ভারসাম্য একটু সামনে ঝুঁকানো থাকে।

৩. ডেলিভারি : রান আপের শেষ পর্যায়ে এসে হাত থেকে বল ছেড়ে দেওয়াকে ডেলিভারি বলে। একজন ডানহাতি বোলারকে বলের ডেলিভারির পূর্ব মুহূর্তে বাম পায়ের উপর লাফ দিয়ে শরীরকে পাশের দিকে ঘুরিয়ে নিতে হবে এবং এর সাথে ডান পা সামনে, ডান হাত মুখের কাছাকাছি, বাম হাত সোজা উপরের দিকে ও চোখের দৃষ্টি ব্যাটসম্যানের উপর থাকতে হবে।

৪. ফলো-থ্রু : বল হাত থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ফলো-থ্রু করতে হয়। বল ছাড়ার পর পরই শরীর দ্রুত ঘুরে যায়, ডান কাঁধ থাকে ব্যাটসম্যানের দিকে। ডান হাত বাম পায়ের পাশ দিয়ে পিছনের দিকে যেতে থাকে। দৃষ্টি থাকে পিচের উপর যেখানে বল পড়ছে। এ সময় কয়েক পদক্ষেপ সামনে যেতে হয়।

ফাস্ট বোলিং

১. ফাস্ট বোলিং ইন স্যুইং : দ্রুতগতির বল বা ফাস্ট বোলিং-এ ইন স্যুইং বল করা সহজ। কিন্তু দূরত্ব ও বলের নিশানা ঠিক রেখে বারবার বল করা মোটেই সহজ নয়। দূরত্ব ও নিশানা ঠিক না থাকলে ঐ বোলারকে অনেক রান দিতে হয়। ইন স্যুইং

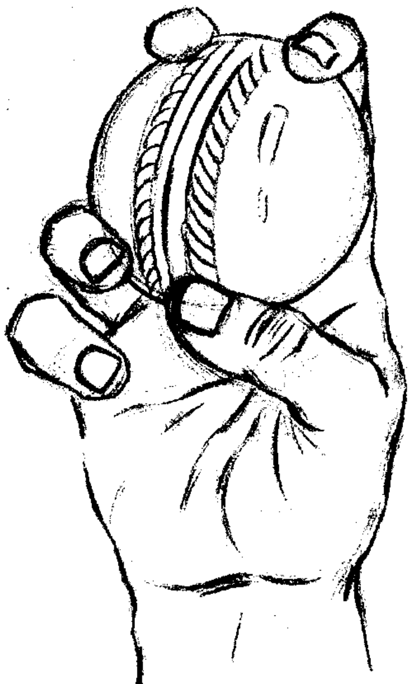

ফাস্ট বোলিং বলের গ্রিপ

বলের বৈশিষ্ট্য হলো বল অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে পড়ে দ্রুত উইকেটের দিকে ছুটে যায়। এই বলের গ্রিপে বলের সেলাই তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মাঝে থাকে। বুড়ো আঙ্গুল, কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুলের গোড়ায় বলটি ধরতে হবে। বলটি এভাবে ধরার উদ্দেশ্য হলো বলের ডেলিভারির সময় বলের সেলাই লেগ স্লিপের দিকে মুখ করে থাকে। ডেলিভারির সময় ডান হাত অনেক উপরে এবং বাম হাত স্বাভাবিকভাবে নিচের দিকে থাকে। ইন স্যুইং বলে শর্ট লেগে দাঁড়ান ফিল্ডারের কাছে ক্যাচ ওঠে।

২. ফাস্ট বোলিং আউট স্যুইং : বলের গ্রিপ ইন স্যুইং বলের মতো তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে বলের সেলাইকে মাঝে রেখে ধরতে হয় এবং বলের নিচে অন্য ৩টি আঙ্গুল থাকে। তবে বলের ডেলিভারির সময় বলের সেলাই প্রথম স্লিপের ফিল্ডারের দিকে মুখ করে থাকে।

স্পিন বোলিং

১.লেগ স্পিন:এখানে স্পিন বোলিং মূলত দু'প্রকারের, সাইড স্পিন ও টপ স্পিন। সাইড স্পিন বোলিং– এ বল ঘড়ির কাঁটার মতো কিংবা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে। একজন ডানহাতি স্পিন বোলার যখন একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যানকে স্পিন বোলিং করে এবং বল ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরতে ঘুরতে যায় তাহলে সে বল লেগ ব্রেক করে। আবার ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরে ঘুরে গিয়ে পিচে পড়লে সে বল অফ ব্রেক করে। টপ স্পিন হচ্ছে লেগ ব্রেক ও অফ ব্রেকের সমন্বয়। স্পিন বোলিং-এ বল ডেলিভারির সময় কব্জি বাহুর সমকোণে অবস্থান করে। লেগ স্পিন বোলিং-এ মোটামুটি লেগ স্টাম্পের বরাবরে গিয়ে পিচের উপর পড়ে এবং তারপর গতি পরিবর্তন করে অফ স্টাম্পের দিকে ছুটে যায়। লেগ স্পিনে বলের গ্রিপ তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঙ্গুলের মাঝে থাকে, বুড়ো আঙ্গুল বল আটকে থাকতে সাহায্য করে। বল ডেলিভারির সময় বাম কাঁধ খুব উঁচু থাকবে না। কব্জি থাকে ঢিলে অবস্থায় এবং তৃতীয় আঙ্গুল বল স্পিনের কাজ করে।

২. অফস্পিন– অফ স্পিন বোলিং-এ প্রথম ও দ্বিতীয় আঙ্গুল বলের সেলাই-এর উপর একটু ফাঁক রেখে থাকবে। বুড়ো আঙ্গুল বলের সেলাই-এর বরাবর এবং অপর দু'টি আঙ্গুল নিচে পরস্পর লেগে থাকবে। তর্জনী বা প্রথম আঙ্গুল বলের সেলাই-এর উপর নিচের দিকে টান দিয়ে বলটি ঘুরাবে। অফস্পিন বল অবশ্যই ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরবে অর্থাৎ বাম থেকে ডানে ঘুরবে। দরজার নব যেমন ঘুরিয়ে দরজা খুলতে গেলে হাতের কব্জি যে কাজ করে, অফ স্পিন বোলিং-এ কব্জি ঠিক সেভাবে ঘুরবে।

গ. ফিল্ডিং ও ক্যাচিং– ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং ও বোলিং-এর ন্যায় ফিল্ডিংও সমান চিত্তাকর্ষক এবং খেলার জয় পরাজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফিল্ডিং-এ যখন কোনো ব্যাটসম্যানকে কট আউট করা হয় তখন তার ক্যাচ ধরায় দর্শক-সাধারণ আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক ক্রিকেটারকে ভালো ফিল্ডার হতে হয়। ফিল্ডিং-এ ক্যাপটেন বা বোলারের ইচ্ছেমতো ফিল্ডারদের দাঁড়াতে হয়। ফিল্ডিং থেকে সংগৃহীত বল সব সময় উইকেট কিপারের কাছে ফেরত পাঠাতে হয়। ফিল্ডিং-এ ক্যাচিং একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। ব্যাটসম্যানের উঠিয়ে দেওয়া বল ধরার জন্য ফিল্ডারকে বলের লাইনের নিচে যেতে হবে। দৃষ্টি থাকবে বলের উপর। দু'হাত খুলে আঙ্গুলগুলো পাশাপাশি রাখতে হবে। হাতের আঙ্গুল ও তালু নমনীয় থাকবে। বল হাতে স্পর্শ লাগার সাথে সাথে হাত বুকের কাছে টেনে আনতে হবে এবং আঙ্গুল বন্ধ করে ফেলতে হবে। বল ক্যাচিং ছাড়া মাঠে গড়িয়ে যাওয়া বলও ফিল্ডারকে থামাতে, কুড়িয়ে নিতে ও থ্রো করতে হয়।

থ্রো-ইন : আক্রমণাত্বক ফিল্ডিং-এ দ্রুত ও সঠিকভাবে থ্রো করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে একজন ভালো ব্যাটসম্যানকে রান আউট করা সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, এতে ব্যাটিং সাইডের রান রেট কমে আসে। ভালো থ্রো করতে হলে নমনীয় কব্জি, হাত ও কাঁধ ব্যবহার করতে হয়। থ্রো-ইন কৌশলের মধ্যে বল হাতের মধ্যে আসার পর কেবল থ্রো করার উদ্যোগ নিতে হয়। একটু আগে বা পরে হলে বল যেমন ধরা যায় না তেমনি থ্রোও করা যায় না। থ্রো করার সময় কব্জি, হাত, কাঁধ, দু'পা-এর সমন্বিত কার্যক্রম দরকার।

ঘ. উইকেট কিপিং : মাঠে খেলোয়াড়দের যত রকমের অবস্থান আছে, তার মধ্যে উইকেট কিপিং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দল গঠনের সময় সেরা উইকেট কিপারকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দ্রুত প্রতিক্রিয়া, শক্তিশালী হাত, শারীরিক শক্তি ও সাহসের অধিকারী হতে হয়। এটা সাধারণভাবে বিবেচনা করা হয় যে, একজন উইকেট কিপার জন্মায় কিন্তু তাকে তৈরি করা যায় না। উইকেট কিপারের সাজ-সরঞ্জাম অন্য খেলোয়াড়দের থেকে আলাদা। উইকেট কিপিং প্যাড, গ্লাভস, ইনার গ্লাভস, ক্যাপস, গার্ডস, জুতা এগুলো হচ্ছে সাজ-সরঞ্জাম। ব্যাটসম্যানের মতো উইকেট কিপারকেও স্ট্যান্স নিতে হয়। কারণ তাকে বোলারের কিংবা ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে আসা বল ধরার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হয়। উইকেটের পিছনে পা ফাঁক করে দু'পায়ের উপর সমান ভারসাম্য রেখে দাঁড়াতে বা অর্ধ বসার ভঙ্গিতে থাকতে হয়। দেহকে নিচু করে দৃষ্টিকে উইকেটের উপরের লাইনে রাখতে হবে। বাম পা থাকবে মধ্য উইকেটের লাইনে, হাত দুটো পাশাপাশি একসাথে, আঙ্গুল নিচের দিকে এবং দৃষ্টি বলের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে।

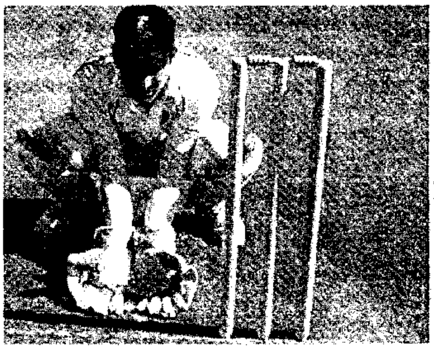

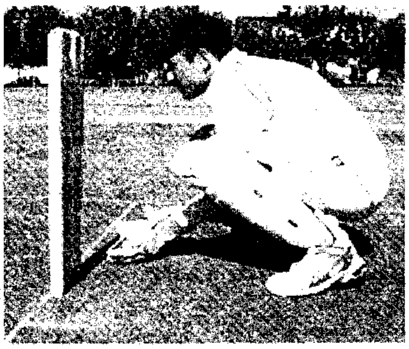

উইকেট কিপিং

কাজ–১ : ফাস্ট বলের গ্রিপ ও স্পিন বলের গ্রিপের পার্থক্যগুলো বলো এবং করে দেখাও।

কাজ–২ : ব্যাটসম্যানের স্ট্যান্স মাঠে প্রদর্শন কর।

কাজ–৩ : ফাস্ট বল ও স্পিন বলের সময় উইকেট কিপারের পজিশন দেখাও।

পাঠ–৩ : ব্যাডমিন্টন : ব্যাডমিন্টন খেলার উৎপত্তি নিয়ে বহুমত থাকলেও অধিকাংশের ধারণা এ খেলার জন্ম হয়েছে ভারতের পুনাতে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পুনায় অবস্থিত ইংরেজ সৈন্যরা স্থানীয় লোকজনদেরকে শাটলকর্ক ও ছোট ব্যাট দিয়ে খেলতে দেখে কৌতূহলবোধ করেন। তারা স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে ঐ খেলা শিখে ছুটিতে ইংল্যান্ডে যেয়ে খেলাটি প্রচলন করেন। ভারতে কর্মরত ইংরেজ সৈন্যরা ছুটিতে বাড়ি গিয়ে ব্যাডমিন্টন নামক জায়গায় একত্র হয়ে খেলাটি শুরু করেন। সে থেকে সে জায়গার নাম

অনুসারে ব্যাডমিন্টন খেলার নামকরণ হয়। পরবর্তীকালে দেশে দেশে এ খেলার প্রচলনের ফলে সকল বয়সের ও শ্রেণির নারী-পুরুষ ব্যাডমিন্টন খেলায় জড়িয়ে পড়ে।

ক. খেলার কোর্ট : কোর্টের মেঝে কাঠের হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে তা কোনোভাবেই পিচ্ছিল হতে পারবে না। শাটল সাদা রঙের তাই কোর্টের মেঝে গাঢ় রঙের হবে কিন্তু চকচকে হতে পারবে না। মেঝের রং সাদা ব্যতীত হালকা রঙের হলে কোর্টের দাগ হবে কালো রঙের, অন্যথায় এর রং হবে সাদা। ব্যাডমিন্টন খেলা সিঙ্গলস ও ডাবলসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গেলস কোর্ট– দৈর্ঘ্য ১৩.৪১ মিটার (৪৪ ফুট), প্রস্থ ৫.১৮ মিটার (১৭ ফুট)। ডাবলস কোর্ট– দৈর্ঘ্য ১৩.৪১ মিটার (৪৪ ফুট), প্রস্থ– ৬.১০ মিটার (২০ ফুট)। কোর্টের দু'টি পার্শ্বরেখায় দুই মধ্যবিন্দু বরাবর ব্যাডমিন্টন নেট টাঙ্গানোর জন্য দু'টি খুঁটি বসবে। এই বিন্দু থেকে উভয় দিকে প্রান্তরেখার সমান্তরালে ১.৯৮ মিটার (৬ ৬˝) দূরে লাইন টানতে হবে। একে শর্ট সার্ভিস লাইন বলে। আবার উভয় প্রান্তরেখা থেকে কোর্টের অভ্যন্তরে ০.৭৬ মিটার (২ ৬˝) দূরে প্রান্তরেখার সমান্তরালে দু'টি লাইন টানতে হবে। একে দ্বৈত খেলার জন্য লং সার্ভিস লাইন বলে। শর্ট সার্ভিস লাইন দ্বারা বিভক্ত দু'দিকের দু'টি কোর্টের মাঝ বরাবর পার্শ্বরেখার সমান্তরালে দু'টি লাইন টেনে রাইট সার্ভিস কোর্ট ও লেফট সার্ভিস কোর্ট নামে দু'টি কোর্ট তৈরি করতে হবে। কোর্টের সকল মার্কিং বা দাগ ৪ সেন্টিমিটার চওড়া হবে।

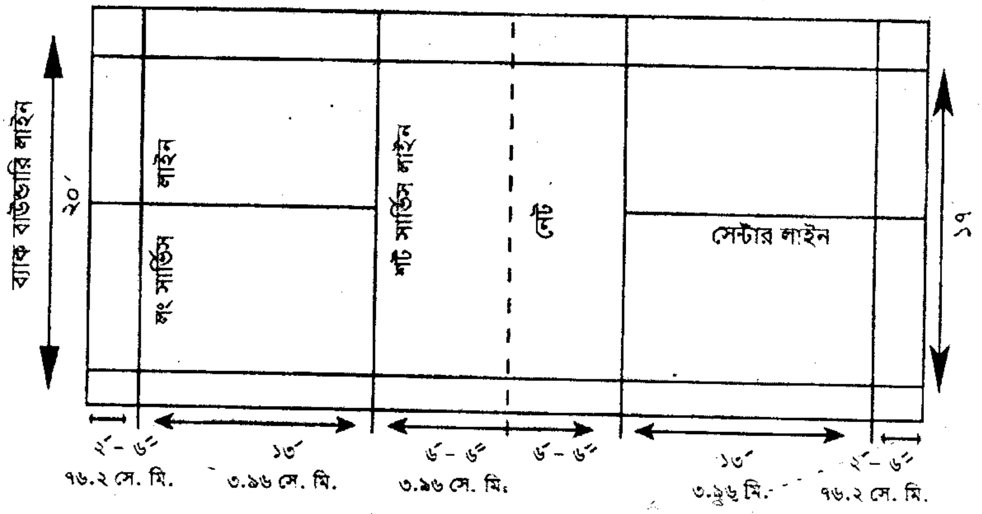

ব্যাডমিন্টন খেলার কোর্ট একক ও দ্বৈত

খ. খেলার সরঞ্জাম :

১. পোস্ট বা খুঁটি : খুঁটির উচ্চতা মেঝে থেকে ১.৫৫ মিটার (৫ ˝)।

২. নেট : নেটের দৈর্ঘ্য হবে ৫.১৮ মিটার (১৭ ফুট) এবং প্রস্থ ০.৭৬ মিটার (২ ফুট ৬ ইঞ্চি)। মেঝে থেকে নেটের দু'পোস্টের দিকে উচ্চতা ১.৫৪ মিটার (৫ ফুট ১ ইঞ্চি) এবং মাঝখানে মেঝে থেকে ১.৫২ মিটার (৫ ফুট)। নেটের উপরের প্রান্ত ০.০৭৬ মিটার (৩ ইঞ্চি) চওড়া একটি সাদা ফিতা দিয়ে দু'দিকে মুড়ে দিতে হবে এবং এর মধ্য দিয়ে শক্ত দড়ি বা তার চলে গিয়ে দু'দিকের খুঁটির মাথায় যুক্ত হবে।

৩. র‍্যাকেট : ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটের হাতলের দৈর্ঘ্য ৬৮ সে:মি: এবং র‍্যাকেটের মাথা ২৯ সে:মি:-এর বেশি হওয়া উচিত নয়। র‍্যাকেটের মাথার যে জাল থাকে তার দৈর্ঘ্য ২৮ সে:মি:, প্রস্থ ২২ সে:মি: এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

৪. শাটল : এর ওজন প্রায় ৪.৭৪–৫.৫০ গ্রাম। একটি কর্কের মধ্যে ১৪ থেকে ১৬টি হাঁসের পালক ঢুকানো থাকে। এর পরিধি ১ ইঞ্চি থেকে ১ ১/২ ইঞ্চি। উপরের পালকের গোলাকার পরিধি ২ ১/৮'' থেকে ২ ১/২''। প্রসারিত অবস্থায় একটি অন্যটির সাথে সুতা বা ঐ জাতীয় কিছু দ্বারা গাঁথা থাকবে। পিছনের রেখার উপর থেকে একজন খেলোয়াড় যখন খুব জোরে উপরের দিকে র‍্যাকেট দিয়ে শাটল আঘাত করে এবং সেই শাটল যদি বিপক্ষ কোর্টের লং সার্ভিস লাইনের কাছাকাছি গিয়ে পড়ে তখনই এই শাটল মানসম্পন্ন বলে ধরা হয়।

ব্যাডমিন্টন খেলার নিয়মাবলি

১. টস : যে খেলোয়াড় বা দল টসে জয়লাভ করবে সে বা সে দল সার্ভিস অথবা কোর্ট নেবে। বাকি পছন্দ পরাজিত খেলোয়াড় গ্রহণ করবে।

২. পয়েন্ট : একক ও দ্বৈত খেলায় ২১ পয়েন্টে গেম সম্পন্ন হবে। তবে ২ পয়েন্টের ব্যবধান থাকতে হবে। যেমন– ১৯–২১, ২০–২২ পয়েন্ট এইভাবে। কিন্তু ৩০ পয়েন্টের উপরে যেতে পারবে না। যে আগে ৩০ পয়েন্ট পাবে সে বিজয়ী হবে। তৃতীয় সেটে ১১ পয়েন্ট হলে প্রান্ত বদল করতে হয়।

৩. সার্ভিস : মহিলা ও পুরুষ এককের খেলায় যে দোষ করবে সে সার্ভিস হারাবে। পুরুষ ও মহিলা ডাবলসের খেলায় যে দল প্রথম সার্ভিস করবে সে দল প্রথমবার সেকেন্ড হ্যান্ড পাবে না। দোষ করলে বিপক্ষ দল সার্ভিস পাবে। সার্ভিস কোনাকুনি কোর্টে করতে হয়।

৪. সার্ভিস ফল্ট : নিম্নলিখিত কারণে সার্ভিস ফল্ট হয়–

ক. শাটলটি কোনাকুনি কোর্টে না পড়লে।

খ. সার্ভিসের সময় কোর্ট থেকে যে কোনো পা শূন্যে উঠে গেলে।

গ. শাটলটি শর্ট সার্ভিস এরিয়ায় বা লং সার্ভিস এরিয়ায় পড়লে।

ঘ. শাটল কোর্টের বাইরে পড়লে।

ঙ. শাটলটি হাত থেকে ছেড়ে সার্ভিস না করলে।

চ. শাটলটি কোমরের উপরে তুলে সার্ভিস করলে।

ছ. শাটলটি যদি নেটে আটকে যায়।

জ. সার্ভিস করার সময় কোর্টের দাগ স্পর্শ করলে।

ঝ. সার্ভিসকারী ইচ্ছাকৃতভাবে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ধোঁকা দিলে।

৫. লেট : খেলা চলাকালীন খেলার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোনো দৈব দুর্ঘটনার কারণে স্বাভাবিক খেলা বন্ধ হলে আম্পায়ার লেট ঘোষণা করবেন। যেমন : রিসিভার প্রস্তুত হওয়ার পূর্বেই সার্ভিস করলে কিংবা উভয় খেলোয়াড় একসঙ্গে আইন ভঙ্গ করলে।

৬. ব্যাডমিন্টনে ৫টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়–

ক. পুরুষ একক, খ. পুরুষ দ্বৈত, গ. মহিলা একক, ঘ. মহিলা দ্বৈত, ঙ. মিশ্র দ্বৈত।

৭. খেলা পরিচালনার জন্য একজন রেফারি, একজন আম্পায়ার, একজন স্কোরার ও দুই বা চারজন লাইন জাজ থাকবে।

ব্যাডমিন্টন খেলার কলাকৌশল : ব্যাডমিন্টন খেলার কলাকৌশলকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. গ্রিপ, ২. ফুটওয়ার্ক, ৩. সার্ভিস, ৪. স্ট্রোক ও স্ম্যাশিং

১. গ্রিপ বা র‍্যাকেট ধরা : র‍্যাকেট ব্যবহারের প্রথম আবশ্যকীয় বিষয় হচ্ছে র‍্যাকেট ধরা। র‍্যাকেট ধরার ক্ষেত্রে কব্জির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ফোরহ্যান্ড ও ব্যাকহ্যান্ড শর্ট নেওয়ার সময় গ্রিপের তারতম্য হয়ে থাকে। এজন্য গ্রিপকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. ফোরহ্যান্ড গ্রিপ।

খ. ব্যাকহ্যান্ড গ্রিপ।

ক. ফোরহ্যান্ড গ্রিপ : একজন ডানহাতি খেলোয়াড় তার ডানদিক দিয়ে যে শটগুলো খেলে তা সবই ফোরহ্যান্ড গ্রিপের অন্তর্ভুক্ত। ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে র‍্যাকেটের গোড়া এমনভাবে ধরতে হবে যেন ইংরেজী 'V' অক্ষরের মতো দেখায়।

খ. ব্যাকহ্যান্ড গ্রিপ : ডানহাতি খেলোয়াড় তার শরীরের বামপাশে যে শটগুলো খেলে তা ব্যাকহ্যান্ড গ্রিপের অবস্থান থেকে হাতটি বাম দিকে এমনভাবে ঘুরাতে হবে যে হাতের বুড়ো আঙ্গুল র‍্যাকেটের পিছনে আড়াআড়ি ও কোনাকুনি অবস্থানে থাকে। র‍্যাকেটের হাতলের শেষ অংশটুকু হাতের তালুর মধ্যে থাকবে।

২. ফুটওয়ার্ক বা পায়ের কাজ : দ্রুত স্ট্রোক নেওয়ার জন্য চমৎকার ফুটওয়ার্ক প্রয়োজন। স্ট্রোকের প্রয়োজনে সামনে, পিছনে, পাশে পা ফেলে, লাফ দিয়ে কিংবা দৌড়ে গিয়ে খেলতে গেলে ফুটওয়ার্ক ভালো হতে হয়। সার্ভিস করা বা সার্ভিস রিসিভ করার সময় একজন ডানহাতি খেলোয়াড়কে বাম পা আগে, ডান পা সামান্য পিছনে এবং হাঁটু সামান্য ভেঙ্গে দাঁড়াতে হয়। শরীরের ওজন পায়ের পাতার উপর থাকে। দু'পা ১৪" থেকে ১৮" দূরত্বে থাকবে। একে স্ট্যান্স বলে। এছাড়া এক পা পিভটিং করে এবং অন্য পা স্থির রেখেও ফুটওয়ার্ক করা হয়।

৩. সার্ভিস : একজন ভালো খেলোয়াড়কে তিন ধরনের সার্ভিসের কৌশল জানতে হয়।

ক. হাইডিপ সার্ভিস, খ. লো-সার্ভিস, গ. ড্রাইভ সার্ভিস

ক. হাইডিপ সার্ভিস : যখন খুব উঁচু দিয়ে শাটল খাড়াভাবে বিপক্ষ কোর্টের বেজ লাইনের কাছে ফেলা হয় তাকে হাইডিপ সার্ভিস বলা হয়। এর উচ্চতা অনেক সময় ২০ বা তারও বেশি হয়ে থাকে। এককের খেলায় ফোরহ্যান্ড গ্রিপ ব্যবহার করে এই সার্ভিস করা হয়।

খ. লো-সার্ভিস : শাটল যখন খুব নিচু দিয়ে বিপক্ষের সার্ভিস এলাকার শট সার্ভিস লাইন দ্বারা যুক্ত কোনায় ফেলা হয় তখন একে লো-সার্ভিস বলা হয়। র‍্যাকেটটি তখন ফোরহ্যান্ড গ্রিপে ধরা থাকে।

গ. ড্রাইভ সার্ভিস : নিচু দিয়ে সজোরে শাটলটি পিছনে বা সার্ভিস গ্রহণকারীর ডানদিক বরাবর সার্ভিস করলে অনেক সময় ভালো ফল দেয়। সজোরে এই সার্ভিসটি করা হয় বলে একে ড্রাইভ সার্ভিস বলে।

৪. স্ট্রোক বা স্ম্যাশিং : স্ট্রোক বা আঘাত করার কৌশলকে ৬ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো–

ক. ফোরহ্যান্ড স্ট্রোক : ডানহাতি খেলোয়াড়ের বাম পা বা কাঁধ নেটের দিকে থাকবে এবং শরীরের ডান পাশ দিয়ে শাটলে আঘাত করতে হবে। র‍্যাকেট পিছনে নেওয়ার সময় ডান পায়ের উপর দেহের ভর থাকবে। শাটলে আঘাত করার সাথে সাথে শরীরের ওজন ডান পা থেকে বাম পায়ের উপর চলে আসবে।

খ. ব্যাকহ্যান্ড শট : ডানহাতি খেলোয়াড়ের শরীরের বাম পাশ দিয়ে শাটলে আঘাত করতে হবে। এজন্য ডান কাঁধ ও ডান পা নেটের দিকে থাকবে।

গ. ওভারহ্যান্ড শট : প্রথমত বাম পা সামনে রেখে ডান পায়ের উপর শরীরের ওজন রাখতে হবে। শট নেওয়ার সময় শাটলের দিকে চোখ রেখে শরীর পিছনের দিকে একটু ঝুঁকে যাবে এবং মাথার উপর নিয়ে পিছন দিক দিয়ে র‍্যাকেট তুলে এনে শাটলে আঘাত করতে হবে।

ঘ. ড্রপ শট : এ শটের কৌশল হচ্ছে শাটল নেটের সামান্য উপর দিয়ে নেট পার হয়ে বিপক্ষ কোর্টে গিয়ে পড়বে।

ঙ. আন্ডারহ্যান্ড ড্রপ শট : সার্ভিস করার সময় র‍্যাকেট সুইং করে শাটলে লাগার সাথে সাথে র‍্যাকেটের গতি রোধ করতে হবে।

চ. স্ম্যাশিং : মাথার উপর শট নেওয়ার কৌশলে র‍্যাকেট ধরা হাতটি পিছন থেকে সুইং করে উপরে উঠবে এবং যে মুহূর্তে র‍্যাকেট শাটল স্পর্শ করতে যাচ্ছে তখনই হাতের কব্জি নিচের দিক করে সজোরে শাটলে আঘাত করতে হবে। এর ফলে শাটলটি দ্রুত নিচের দিকে নেমে যাবে এবং বিপক্ষের কোর্টে গিয়ে আছড়ে পড়বে। খেলোয়াড় লাফিয়ে উঠেও স্ম্যাশ করতে পারে।

কাজ–১ : ব্যাডমিন্টন কোর্টটি অংকন করে দেখাতে বলবেন।

কাজ–২ : ব্যবহারিক ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের গ্রিপের কৌশলগুলো প্রদর্শন করতে বলবেন।

কাজ–৩ : সার্ভিসের ফল্টগুলো এক গ্রুপ বলবে ও অপর গ্রুপ ভুল হলে তা শোধরিয়ে দিতে বলবেন।

পাঠ–৪: ভলিবল : ভলিবল একটি দলগত খেলা। খোলা জায়গায় কিংবা জিমন্যাসিয়ামে সকল বয়সের নারী-পুরুষ ভলিবল খেলতে পারে। এই আনন্দপূর্ণ খেলাটির উদ্ভব ঘটে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। ১৮৯৫ সালে হলিউডের ওয়াই.এম.সি.এ কলেজের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক উইলিয়াম জি.মরগ্যান এ খেলা আবিষ্কার করেন। ১৮৯৬ সালে আমেরিকার স্প্রিং ফিল্ড কলেজের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের শিক্ষকরাই এ খেলার ধরন অনেকটা ভলি-এর মতো দেখে এর নাম ভলিবল রাখেন। ১৮৯৭ সালে উত্তর আমেরিকায় ওয়াই.এম.সি.এ প্রথম ভলিবল খেলার আইন-কানুন তৈরি করেন। ১৯৪৭ সালের ২০ এপ্রিল ফ্রান্সের মি: পল লিবার্ড-এর প্রচেষ্টার আন্তর্জাতিক ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ভলিবল ফেডারেশন গঠিত হয়। তখন থেকে বাংলাদেশে ভলিবল খেলার প্রসার ও জনপ্রিয় করতে এই ফেডারেশন কাজ করে আসছে।

ভলিবল খেলার আইনকানুন–

ক. খেলার কোর্ট

১. খেলার কোর্ট : খেলায় কোর্ট হবে একটি আয়তক্ষেত্র যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপ যথাক্রমে ১৮ মিটার × ৯ মিটার। কোর্টের মেঝে থেকে ৭ মিটার উচ্চতার মধ্যে কোনো প্রকারের প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।

২.বাউন্ডারি লাইন : কোর্টের চতুর্দিকের সীমানা ৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাউন্ডারি লাইন দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। বাউন্ডারি লাইন থেকে চারদিকে ২ মিটার বিস্তৃত স্থান প্রতিবন্ধকতা মুক্ত থাকতে হবে।

৩. সেন্টার লাইন : নেটের সরাসরি নিচে ১৮ মিটার দৈর্ঘ্যর পুরো কোর্টটিকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে পার্শ্বরেখা এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মধ্য রেখা বা সেন্টার লাইন টানা হবে।

৪. এ্যাটাক এরিয়া : মধ্য লাইনের সমান্তরালে মধ্য লাইন থেকে ৩ মি. দূরে একটি লাইন টানতে হবে যার দু'প্রান্ত দুই পার্শ্বের লাইনের সাথে গিয়ে মিশবে। মধ্য লাইন বা মধ্যরেখা দ্বারা বিভক্ত দু'টি কোর্টে ২টি অ্যাটাক এরিয়া তৈরি হবে, এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে যথাক্রমে ৯ মিটার × ৩ মিটার।

৫. সার্ভিস এরিয়া : ব্যাক লাইনের পিছনে পুরো জায়গা এবং ব্যাক লাইন থেকে ২০ সে:মি: ফাঁক রেখে ১৫ সে:মি: দাগ দিতে হবে। এর ভিতরের জায়গাকে সার্ভিস এরিয়া বলে।

৬. তাপমাত্রা : যদি ইনডোর কোর্ট হয় তাহলে কোর্টের তাপমাত্রা ১০° সেলসিয়াস অথবা ৫০° ফারেনহাইটের নিচে হবে না।

খ. নেট

১. মাপ ও গঠন : নেটের দৈর্ঘ্য ৯.৫ মিটার এবং প্রস্থ ১ মিটার। নেটের প্রতিটি ঘর ১০০ সেন্টিমিটার বর্গাকার হবে। নেটের উপরের প্রান্তদেশ ৫ সেন্টিমিটার চওড়া সাদা ক্যানভাস কাপড় দু'ভাঁজ করে মোড়া থাকবে। এই ক্যানভাসের মধ্য দিয়ে নমনীয় তার বা রশি ঢুকিয়ে নেটের উপরের প্রান্তদেশ সোজা টানা অবস্থায় রাখতে হবে।

২. নেটের উচ্চতা : নেটের মাঝামাঝি জায়গায় ভূমি থেকে শীর্ষদেশের উচ্চতা পুরুষদের জন্য ২.৪৩ মিটার, মহিলাদের জন্য ২.২৪ মিটার।

৩. সাইড মার্কার ও অ্যান্টেনা : সাইড লাইন ও সেন্টার লাইনের সংযোগ স্থলে ৫ সেন্টিমিটার চওড়া একটি সাদা ফিতা নেটের সাথে লম্বভাবে ঝুলানো থাকবে যা প্রয়োজনে সরানো যায়। ফাইবার গ্লাস বা অনুরূপ কোনো বস্তু দিয়ে তৈরি ১.৮০ মিটার লম্বা ১০ মিলিমিটার ব্যাসের ২টি অ্যান্টেনা পাশের সাদা ফিতার উপরে লম্বভাবে ২ দিকে বেঁধে দিতে হবে।

গ. বল, খেলোয়াড় ও খেলোয়াড়দের সরঞ্জাম

১. বল : বল হবে গোলাকার নরম চামড়ার তৈরি, ভিতরে থাকবে নরম ব্লাডার। বলের পরিধি ৬৫ সে:মি: থেকে ৬৭ সে:মি: এবং ওজন ২৬০ থেকে ২৮০ গ্রামের মধ্যে হবে।

২. দল : প্রতি দল ১২ জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হবে। খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে একজন ক্যাপটেন নিয়োজিত থাকবে। তার বুকের বাম পার্শ্বে ৮ × ২ সেন্টিমিটারের একটি প্রতীক চিহ্ন বা ফিতা লাগাতে হবে।

৩. খেলোয়াড়দের সাজ-সরঞ্জাম : জার্সি, শর্টস এবং হিল ছাড়া হালকা নমনীয় জুতা হচ্ছে খেলার পোশাক। সকল খেলোয়াড়ের একই রঙের পোশাক থাকবে। জার্সির বুকে ও পিঠে জার্সি থেকে ভিন্ন রঙের নম্বর হবে।

৪. কোর্টে খেলোয়াড়দের অবস্থান : কোর্টে ৬ জন খেলোয়াড় অবস্থান নেবে। ৩ জন থাকবে অ্যাটাক এরিয়ায়, অপর ৩ জন পিছনের কোর্টে। খেলা শুরুর আগে খেলোয়াড়দের অবস্থান ও রোটেশন সম্পর্কে আম্পায়ারকে তথ্য দিতে হবে যাতে এই রোটেশন গেম বা সেট সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বজায় থাকে। তবে প্রতি সেট শুরুর আগে রোটেশন অর্ডার পরিবর্তন করা যায়।

ঘ. খেলা :

১. খেলার প্রস্তুতি ও টস : কোর্টে খেলোয়াড় প্রবেশের পূর্বে রেফারি দুই অধিনায়কের উপস্থিতিতে টস করবেন এবং টসে জয়ী অধিনায়ক সার্ভিস বা কোর্ট পছন্দ করবে। এরপর খেলোয়াড়েরা ৩ মিনিট ওয়ার্ম আপ অনুশীলন করতে পারবে। বদলি খেলোয়াড় ও কোচ রেফারির বিপরীতে নির্দিষ্ট জায়গায় বসবে।

২. রোটেশন : ৬ জন খেলোয়াড় ঘড়ির কাঁটা যেভাবে ঘোরে সেভাবে রোটেশন করবে। বিপক্ষ দলের সার্ভিস নষ্ট হওয়ার পর যখন অপর দল সার্ভিস করবে তখন এই রোটেশন সম্পন্ন করতে হবে। রোটেশনে ভুল হলে রেফারি প্রয়োজনীয় শাস্তির বিধান করবেন।

৩. টাইম আউট : বল যখন খেলার বাইরে যায় অর্থাৎ ডেড হয় তখন কোচ বা ক্যাপটেনের অনুরোধে রেফারি টাইম আউট দিতে পারেন। প্রতিটি খেলায় একটি দল সর্বাধিক দু'টি টাইম আউট এবং ৬ জন খেলোয়াড় পরিবর্তনের জন্য সাময়িক বিরতি নিতে পারে। টাইম আউটের সময় খেলোয়াড়েরা পার্শ্ব রেখার কাছাকাছি আসতে পারবে কিন্তু কোর্টের বাইরে যেতে পারবে না।

৪. খেলোয়াড় বদল : ৬ জন খেলোয়াড় কোর্টে খেলবে এবং অতিরিক্ত ৬ জন খেলোয়াড় কোচসহ নির্দিষ্ট জায়গায় বসবে। এই অতিরিক্ত খেলোয়াড় কোচ কিংবা ক্যাপটেনের অনুরোধ মোতাবেক কোর্টের খেলোয়াড়দের সাথে বদল করা যাবে।

৫. খেলা পরিচালনা : একজন রেফারি, একজন আম্পায়ার, একজন স্কোরার ও দু'জন লাইন জাজ দ্বারা খেলা পরিচালনা করা হয়। কোর্টে খেলা শুরুর সময় থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। রেফারি নেটের যে কোনো এক প্রান্তে উঁচু জায়গায় অবস্থান করবেন যাতে নেটের কমপক্ষে ৫০ সেন্টিমিটার উপর থেকে কোর্টের সব জায়গায় খেলা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

৬. কোর্ট বদল : যদি চূড়ান্ত সেট না হয় তাহলে প্রতি সেট শেষ হওয়ার পর উভয় দল কোর্ট বদল করবে। চূড়ান্ত সেটে কোনো দল ১৩ পয়েন্ট অর্জন করলে উভয় দল রেফারির সংকেত পেয়ে কোর্ট বদল করবে।

৭. খেলার ফলাফল : যে দল সার্ভিস করবে সেই দল যদি বলটির র‍্যালির সমাপ্তিতে জিততে পারে তবে একটি পয়েন্ট সংগৃহীত হবে। আর যদি ঐ র‍্যালিতে হেরে যায় তবে বিপক্ষ দল সার্ভিস ও পয়েন্ট পাবে। যে দল প্রথম ২৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করবে সে দল ঐ সেটে জয়ী হবে। তবে ঐ দলকে বিপক্ষ দল থেকে কমপক্ষে ২ পয়েন্ট বেশি থাকতে হবে। যদি উভয় দলের পয়েন্ট সমান হয় তাহলে এই ২ পয়েন্টের ব্যবধান না হওয়া পর্যন্ত খেলা চলতে থাকবে। ৫ সেটের প্রতিযোগিতায় যে দল ৩ সেটে জয়ী হবে সে দল প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করবে।

৮. সার্ভিস : পিছনের কোর্টের রোটেশন অনুযায়ী সর্বডানের খেলোয়াড় সার্ভিস করবে। সার্ভিস এরিয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে বল হাত থেকে শূন্যে ছেড়ে দিয়ে আঘাত করে বিপক্ষ কোর্টে প্রেরণ করতে হবে। তবে রেফারি সার্ভিসের জন্য সংকেত দেওয়ার পরই কেবলমাত্র সার্ভিস করা যাবে। সার্ভিসের বল নেটের নিচ দিয়ে গেলে, নেট স্পর্শ করলে, নেটের অ্যান্টেনা ছুঁয়ে গেলে কিংবা বিপক্ষ কোর্টের বাইরে পড়লে সার্ভিসে ত্রুটি হবে এবং বিপক্ষ দল সার্ভিস করবে।

৯. বল খেলা : সার্ভিসের বা তার পরের কোনো বল কোর্টে আনার পর সে দল সর্বাধিক ৩ বার বলটি খেলতে পারবে এবং ৩ বার স্পর্শ করার পর বলটি বিপক্ষ কের্টে প্রেরণ করতে হবে। বল অন্য সময় শরীরে স্পর্শ করলে একবার খেলা হয়েছে বলে ধরা হবে। খেলার সময় বল চেপে ধরে মারা, জোর করে বল উপরে তোলা, ঠেলে দেওয়া বা হাত দিয়ে টেনে আনাকে হোল্ডিং বলে ধরা হবে।

১০. ব্লক : বিপক্ষের স্ম্যাশ করা বা চাপ মারার বল কোর্টের সামনের সারির এক বা একাধিক খেলোয়াড় প্রতিহত করার জন্য লাফিয়ে উঠে হাত দিয়ে ব্লক করতে পারে। ব্লকের পর বল যে কোর্টে যাবে সে পক্ষ ৩ বার বলটি খেলতে পারবে। পিছনের সারির খেলোয়াড় ব্লকে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১১. নেটের বল : কেবলমাত্র সার্ভিস ছাড়া অন্য সময় বল নেটে লাগতে পারে। নেটে লাগা বল ৩ বার খেলা যাবে। তবে সজোরে নেটে লেগে বল কোনো খেলোয়াড়ের শরীর স্পর্শ করলে একবার খেলা হয়েছে বলে ধরা হয়। বিপক্ষ কোর্ট থেকে বল নেটের উপর নিজ কোর্টে না আসা পর্যন্ত নেটের উপর যে বল থাকে তা খেলা যাবে না। তবে স্পর্শ করার বা চাপ মারার পর গতির কারণে হাত নেটের উপর দিয়ে বিপক্ষ কোর্টে যেতে পারে। পিছনের সারির খেলোয়াড় নেটে গিয়ে চাপ মারতে পারবে না।

১২. সেন্টার লাইন পার হওয়া : খেলা চলাকালে কোনো খেলোয়াড় শরীরের কোনো অংশ বা পা সেন্টার লাইন পার হয়ে বিপক্ষ কোর্টে স্পর্শ করতে পারবে না বা কাউকে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না।

ভলিবল খেলার কলাকৌশল

ক. সার্ভিস : এক হাতে বল শূন্যে তুলে অপর হাত খোলা বা মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় জোরে আঘাত করে বিপক্ষের কোর্টে প্রেরণ করাকে সার্ভিস বলে। যদি সার্ভিস করা বল নেট বা অ্যান্টেনা স্পর্শ না করে, নেটের নিচ দিয়ে না যায় কিংবা বিপক্ষ কোর্টের বাইরে না পড়ে তাহলে সার্ভিস সঠিক বলে গণ্য হবে। সার্ভিস সাধারণত দুই প্রকার– ১. আন্ডার হ্যান্ড সার্ভিস, ২. টেনিস সার্ভিস।

১. আন্ডার হ্যান্ড সার্ভিস : বিপক্ষ কোর্টের দিকে মুখ করে সার্ভিস এরিয়াতে এক পা সামনে ও আরেক পা পিছনে রেখে দাঁড়াতে হবে। দুই পায়ের মাঝে কিছুটা ফাঁক থাকবে। দুই হাঁটু সামান্য ভেঙ্গে পিছনের পায়ে দেহের ওজন রেখে দাঁড়াতে হবে। বাম হাতের তালুতে বল রেখে ডান হাতকে সোজা পিছনের দিকে নিতে হবে। বাম হাতের বল শূন্যে তোলার পর ডান হাত পিছন দিক থেকে সামনে এনে সজোরে বলে আঘাত করতে হবে। বিপক্ষ কোর্টের দিকে মুখ না করে কোর্টের পার্শ্ব রেখার দিকে মুখ করে হাতের এক পাশ দিয়ে আঘাত করেও সার্ভিস করা যেতে পারে।

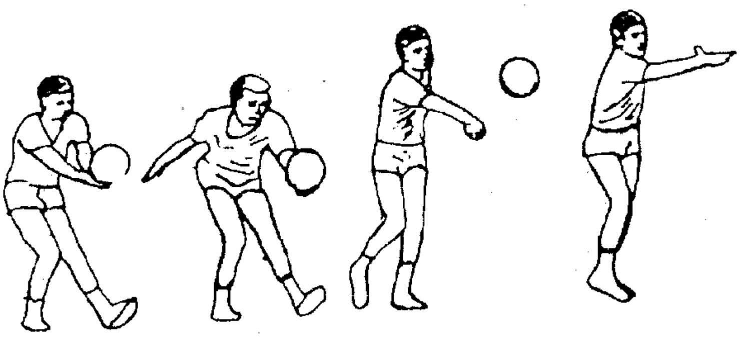

আন্ডার হ্যান্ড সার্ভিস

২. টেনিস সার্ভিস : সার্ভিস এরিয়ায় পা দুটোকে আড়াআড়ি করে দু'পায়ের উপর শরীরের ওজন রেখে দাঁড়াতে হবে। ডান হাতে সার্ভিস করা হলে বাম পা'কে সামনে নিতে হবে। হাঁটু দুটি সামান্য ভেঙ্গে বাম হাতের তালুতে রাখা বল মাথার উপর প্রায় ১ মিটার উঁচুতে ছুড়ে দিতে হবে এবং বলটি নিচে নামার সাথে সাথে ডান হাত পিছন দিক থেকে কাঁধের উপরে এনে সজোরে আঘাত করতে হবে। সার্ভিসের পর পরই ভারসাম্য রক্ষার জন্য শরীরের ওজন পিছনের পা থেকে সামনের পায়ে নিয়ে আসতে হবে।

টেনিস সার্ভিস

খ. রোটেশনে দাঁড়ানো : ৬ জন খেলোয়াড়ের ক্রমিক নম্বর যদি ১ থেকে ৬ নম্বর হয় তাহলে সামনের কোর্টে ৩ জন এবং পিছনের কোর্টে ৩ জন দাঁড়াবে। সামনের কোর্টের ৩ জনের অবস্থান হবে– ডান দিকের ২ নম্বর, মধ্যখানে ৩ নম্বর এবং বাম দিকে ৪ নং এবং পিছনের কোর্টে ৫ নং সর্ব বামে, মধ্যখানে ৬ নং এবং সর্ব ডানে ১ নম্বর খেলোয়াড় দাঁড়াবে। বিপক্ষ দলে সার্ভিস হারালে এই দল সার্ভিস করবে। তখন রোটেশন করতে হবে

৪	৩	২
৫	৬	১

রোটেশন

নিয়মানুযায়ী ১ নং খেলোয়াড় পিছনের কোর্টের ৬ নং খেলোয়াড়ের জায়গায় গিয়ে সার্ভিস করবে। এভাবে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের অবস্থান পরিবর্তিত হবে।

গ. পাসিং : বল পাসকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যায়– (১) দু'হাত মাথার উপর দিয়ে সামনে পাস করা– বিপক্ষ কোর্টের সার্ভিস বা বল স্বীয় কোর্টে এলে দু'হাত একত্র করে মাথার উপরে বলটি গ্রহণ করতে হবে। তারপর হাতের তালু ও আঙ্গুলের চাপে বলটি নির্দিষ্ট স্থানে বা খেলোয়াড়ের নিকট পৌঁছাতে হবে। বলটিকে আঙ্গুলের প্রথম গাঁট ও শেষ প্রান্তের মাঝখানের অংশ দিয়ে স্পর্শ করতে হবে। হাতের কনুই কাঁধ সমান উঁচুতে তুলে কিছুটা সামনে ও বাইরের দিকে নিয়ে কাঁধ বরাবর রাখতে হবে যাতে বলটাকে ঠিক কপালের সামনে খেলা যায়। পা দু'টাকে একটু সামনে-পিছনে রেখে হাঁটু ভেঙ্গে দু'পায়ের উপর সমান ভর রেখে সামনে সামান্য ঝুঁকে দাঁড়াতে হবে। বলের ঠিক পিছনে ও নিচের দিকে আঘাত করে বল উপরের দিকে ঠেলে দিতে হবে। (২) কনুই কাঁধের নিচে এনে পাস দেওয়া– দুই হাতের আঙ্গুল পরস্পর জড়িয়ে দুই বুড়ো আঙ্গুল একসাথে পাশাপাশি রাখতে হবে। কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত দুই হাত পরস্পর লেগে থাকবে। দুই হাঁটু ভেঙ্গে, কোমর নিচু করে বলের পিছনে ও নিচে শরীরকে নিয়ে আসতে হবে। এই পাসকে ডিগিংও (digging) বলা হয়।

বল পাসিং

ঘ. সেট-আপ (Set-up) : কোর্টের সম্মুখ সারির কোনো খেলোয়াড় আন্ডার আর্ম পাস বা ডিগিং থেকে প্রাপ্ত বল দুই হাতের প্রসারিত তালু ও আঙ্গুল সহযোগে নেটের কাছাকাছি উপরে উঠিয়ে দেবে এবং স্ম্যাশকারী দৌড়ে এসে অথবা স্বীয় জায়গায় লাফ দিয়ে উঁচুতে উঠে বল স্ম্যাশ করবে। সেট-আপ যত সুন্দর হবে স্ম্যাশও তত নিখুঁত হবে।

ঙ. স্ম্যাশিং (Smashing) : স্ম্যাশিং-এর বলটিকে অবশ্যই নেটের উপরে থাকতে হবে। বলকে সেখানে স্ম্যাশ করতে হবে সেখান থেকে ৩-৪ পা পিছনে খেলোয়াড়দের অবস্থান থাকবে। সেখান থেকে দৌড়ে এসে লাফিয়ে উঠে শরীরকে বলের পিছনের নিয়ে আসতে হবে। এজন্য দু'হাঁটু ভাঁজ করে লাফ দিতে হবে যাতে উঁচুতে ওঠা যায়। যে হাতে স্ম্যাশ করতে হবে সেটা পিছন দিক থেকে ঘুরিয়ে বলের উপর নিতে হবে। স্ম্যাশ করার পর শরীর সোজা নিচে নেমে আসবে। অনেক সময় বিপক্ষ দলকে ভুল বুঝানোর জন্য বল স্ম্যাশ না করে হাতের সাহায্যে বিভিন্ন দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

স্ম্যাশিং

চ. ব্লকিং (Blocking) : বিপক্ষ দলের স্ম্যাশকে প্রতিরক্ষা করার জন্য কোর্টের সামনের সারির এক বা একাধিক খেলোয়াড় পরস্পরের হাত পাশাপাশি রেখে লাফিয়ে উঠে স্ম্যাশ প্রতিরোধ করতে পারে। ব্লক দেওয়ার সময়ে জোড়া পায়ে উপরে লাফিয়ে উঠাতে হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন ব্লকিং করার সময়ে হাত নেট স্পর্শ না করে।

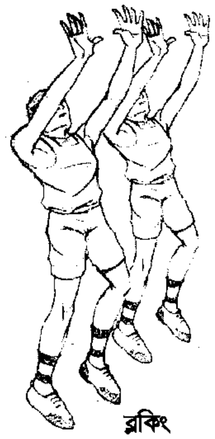
ব্লকিং

কাজ–১ : ভলিবল খেলার রোটেশন পদ্ধতির ছক অংকন করে দেখাও।

কাজ–২ : টেনিস সার্ভিসের কলাকৌশলগুলো প্রদর্শন কর।

কাজ–৩ : ব্লকিং করার পদ্ধতিসমূহ দেখাতে বলবেন।

পাঠ–৫: কাবাডি : কাবাডি এশিয়া মহাদেশের নিজস্ব ঐতিহ্য ও জনপ্রিয় খেলা। বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশের এটি একটি প্রাচীন খেলা। এই উপমহাদেশে অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন নামে খেলাটি অনুষ্ঠিত হতো। যেহেতু আঞ্চলিক খেলা তাই বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ছিল না। গ্রামাঞ্চলে এই হা-ডু-ডু খেলাই ছিল বিনোদনের একমাত্র উৎস। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হা-ডু-ডু খেলার পোশাকি নাম কাবাডি। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের খেলাধুলার গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে বিভিন্ন ফেডারেশন পুনর্গঠন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন গঠিত হয়। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের প্রচেষ্টায় ১৯৮৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাফ গেমসে কাবাডি অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকেই কাবাডি খেলা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখে। ১৯৯০ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে কাবাডি খেলা অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিয়মিত ইভেন্ট হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। আমরা আশা করব এই খেলা অচিরেই কমনওয়েলথ গেমস ও অলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হবে।

কাবাডি মাঠ : মাঠ হবে সমান্তরাল এবং নরম। মাটি অথবা ম্যাট দ্বারা তৈরি হবে। কাবাডি খেলায় তিন ধরনের মাঠ রয়েছে–

১. পুরুষ ও জুনিয়র বালক।

২. মহিলা ও জুনিয়র বালিকা।

৩. সাব-জুনিয়র বালক ও বালিকা।

১. পুরুষ বলতে যাদের ওজন ৮০ কেজি বা তার নিচে তাদেরকে বুঝায়। জুনিয়র বালক বলতে যাদের ওজন ৬৫ কেজি বা তার নিচে এবং বয়স সর্বোচ্চ ২০ বছর এদের মাঠের মাপ দৈর্ঘ্য– ১৩ মি:, প্রস্থ ১০ মিটার।

২. মহিলা বলতে যাদের ওজন ৭০ কেজি বা তার নিচে এবং যাদের বয়স সর্বোচ্চ ২০ বা তার নিচে এবং ওজন সর্বোচ্চ ৬০ কেজি তাদের কাবাডি মাঠের দৈর্ঘ্য হবে ১২ মি: ও প্রস্থ ৮ মি:।

৩. সাব-জুনিয়র বালক-বালিকা উভয়ের বয়স সর্বোচ্চ ১৬ বছর এবং ওজন ৫০ কেজি বা তার নিচে। এদের জন্য মাঠের মাপ হবে– দৈর্ঘ্য ১১ মি: × প্রস্থ ৮ মি:।

খেলার মাঠ : স্ট্রাগলের পূর্বে পুরুষ ও জুনিয়র বালকদের উভয় দিকের লবি বাদে দৈর্ঘ্য ১৩ মি: × প্রস্থ ৮ মি: মহিলা ও জুনিয়র বালিকাদের দৈর্ঘ্য ১২ মি: × প্রস্থ ৬ মি: এবং সাব-জুনিয়র বালক-বালিকাদের দৈর্ঘ্য ১১ মিটার × প্রস্থ ৬ মিটার।

সিটিং ব্লক : মরা খেলোয়াড়দের বসার জন্য যে জায়গা সংরক্ষিত রাখা হয় তাকে সিটিং ব্লক বলে। কাবাডি কোর্টের প্রান্তরেখা থেকে ২ মি: দূরে পুরুষদের জন্য এবং মহিলা ও জুনিয়র বালিকাদের জন্য ১ × ৮ মিটার ও ১ × ৬ মিটার দুইটি ঘর থাকবে। তাকে সিটিং ব্লক বলে।

লবি : খেলার মাঠে উভয় দিকে ১ মি: চওড়া যে জায়গা আছে তাকে লবি বলে। স্ট্রাগল হলে লবি খেলার মধ্যে চলে আসে।

মধ্য রেখা : যে রেখা কোর্টকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেছে তাকে মধ্যরেখা বলে।

কোর্ট : প্রত্যেক অর্ধের খেলার মাঠ যা মধ্যরেখা দ্বারা বিভক্ত তাকে কোর্ট বলে।

বক লাইন : মধ্যরেখার সমান্তরালে কোর্টের দিকে যে দাগ দেওয়া হয় তাকে বক লাইন বলে। যার দূরত্ব পুরুষ ও জুনিয়র বালকদের ৩.৭৫ মিটার, মহিলা এবং জুনিয়র বালিকাদের ৩ মিটার এবং সাব-জুনিয়র বালক-বালিকাদের ৩ মিটার।

বোনাস লাইন : বক লাইনের সমান্তরালে এন্ড লাইনের দিকে ১ মিটার দূরে যে রেখা টানা হয় তাকে বোনাস লাইন বলে।

দম : এক নিঃশ্বাসে এক নাগাড়ে অনবরত সুস্পষ্টভাবে কাবাডি কাবাডি উচ্চারণ করাকে দম বলে।

রেইডার : দম নিয়ে যে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের কোর্টে হানা দেয় তাকে রেইডার বলে। বিপক্ষের কোর্ট স্পর্শ করার পূর্বেই দম ধরতে হয়।

এন্টি রেইডার : যে কোর্টে দম চলছে সেই কোর্টের সমস্ত খেলোয়াড়কে এন্টি রেইডার বলে।

দম হারানো : রেইডার যদি স্পষ্টভাবে এবং অনবরত কাবাডি না বলে বা দম ছেড়েছে বোঝা যায় তাহলে দম হারানো হয়েছে বলে ধরা হবে।

এন্টিকে মারা : রেইডার যদি কোনো নিয়ম ভঙ্গ না করে এন্টির শরীরের যে কোনো অংশ স্পর্শ করে অথবা এন্টি রেইডারের শরীরের যে কোনো অংশ ধরা সত্ত্বেও দমসহ নিজ কোর্টে ফিরে আসে তাহলে এন্টি মারা হয়েছে বলে ধরা হবে।

রেইডারকে ধরা : কোনো নিয়ম ভঙ্গ না করে কোনো এন্টিকে যদি দম থাকা পর্যন্ত বা আম্পায়ারের বাঁশি না দেওয়া পর্যন্ত ধরে রাখে তাহলে রেইডারকে ধরা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

স্পর্শ : রেইডার যদি এন্টির শরীর বা শরীরের পরিধেয় পোশাক স্পর্শ করে তাহলে টাচ বা স্পর্শ হয়েছে বলে ধরা হবে।

স্ট্রাগল : যখন কোনো এন্টি বা এন্টিস রেইডারের সংস্পর্শে আসে তখন তাকে স্ট্রাগল বলে। স্ট্রাগল হলে লবি খেলার মধ্যে চলে আসে।

খেলার নিয়মাবলি

১। টসে যে দলের ক্যাপ্টেন জয়লাভ করবে সে তার পছন্দমতো রেইড/কোর্ট নেবে। পরাজিত দলের ক্যাপ্টেন অবশিষ্ট পছন্দ গ্রহণ করবে। দ্বিতীয়ার্ধে কোর্ট বদল হবে। খেলার শুরুর সময় যে দল দম দিয়েছিল দ্বিতীয়ার্ধে অপর দল দম দিয়ে খেলা শুরু করবে।

২। খেলোয়াড়ের শরীরের যে কোনো অংশ বাউন্ডারির বাইরের ভূমি স্পর্শ করলে সে মরা হবে। স্ট্রাগল হলে বাইরের ভূমি স্পর্শ করলে ঐ খেলোয়াড় মরা হবে না যদি তার শরীরের কোনো অংশ বাউন্ডারির ভিতরের ভূমির সাথে সংস্পর্শ থাকে।

৩। (ক) খেলার সময় যদি কোনো খেলোয়াড় বাউন্ডারির বাইরে যায় তাহলে সে আউট হবে। রেফারি/আম্পায়ার তার নম্বর কল করে তৎক্ষণাৎ ঐ খেলোয়াড়কে কোর্টের বাইরে নিয়ে যাবে। এ সময় বাঁশি বাজানো চলবে না, রেইড চলতে থাকবে।

(খ) রেইড চলাকালে কোনো এন্টি বা এন্টিস বাউন্ডারি সীমার বাইরে গিয়ে বা বাইরের ভূমি স্পর্শ করে রেইডারকে ধরে তাহলে রেইডার আউট হবে না, ঐ এন্টি আউট হবে।

৪। স্ট্রাগল শুরু হলে লবি খেলার মাঠ হিসেবে গণ্য হবে। স্ট্রাগলের সময় বা স্ট্রাগলের পরে যে সমস্ত খেলোয়াড় স্ট্রাগলে জড়িত ছিল তারা লবি ব্যবহার করে নিজ কোর্টে ফিরতে পারবেন।

৫। রেইডার অনুমোদিত শব্দ কাবাডি উচ্চারণ করে দম নেবে। যদি রেইডার ঠিকমতো কাবাডি উচ্চারণ না করে তাহলে রেফারি/আম্পায়ার কলব্যাক করবে এবং বিপক্ষদল একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট পাবে।

৬। রেইডার বিপক্ষের কোর্ট স্পর্শ করার পূর্বেই দম ধরতে হবে। যদি সে দম দেরিতে বা কোর্ট স্পর্শ করে ধরে তাহলে রেফারি/আম্পায়ার তাকে ব্যাক করাবে এবং বিপক্ষ দলকে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট ও দম দেওয়ার সুযোগ দেবে।

৭। দম দেওয়ার সুযোগ (Turn) না থাকা সত্ত্বেও যদি রেইডার দম দেওয়ার জন্য বিপক্ষের কোর্টে প্রবেশ করে তাহলে তাকে রেফারি/আম্পায়ার ব্যাক করাবে ও বিপক্ষ দলকে একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট দেবে।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি

১। **দল :** প্রত্যেক দল কমপক্ষে ১০ জন, সর্বাধিক ১২ জন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হবে। ৭ জন খেলোয়াড় মাঠে একসাথে খেলবে বাকি খেলোয়াড় বদলি হিসেবে থাকবে।

২। **খেলার সময় :** পুরুষ এবং জুনিয়র বালকদের জন্য খেলার সময় হবে প্রত্যেক অর্ধে ২০ মিনিট করে, মাঝে বিরতি ৫ মিনিট। মহিলা বা জুনিয়র বালিকা ও সাব-জুনিয়র বালক ও বালিকা তাদের খেলার সময় হবে প্রতি অর্ধে ১৫ মিনিট করে। মাঝে বিরতি ৫ মিনিট। বিরতির পর কোর্ট বদল হবে। প্রথম অর্ধে যে কয়জন খেলোয়াড় মাঠে ছিল দ্বিতীয়ার্ধে ঐ কয়েকজন খেলোয়াড় নিয়ে মাঠে নামতে হবে।

৩। **পয়েন্ট গণনার পদ্ধতি :** এক পক্ষের প্রত্যেক খেলোয়াড় মরার জন্য এক পয়েন্ট করে পাবে। এক পক্ষের সমস্ত খেলোয়াড় মরা হলে বিপক্ষ দল লোনার জন্য অতিরিক্ত ২ পয়েন্ট পাবে।

৪। **টাইম আউট :** ক) একেক দল প্রত্যেক অর্ধে দুইবার টাইম আউট নিতে পারবে। যার স্থিতিকাল হবে ৩০ সেকেন্ড। দলনেতা, প্রশিক্ষক বা দলের একজন খেলোয়াড়ও টাইম আউট রেফারির অনুমতি সাপেক্ষে নিতে পারবে। টাইম আউটের সময় খেলার সময়ের সাথে যোগ হবে।

খ) টাইম আউটের সময় খেলোয়াড়গণ কোর্টের বাইরে যেতে পারবে না বা কোর্ট ত্যাগ করতে পারবে না। যদি এ নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে বিপক্ষ দল একটি টেকনিক্যাল পয়েন্ট পাবে।

গ) অফিসিয়াল টাইম আউট খেলোয়াড় আহত হলে, মাঠে পুনরায় দাগ দেওয়ার জন্য বা বহিরাগত দ্বারা খেলা ব্যাহত হলে অথবা এই জাতীয় কোনো ঘটনার জন্য কেবল রেফারি/আম্পায়ার টাইম আউট দেবেন। এই টাইম আউটের সময়ও মূল সময়ের সাথে যোগ হবে।

৫। বদলি

ক) অতিরিক্ত ৫ জন খেলোয়াড়ই রেফারির অনুমতি নিয়ে টাইম আউট অথবা বিরতির সময় বদল করা যাবে।

খ) বদলিকৃত খেলোয়াড় পুনরায় মাঠে নামতে পারবে।

কাবাডি খেলার কলাকৌশল

কাবাডি খেলায় দুই ধরনের কৌশল আছে–

(১) রক্ষণাত্মক কৌশল (২) আক্রমণাত্মক কৌশল

১. রক্ষণাত্মক কৌশল : এন্টি রেইডার বা যে কোর্টে দম চলছে ঐ কোর্টের সমস্ত খেলোয়াড় যে কৌশল অবলম্বন করে তাকে রক্ষণাত্মক কৌশল বলে। যেমন–

(ক) গোড়ালি ধরা (খ) হাঁটু ধরা (গ) কোমর ধরা (ঘ) হাতের কব্জি ধরা (ঙ) চেইন দিয়ে ধরা ইত্যাদি।

ক. গোড়ালি ধরা : যখন রেইডার পা দ্বারা বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখন এই কৌশল ব্যবহার করা হয়। বাম দিকের খেলোয়াড় এই কৌশল ব্যবহারের সময় বাম পা সামনে রেখে ডান হাত পায়ের নিচে এবং ডান হাত পাতার উপরে ধরতে হবে। পা সামনে রাখা ও হাতের ধরা একই সাথে হতে হবে। গোড়ালি ধরার সাথে সাথে পা উঁচু করে বুকের দিকে টেনে আনতে হবে।

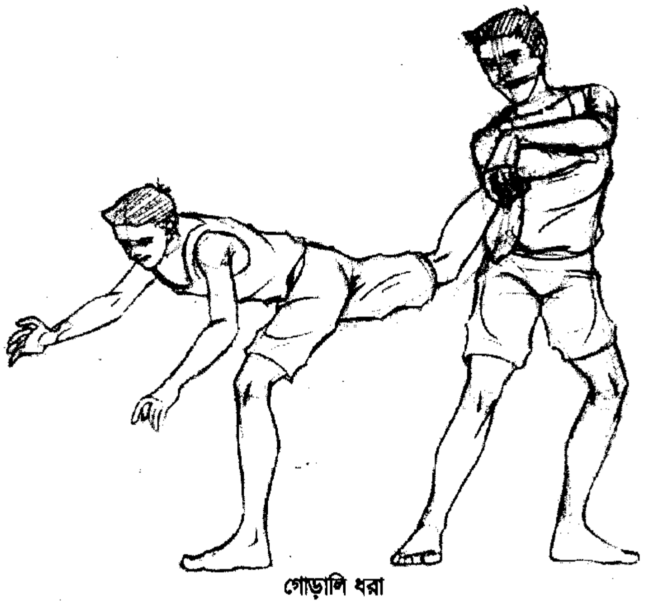

গোড়ালি ধরা

খ. হাঁটু ধরা : যখন রেইডার পা দ্বারা ছোঁয়ার চেষ্টা করে বা পায়ের নড়াচড়ার সময় পা স্থির থাকে বা দুই পা একত্র হয় তখন এই কৌশল ব্যবহার করা হয়। বাম দিকের খেলোয়াড় ধরলে বাম পা, এবং বাম দিকের খেলোয়াড় ধরলে ডান পা সামনে যাবে বাম হাত নিচু দিয়ে ও ডান হাত উপর দিয়ে ধরে কাঁধ দিয়ে চেপে ধরতে হবে।

গ. কোমর ধরা : রেইডার দম দেওয়ার সময় বিপক্ষের দিকে পিঠ দেয় ঐ সময় এই কৌশল প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ পিঠ দেওয়ার সাথে সাথে তড়িৎ গতিতে কোমর ধরে উঁচু করে ফেলতে হবে।

ঘ. হাতের কব্জি ধরা : রেইডার হাত দ্বারা ছোঁয়ার সময় অথবা হাত যদি স্থির অবস্থায় থাকে তখন কব্জি ধরা হয়।

ঙ. চেইন দিয়ে ধরা : চেইন দিয়ে ধরা খুবই কার্যকর। বেশির ভাগ প্রশিক্ষক চেইন দিয়ে ধরার উপর বেশি জোর দিয়ে থাকে। রেইডার দম দেওয়ার সময় তার শরীর যখন বিপক্ষ খেলোয়াড়ের দিকে ঝুঁকে যায় তখনই এই কৌশল প্রয়োগ করতে হয়।

২. আক্রমণাত্মক কৌশল : রেইডার দম দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ছোঁয়ার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করে তাকে আক্রমণাত্মক কৌশল বলে। যেমন– পা দিয়ে ছোঁয়া, হাত দিয়ে ছোঁয়া, ধোঁকা দিয়ে ছোঁয়া।

ক. পা দিয়ে ছোঁয়া : যখন রেইডার দম দিয়ে পা দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে পা দিয়ে ছোঁয়া বলে। পা দিয়ে ছোঁয়া বিভিন্ন কায়দায় করা যায়।

খ. হাত দিয়ে ছোঁয়া : রেইডার দম দিয়ে বিপক্ষ খেলোয়াড়কে যখন হাত দ্বারা ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া বলে। হাত দ্বারা বিভিন্নভাবে ছোঁয়া যায়– উপর থেকে নিচে, নিচ থেকে উপরে, সামনে থেকে পাশে, পাশ থেকে সামনে ইত্যাদি। সাধারণত যে হাত দিয়ে মারার চেষ্টা করা হয় সেই পা আগে যায়। হাত দিয়ে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের নাক, কান, মাথা, কাঁধ, শরীর বা উপরের যে কোনো অংশ স্পর্শ করার চেষ্টা করা হয়।

গ. ধোঁকা দিয়ে ছোঁয়া : যখন রেইডার শরীর দ্বারা ধোঁকা দিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখন তাকে ধোঁকা দিয়ে ছোঁয়া বলে। এই কৌশল খুবই ফলপ্রসূ। বেশির ভাগ রেইডার এই কৌশল প্রয়োগ করে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। ধোঁকা দেওয়ার সময় রেইডার এক দিকে যাওয়ার পূর্ব ভঙ্গিমা দেখায় কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে গতি বা আক্রমণ পরিবর্তন করে অন্য দিকে ধাওয়া করে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। যে রেইডার ধোঁকা দিতে বেশি দক্ষ সে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের মারতেও পারে অনেক বেশি।

খেলার অফিসিয়ালস : কাবাডি খেলা পরিচালনার জন্য মোট ৬ জন অফিসিয়াল প্রয়োজন হয়।

১. একজন রেফারি, ২. দুইজন আম্পায়ার, ৩. একজন স্কোরার, ৪. দুইজন সহকারী স্কোরার

রেফারি : রেফারিই মাঠে সর্বেসর্বা। তিনি খেলা আরম্ভ ও খেলা শেষ করবেন। দুই আম্পায়ের মধ্যে সিদ্ধান্তের মতভেদ হলে খেলার স্বার্থে তিনি সিদ্ধান্ত দেবেন।

আম্পায়ার : খেলার আইন অনুসারে খেলা পরিচালনা করবেন।

স্কোরার : আম্পায়ার কর্তৃক ঘোষিত পয়েন্ট স্কোর শিটে তুলে রাখবেন।

সহকারী স্কোরার : সহকারী স্কোরার মরা খেলোয়াড় ঠিকমতো বসাবেন ও নিয়মমতো মাঠে প্রবেশ করাবেন।

মারাত্মকভাবে নিয়ম লঙ্ঘন ও অপরাধ : নিম্নলিখিত অপরাধগুলো করলে রেফারি বা আম্পায়ার উক্ত খেলোয়াড়কে সতর্ক, বিপক্ষ দলকে পয়েন্ট, সাময়িক বহিষ্কার অথবা অযোগ্য করার ক্ষমতা রাখে।

১. সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অফিসিয়ালকে প্ররোচিত করা।

২. সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করা।

৩. সিদ্ধান্ত আদায়ের জন্য অঙ্গুলি প্রদর্শন করা।

৪. রেইডারের দম আটকানোর জন্য গলা বা মুখ চেপে ধরা।

৫. এমনভাবে খেলা যা বিপক্ষ আহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৬. দম দিতে ৫ সেকেন্ডের বেশি সময় নেওয়া।

৭. পা দ্বারা কাঁচি মারা বা কাঁচির সাহায্যে ধরা।

৮. প্রশিক্ষক বা খেলোয়াড় মাঠের বাইরে থেকে কোচিং দেওয়া।

৯. রেইডারকে দম প্রদানে বাধা দেওয়া।

বোনাস পয়েন্ট : বোনাস লাইন অতিক্রম করলে রেইডার পক্ষ একটি বোনাস পয়েন্ট পাবে। তবে কোর্টে কমপক্ষে ৬ জন খেলোয়াড় থাকতে হবে।

পাঠ–৬: বাস্কেটবল : বাস্কেটবল খেলা প্রথম শুরু হয় আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসে ১৮৮১ সালে। এ খেলার জনক হলেন আমেরিকার স্প্রিংফিল্ড ওয়াই.এম.সি.এ কলেজের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ডা. জেমস নেইস্মিথ। প্রথমে একদলে ১০/১৫ জন করে খেলায় অংশ নিত। ১৮৯৪ সাল থেকে ৫ জন করে একদলে খেলার নিয়ম চালু হয়। বাংলাদেশে প্রথমে খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলগুলোতে যেমন– ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী, সেন্ট জোসেফ ও চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিড এবং অন্যান্য মিশনারি স্কুলগুলোতে বাস্কেটবল খেলা শুরু হয়। এ খেলাতে প্রচুর দমের প্রয়োজন হয়।

বাস্কেটবল খেলার নিয়মাবলি

১. কোর্ট : বাস্কেটবল খেলার কোর্ট হবে আয়তকার, মেঝে হবে শক্ত ও সমতুল্য এবং বাধামুক্তহীন। জাতীয় ও আঞ্চলিক খেলার কোর্টের দৈর্ঘ্য হবে ২৬ মি: এবং প্রস্থ ১৪ মিটার। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য কোর্টের দৈর্ঘ্য হবে ২৮ মিটার ও প্রস্থ হবে ১৫ মিটার।

২. কোর্টের বৃত্ত : কোর্টের মাঝে ৩টি বৃত্ত আছে। প্রত্যেকটির ব্যাসার্ধ ১.৮০ মিটার।

৩. সংরক্ষিত এলাকা : এন্ডলাইনের মধ্যবিন্দু থেকে উভয় দিকে ১.৮০ মিটার করে নিয়ে দুটি চিহ্ন দিতে হবে। এন্ডলাইনের মাঝ থেকে সামনের দিকে ৫.৮০ মি: নিয়ে উভয় দিকে ১.৮০ মি: নিয়ে ৩.৬০ মিটার দাগের দুই মাথা বরাবর দাগ টানতে হবে। এই দাগের ভেতরের জায়গাকে সংরক্ষিত এলাকা বলে।

৪. রিং : কোর্ট থেকে রিং-এর উচ্চতা ৩.০৫ মি: বোর্ড থেকে ১৫ সে:মি: দূরে রিং লাগানো হয়। রিং-এর ব্যাসার্ধ ৪৫ সে:মি:। রিং সাথে নেট লাগানো থাকবে যার দৈর্ঘ্য হবে ৪০ সে:মি:।

৫. বল : বলের আকৃতি হবে গোলাকার। ওজন ৫৬৭ গ্রাম থেকে ৬৫০ গ্রাম পর্যন্ত, পরিধি ৭৪.৯–৭৮ সে:মি:। বলের উপরে ৮টি প্যানেল থাকবে। বলের রং হবে কমলা। উপরিভাগ হবে খসখসে।

৬. খেলার সময় : মোট সময় ৪০ মিনিট। চারভাগে খেলা হয়। প্রতিভাগে ১০ মিনিট করে। ১ম ও ২য় পর্বের এবং ৩য় ও ৪র্থ পর্বের মাঝে বিরতি ২ মিনিট। খেলার মাঝে বিরতি ১৫ মিনিট।

৭. পয়েন্ট : ৬.২৫ মিটার দাগের বাইরে থেকে স্কোর হলে ৩ পয়েন্ট। ৬.২৫ মিটার দাগের ভেতর থেকে স্কোর হলে ২ পয়েন্ট। ফ্রি থ্রো থেকে স্কোর হলে ১ পয়েন্ট।

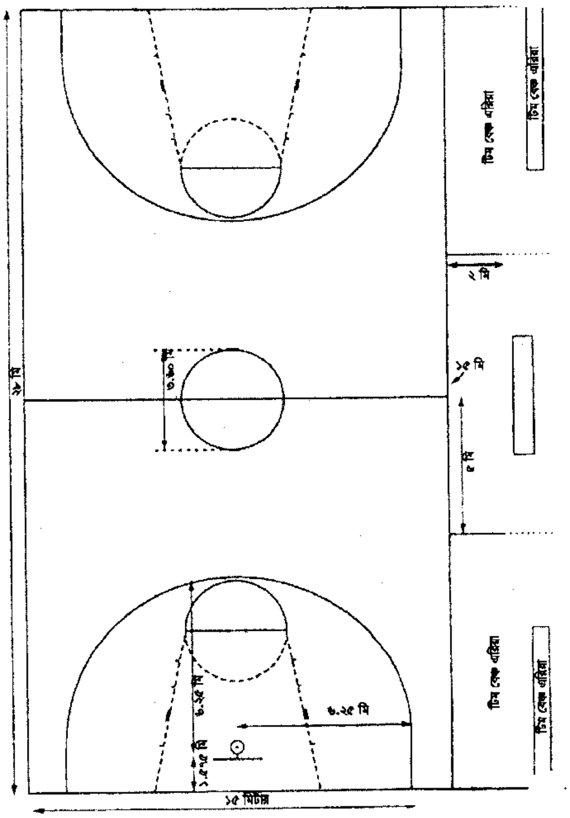

বাস্কেটবল কোর্ট

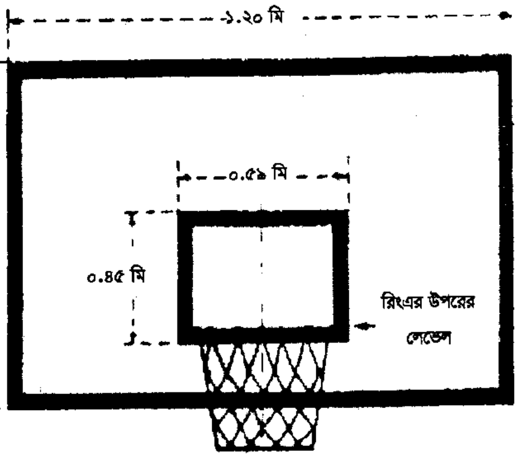

বাস্কেটবলের বাস্কেট

৮. খেলা শুরু : টসের মাধ্যমে কোনো দল কোন বাস্কেটে গোল করবে তা নির্ধারণ করতে হবে। পরে কোর্টের মাঝের বৃত্তের দুই দলের দুই জন খেলোয়াড় দাঁড়িয়ে থাকবে। রেফারি মাঝে দাঁড়িয়ে বল শূন্যে ছুড়ে দিয়ে খেলা শুরু করবেন।

৯. ৩ সেকেন্ড রুল : যে দলের খেলোয়াড় বল নিয়ন্ত্রণ করছে সেই দলের কোনো খেলোয়াড় সংরক্ষিত এলাকায় বল ছাড়া ৩ সেকেন্ডের বেশি সময় থাকতে পারে না। এমনকি দাগও স্পর্শ করতে পারে না।

১০. ৫ সেকেন্ড রুল

ক. রেফারির সংকেতের পর ৫ সেকেন্ডের ভেতর বল থ্রো করতে হবে।

খ. ৫ সেকেন্ডের বেশি সময় কেউ বল ধরে রাখতে পারবে না।

গ. দুই দলের খেলোয়াড় ৫ সেকেন্ডের বেশি সময় বল ধরে টানাটানি করতে পারবে না।

ঘ. বল ধরার পর ৫ সেকেন্ডের ভেতর বল ড্রিবল বা পাস করতে হবে।

১১. ৮ সেকেন্ড রুল : নিজেদের কোর্টে বল ৮ সেকেন্ড পর্যন্ত আয়ত্বে রাখা যায়। ৮ সেকেন্ডের ভেতর বিপক্ষের কোর্টে বল নিয়ে যেতে হবে।

১২. ২৪ সেকেন্ডে রুল : একটি দলের সমস্ত খেলোয়াড় মিলে ২৪ সেকেন্ড পর্যন্ত বল আয়ত্বে রাখতে পারবে।

১৩. ভায়োলেশন : খেলার নিয়ম ভঙ্গ করা যেমন ব্যক্তিগত ফাউলের সময় হাত না তোলা, ৩, ৫, ৮ সেকেন্ডে রুল ভঙ্গ করা ইত্যাদি।

১৪. টেকনিক্যাল ফাউল : অফিসিয়ালদের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার নিয়মভঙ্গ করে অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ করলে।

১৫. ব্যক্তিগত ফাউল : বল খেলার সময় বা ডেড অবস্থায় বিপক্ষ খেলোয়াড়ের সাথে অবৈধ কায়িক সংঘর্ষ হলে তাকে ব্যক্তিগত ফাউল বলে।

১৬. ইচ্ছাকৃত ফাউল : কোনো খেলোয়াড় ইচ্ছাকৃতভাবে বিপক্ষের কোনো খেলোয়াড়কে ফাউল করলে ইচ্ছাকৃত ফাউল হয়।

১৭. ডাবল ফাউল : দুই দলের দুইজন খেলোয়াড় একই সাথে একে অপরের বিরুদ্ধে ফাউল করলে যে অপরাধ হয় তাকে ডাবল ফাউল বলে।

১৮. ফাইভ ফাউল : ৪০ মিনিটের খেলায় কোনো খেলোয়াড় ব্যক্তিগত ও টেকনিক্যাল সর্বমোট ৫টি ফাউল করলে– তাকে অবশ্যই কোর্ট ত্যাগ করতে হবে।

১৯. সেভেন ফাউল : দলীয়ভাবে কোনো দল প্রতি অর্ধে ৭টি ব্যক্তিগত বা টেকনিক্যাল ফাউল করলে এবং ৪ × ১০ মিনিটের খেলায় প্রতি পর্বে ৪টি ব্যক্তিগত ও টেকনিক্যাল ফাউল করলে পরবর্তী ফাউলের জন্য ২টি করে ফ্রি থ্রো দেওয়া হবে। যাকে ফাউল করা হয়েছে তিনিই ফ্রি-থ্রো মারবেন।

কলাকৌশল : ভালো বাস্কেটবল খেলোয়ারের জন্য দরকার দম, ক্ষিপ্রতা, গতি ও লাফ দেওয়ার ক্ষমতা। এর সাথে নিচের মৌলিক কলাকৌশলগুলোর দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

১. দাঁড়াবার ভঙ্গি : সুবিধেমতো দুই পা ফাঁক করে দুই পায়ে সমান ভর করে দাঁড়াতে হবে। হাঁটু সামান্য ভেঙ্গে শরীরের উপরের অংশ বাঁকিয়ে দুই হাত বুকের কাছাকাছি উঁচু করে ধরে রাখ। কনুই দুইটি নিচের দিকে থাকবে।

২. বল ধরা : বল এমনভাবে ধরতে হবে যেন বলটা নিজের আয়ত্বে থাকে। বল ধরার সময় আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে বুড়ো আঙ্গুলগুলোই বলকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। হাতের তালু দিয়ে বল ধরা ঠিক নয়।

৩. বল পাস দেওয়া : বল পাস দেওয়ার সময় মনে রাখতে হবে যে, এ সময় কব্জি ও কনুই শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বল পাস দেওয়ার সময় এক পা সামনে ও অপর পা পিছনে থাকে। বাস্কেটবল পাস দেওয়া হয় সাধারণত–

ক. চেস্ট পাস : বুক বরাবর দ্রুত পাস দেওয়া।

খ. মাথার নিচ দিয়ে পাস : খুব কাছাকাছি ও দ্রুত পাস দেওয়ার জন্য এ পাসের প্রয়োজন হয়।

গ. হুক পাস : বিপক্ষ থেকে দূরে বা তাদের মাথার উপর দিয়ে এ পাস দিতে হয়। সাধারণত একহাত দিয়ে এ পাস করতে হয়।

ঘ. বাউন্স পাস : বল ধরে সতীর্থ খেলোয়াড়ের কাছে কোর্টে ড্রপ দিয়ে পাস দেওয়া।

ঙ. মাথার উপর দিয়ে পাস : খেলোয়াড় কাছে থাকলে মাথার উপর দিয়ে বল পাস দিতে হয়।

৪. ড্রিবলিং : জায়গা পরিবর্তন বা সামনে আগাবার জন্য ড্রিবলিং করতে হয়। একহাত দিয়ে বা পর্যায়ক্রমে ডান বা বাম হাত দিয়ে বা বারবার কোর্টে ড্রপ দেওয়াকে ড্রিবলিং বলে। বলে চাপ দেওয়ার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো খোলা থাকবে এবং আঙ্গুল দিয়ে বলকে চাপ দিতে হবে।

৫. পিভটিং : পায়ের উপর ঘোরাকে পিভটিং বলে। একটি পা একই জায়গায় রেখে অন্য পা টিকে যে কোনো দিকে যতবার ইচ্ছে ঘুরিয়ে নেওয়াকে পিভটিং বলে।

৬. শ্যুটিং : বাস্কেটে বল ছোড়াকে শ্যুটিং বলে। বাস্কেটে সরাসরি শ্যুট করা যায় আবার বোর্ডে লাগিয়েও গোল করা যায়।

ক. সেট শ্যুট : এক জায়গায় বা দাঁড়ানো অবস্থায় যে শ্যুট করা হয় তাকে সেট শ্যুট বলে। এ শ্যুট এক হাত বা দুই হাত দিয়ে করা যায়। এক হাত দিয়ে শ্যুট করার সময় যে হাত দিয়ে শ্যুট করা হয় সে হাত বলের পিছনে থাকে। অন্য হাত বলের পাশে সাপোর্ট হিসেবে থাকে। দুই হাত দিয়ে শ্যুট করার সময় উভয় হাতই বলের পিছনে থাকবে।

৭. লেআপ- শট : কাছ থেকে গোল করার জন্য সাধারাণত এ শট করা হয়। এ শট করার সময় খেলোয়াড় ড্রিবলিং করতে করতে এগিয়ে যায় এবং এক পা দিয়ে জোরে মেঝেতে আঘাত করে শরীর উঁচুতে তুলে নেয় এবং যে হাত দিয়ে বল মারবে সে হাত সম্পূর্ণ সোজা করে দিয়ে বল সরাসরি বাস্কেটে ঢুকায় বা বোর্ডে মেরে বাস্কেটে ঢোকায়।

কাজ–১ : বাস্কেটবল ধরার কায়দাগুলো প্রদর্শন কর।

কাজ–২ : সঙ্গীকে সাথে নিয়ে চেস্ট পাস করে দেখাও।

কাজ–৩ : লে-আপ শটের কৌশলগুলো অনুশীলন করে দেখাও।

পাঠ–৭: হকি : হকি খেলা কখন কীভাবে কোথায় শুরু হয়েছে এই নিয়ে ঐতিহাসিকরা একমত নন। তবে অনেকেই মনে করেন হকি খেলাও পুরাতন খেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। যতদূর জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে পারস্য দেশে হকি খেলার মতো এক প্রকার খেলা প্রচলিত ছিল। পরে পারস্য থেকে গ্রীসে ও গ্রীস থেকে রোমে প্রচলিত হয়। ঐতিহাসিকরা আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীসের এক খেলার সাথে আজকের এ খেলার সাদৃশ্য দেখতে পান। পরে ফ্রান্সের লোকেরা 'হকেট' (Hocket) নামে খেলা শুরু করেন। হকেট একটি ফরাসি শব্দ যার অর্থ মেষ পালকের লাঠি। এরও অনেক পরে ইংল্যান্ডের লোকেরা ফ্রান্সের কাছ থেকে এ খেলা শিখে 'হকে' (Hoque) নাম দিয়ে খেলতে শুরু করে। ইংরেজি উচ্চারণ অনুযায়ী পরবর্তীতে এ খেলা হকি নামে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

হকি খেলার পরিভাষা

১. দল : ১৬ জন খেলোয়াড় নিয়ে একটি দল গঠিত হয়। ১১ জন খেলে, ৫ জন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসেবে থাকে।

২. আক্রমণকারী : খেলার সময় যে দলের খেলোয়াড়রা গোল করার জন্য চেষ্টারত থাকে তাদেরকে আক্রমণকারী বলে।

৩. রক্ষণদল : খেলার সময় যে দল গোলরক্ষা করার জন্য চেষ্টারত থাকে সে দলকে রক্ষণদল বলে।

৪. সেন্টার পাস : মাঠের কেন্দ্রে বল বসিয়ে যে কোনো দিকে বল পুশ বা হিট করাকে সেন্টার পাস বলে। অর্থাৎ এই পাসের মাধ্যমে খেলা শুরু হয়।

৫. বল খেলা : স্টিক দ্বারা বলকে থামিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া, দিক পরিবর্তন বা বলের গতি আনয়ন করাকে বুঝায়।

৬. প্লেইং ডিস্ট্যান্স : যে দূরত্বে থেকে একজন খেলোয়াড় বলের নিকট পৌঁছে খেলার চেষ্টা করতে পারবে।

৭. ট্যাকেল : বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের নিয়ন্ত্রণ থেকে বল ছিনিয়ে নেওয়ার কৌশলকে ট্যাকল বলে।

৮. গোলে বল মারা : সার্কেলের ভিতর থেকে আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড় বলকে গোলপোস্টের ভিতরে মারার চেষ্টা করা বুঝায়।

৯. অপরাধ : এমন কাজ করা যার ফলে আইন ভঙ্গের জন্য আম্পায়ার শাস্তি প্রদান করেন।

১০. স্ট্রোক : স্টিকের সাহায্যে বলকে খেলা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, আঘাত করা বা সরিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিকে স্ট্রোক বলে।

১১. পেনাল্টি স্ট্রোক : পেনাল্টি স্পট থেকে পুশ, ফ্লিক বা স্কুপ করে গোল করার চেষ্টাকে পেনাল্টি স্ট্রোক বলে।

১২. ডেঞ্জারাস প্লে : ডেনজারাস প্লে হচ্ছে এমন এক কৌশল যা খেলোয়াড়দের জন্য বিপজ্জনক।

১৩. মিস কন্ডাক্ট : সময় নষ্ট করা, ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করা, খেলার মধ্যে খারাপ আচরণ করা, অধিনায়কের কথা না শোনা ইত্যাদি মিস কন্ডাক্টের আওতায় পড়ে।

খেলার মাঠ : হকি খেলার মাঠ হবে আয়তকার যার দৈর্ঘ্য ১০০ গজ (৯১.৪০ মি:) এবং প্রস্থ ৬০ গজ (৫৫ মি:)। দৈর্ঘ্যের রেখাকে পার্শ্বরেখা, প্রস্থের রেখাকে পিছনের রেখা এবং গোলের মধ্যের রেখাকে গোলরেখা বলে। দাগগুলো হবে চওড়া, ৭৫ মিলিমিটার।

শ্যুটিং সার্কেল : খুঁটি থেকে উভয়দিকে ১৪.৬৩ মি: বা ১৬ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে খুঁটি বরাবর দাগ টানতে হবে। পরে মাঝের ৪ মি: সোজা রেখা দ্বারা সংযুক্ত করতে হবে। একেই শ্যুটিং সার্কেল বলে। এই সার্কেলের ৫ মি: বাইরে দিয়ে আরেকটি অনুরূপ দাগ দিতে হবে। তবে দাগগুলো ডট ডট হবে। এ দাগ খেলোয়াড় দাঁড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

মধ্যরেখা ও ২৩ মিটার রেখা : মাঠের দৈর্ঘ্যের ঠিক মাঝখানে প্রস্থ বরাবর একটি রেখা টানতে হবে তাকে মধ্যরেখা বলে। এই মধ্যরেখা ও পিছনের রেখার মাঝখানে আরেকটি রেখা টানতে হবে যাকে ২৩ মিটার রেখা বলে।

গোলপোস্ট : দুই পোস্টের ভিতরের দূরত্ব হবে ৩.৬৬ মিটার, মাটি থেকে ক্রসবারের নিচ পর্যন্ত উচ্চতা হবে ২.১৪ মিটার। গোলপোস্টের ও ক্রসবারের রং হবে সাদা।

বল : বল যে কোনো শক্ত পদার্থের হবে। বলের ওজন কমপক্ষে ১৫৬ থেকে ১৬৩ গ্রাম হবে। পরিধি ২২৪ মি:মি: হতে ২৩৫ মি:মি: বলের রং হবে সাদা। তবে দুই দলের সম্মতিতে অন্য রঙের বল দিয়েও খেলা যায়।

হকি স্টিক : স্টিক সোজা ও মাথার অংশ বাঁকা থাকবে। স্টিকের বাম পার্শ্ব চ্যাপ্টা ও ডান পার্শ্ব মসৃণ ও গোলাকৃতি হবে। স্টিকের বাঁকা অংশ ১০০ মি: মি:-এর বেশি হবে না। ৫১ মি: মি: ব্যাসের একটি রিং স্টিকের ভিতর দিয়ে চলে এলে স্টিকটি বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

গোলকিপার : গোলকিপার অন্য খেলোয়াড়দের থেকে ভিন্ন রঙের পোশাক পরবে এবং শরীরের উপরের অংশ রক্ষার জন্য প্রটেক্টর ব্যবহার করবে। লেগ গার্ড, কিকার ও হ্যান্ড প্রটেক্টরও ব্যবহার করতে পারবে।

খেলার সময় : প্রতি অর্ধে খেলার সময় ৩৫ মিনিট মাঝে বিরতি ৫ থেকে ১০ মিনিট অর্থাৎ ৩৫ + ৩৫ = ৭০ মিনিট বিরতিসহ ৭৫ মিনিট।

পেনাল্টি কর্নার : রক্ষণদলের কোনো খেলোয়াড় ইচ্ছাকৃতভাবে সার্কেলের ভেতর অপরাধ করলে বা নিশ্চিত গোল বাঁচানোর জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে সার্কেলের ভেতর অপরাধ করলে বা গোলকিপার বারবার নিয়মভঙ্গ করলে বিপক্ষ দলকে পেনাল্টি স্ট্রোক দেওয়া হয়। গোললাইন থেকে মাঠের দিকে ৬.৪০ মি: স্থান থেকে পেনাল্টি স্ট্রোক মারতে হয়।

কলাকৌশল

স্টিক ধরা : বাম হাত দিয়ে স্টিকের মাথা ধরতে হবে, ডান হাত স্টিকের মাঝামাঝিতে হালকাভাবে ধরতে হবে। ডান পা সামনে ও বাম পা পিছনে থাকবে। স্টিক ডানে বামে যে দিকে ঘুরানো হোক না কেন বাম হাতের কব্জি শুধু ঘুরাতে হবে। ডান হাত শুধু সাপোর্ট হিসেবে থাকবে।

বল থামানো : বলের লাইন বরাবর স্টিকের মাথা নিতে হবে। স্টিকের চ্যাপ্টা অংশ দিয়ে বল থামাতে হবে। এক পা সামনে ও আরেক পা পিছনে থাকবে।

বল ড্রিবলিং : বল সামনে থাকবে। স্টিক ডানে বামে ঘুরিয়ে বলকে সামনের দিকে নিতে হবে। মাঝে মাঝে একটু দূরে ঠেলা দিয়েও ড্রিবলিং করা যায়। স্টিকের চ্যাপ্টা অংশ দিয়েই বল সামনে নিতে হবে। হাতের ভেতর স্টিক শুধু ঘুরবে।

হিট : দুই পা সমান্তরাল রেখে দাঁড়াতে হবে। বল ১১/২ থেকে ২ ফুট সামনে থাকবে। স্টিক কাঁধ বরাবর তুলে বলের মাঝখানে জোরে আঘাত করতে হবে। এই জোরে আঘাত করাকেই হিট বলে।

পুশ : বলের সাথে স্টিক লাগিয়ে কোনো শব্দ না করে প্রয়োজনীয় গতি প্রয়োগের মাধ্যমে বলটি মাঠ থেকে গড়িয়ে দেওয়াকে পুশ বলে।

ফ্লিক : যখন একটি স্থির বা গড়ানো বল পুশ করা হয় এবং বলটি হাঁটু পর্যন্ত উপরে ওঠে তখন তাকে ফ্লিক বলে।

স্কুপ : একটি স্থির গতিহীন বলের খানিকটা নিচে স্টিক রেখে উপরের দিকে চালনার সাহায্যে বল শূন্য অর্থাৎ মাথার উপরে উঠানোকে স্কুপ বলে।

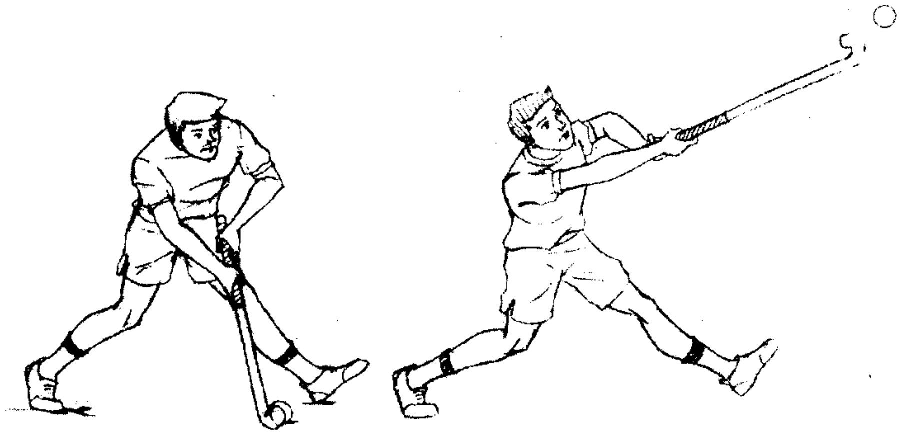

স্কুপ

কাজ–১ : হকি খেলায় পেনাল্টি স্ট্রোক মারার কৌশলগুলো মাঠে দেখাও।
কাজ–২ : স্কুপ-এর কৌশলগুলো উপস্থাপন কর এবং সতীর্থের কাছে স্কুপ করে দেখাও।
কাজ–৩ : হকি স্টিক ধরার নিয়মগুলো বল।

পাঠ–৮: হ্যান্ডবল : হ্যান্ডবল খেলার উৎপত্তি হয়েছে জার্মানিতে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জার্মান গীতি কবিতায় ক্যাচবল (Catch ball) জাতীয় খেলার উল্লেখ আছে। ১৯০৪ সালে ডেনমার্কের জনৈক শিক্ষক হোলজার নিয়েলসন Hand Bold নামে একটি খেলার প্রবর্তন করেন। ১৯১৭ সালে মহিলাদের ক্রীড়া শিক্ষক বার্লিনের ম্যাক্স হিসার মেয়েদের জন্য হ্যান্ডবল খেলার প্রচলন করেন। ১৯১৯ সালে বার্লিনের অপর একজন ক্রীড়া শিক্ষক কার্ল শিলেঞ্জ এই খেলায় তার নিজস্ব পদ্ধতি সংযোজন করে এর উৎকর্ষ সাধন করেন ও আস্তে

আস্তে এর প্রসার ঘটাতে থাকেন। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশন গঠিত এবং ১৯৮৫ সালে তা ফেডারেশনে উন্নীত হয়।

১. হ্যান্ডবল খেলার মাঠ : মাঠের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার, প্রস্থ ২০ মিটার। দাগগুলো ৫ সে:মি: চওড়া, গোলপোস্টের ভিতরের লাইন ৮ সে:মি: চওড়া। দৈর্ঘ্যের দাগকে পার্শ্বরেখা ও প্রস্থের দাগকে গোল লাইন বলে।

২. গোলপোস্ট : মাটির উপর থেকে ক্রসবারের নিচ পর্যন্ত উচ্চতা ২ মিটার, দৈর্ঘ্য ৩ মিটার।

৩. গোলসীমা : উভয় গোলপোস্ট হতে ৬ মিটার ব্যাসার্ধ দিয়ে দুই গোলপোস্ট বরাবর রেখা টানতে হবে। গোলপোস্টের সমান্তরাল তিন মিটার সোজা রেখা হবে। ডট ডট গুলো ১৫ সে:মি: লম্বা হবে।

৪. ফ্রি-থ্রো লাইন এরিয়া : উভয় গোলপোস্ট হতে ৯ মিটার ব্যাসার্ধ নিয়ে দুই গোলপোস্ট বরাবর ডট, ডট রেখা এঁকে এরপর গোলপোস্টের সমান্তরাল ৩ মিটার সোজা ডট হবে।

৫. পেনাল্টি লাইন : গোলপোস্টের মাঝ থেকে ৭ মিটার দূরে লাইনের সমান্তরালে ১৫ সে:মি: দৈর্ঘ্য রেখাকে বুঝায়।

৬. চার মিটার লাইন : গোলপোস্টের মধ্যবিন্দু থেকে ৪ মিটার দূরে গোল লাইনের সমান্তরালে ১৫ সে:মি: দৈর্ঘ্য রেখাকে বুঝায়।

৭. খেলার স্থিতিকাল

১৬ বছর বা তার উর্ধ্বের ছেলেমেয়েদের জন্য ৩০ + ১০ + ৩০ = ৭০ মিনিট।

১২–১৬ বছর ছেলেমেয়েদের জন্য ২৫ + ১০ + ২৫ = ৬০ মিনিট।

৮–১২ বছর ছেলেমেয়েদের জন্য ২০ + ১০ + ২০ = ৫০ মিনিট।

৮. অফিসিয়াল : অফিসিয়াল ৪ জন। ২ জন রেফারি, ১ জন সময় রক্ষক ও একজন স্কোরার।

৯. বল : বল হবে গোলাকার, চামড়া বা কৃত্রিম চামড়া জাতীয় পদার্থের তৈরি। বাইরের আবরণ পিচ্ছিল হবে না। বলের ওজন ও পরিধি হবে–

ছেলেদের জন্য পরিধি– ৫৮–৬০ সে:মি: – ১৬ বছরের উর্ধ্বে

মেয়েদের জন্য পরিধি– ৫৪–৫৬ সে:মি: – মহিলা ও ১২–১৬ বছর যুবক

ছেলেদের জন্য ওজন– ৪২৫– ৪৭৫ গ্রাম – ১৬ বছরের উর্ধ্বে

মেয়েদের জন্য ওজন– ৩২৫–৪০০ গ্রাম – মহিলা ও ১২–১৬ বছরের যুবক

১০. দল গঠন : ১২ জন খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠিত হয়। ৭ জন মাঠ খেলোয়াড় ও ১ জন গোলরক্ষক হিসেবে খেলবে।

১১. গোলরক্ষকের জন্য কী কী নিষিদ্ধ

ক. বিপজ্জনকভাবে না খেলা।

খ. বলসহ গোলসীমার বাইরে আসতে পারবে না।

গ. গোলসীমার বাইরে বল ধরে গোলসীমার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

ঘ. পেনাল্টি থ্রো মারার সময় থ্রোয়ার হাত থেকে বল ছাড়ার পূর্বে ৪ মিটার লাইন বা তার বর্ধিত অংশ অতিক্রম করতে পারবে না।

ঙ. বল আয়ত্তে থাকার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে নিজস্ব গোল লাইন বা গোল পোস্টের উপর দিয়ে বাইরে খেলাতে পারবে না।

১২. একজন খেলোয়াড় কী করতে পারে না?

ক. ৩ সেকেন্ডের বেশি বল ধরে রাখতে পারে না।

খ. বল ধরে ৩ পদক্ষেপের বেশি নিতে পারে না।

গ. বল ধরার সময় ধাক্কা বা আঘাত করতে পারবে না।

ঘ. বল হাঁটুর নিচে লাগলে তা বৈধ।

১৩. থ্রো–অফ : খেলা শুরু ও গোল হওয়ার পর থ্রো–অফের মাধ্যমে খেলা শুরু হয়।

১৪. কী কী কারণে ফ্রি-থ্রো দেওয়া হয়?

ক. ত্রুটিপূর্ণ খেলোয়ার বদলী করলে।

খ. অবৈধভাবে খেলোয়ার মাঠে প্রবেশ করলে।

গ. গোলরক্ষক নিয়মভঙ্গ করলে।

ঘ. মাঠে খেলোয়ার গোলসীমা আইন ভঙ্গ করলে।

ঙ. ইচ্ছাকৃতভাবে পার্শ্ব বা আউটার গোল লাইন অতিক্রম করে বল খেললে।

চ. প্রতিপক্ষের প্রতি অবৈধ আচরণ করলে।

ছ. ত্রুটিপূর্ণ থ্রো-অফ ও থ্রো-ইন করলে।

জ. মারামারি করলে।

১৫. পেনাল্টি থ্রো দেওয়ার কারণ

ক. মাঠের যে কোনো স্থানে একজন খেলোয়াড় অবৈধভাবে আক্রমণকারীর একটি উজ্জ্বল গোলের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিলে।

খ. গোলরক্ষক মাঠ থেকে বল নিয়ে গোলসীমায় প্রবেশ করলে।

গ. কোনো খেলোয়াড় ইচ্ছাকৃতভাবে যদি নিজ গোলসীমায় গোলরক্ষকের নিকট বলটি ব্যাকে পাস করে এবং গোলরক্ষক বলটি স্পর্শ করলে।

ঘ. একটি নিশ্চিত গোল করার সময় যদি কোনো অবৈধ বাঁশির আওয়াজে গোল নষ্ট হয়।

কলাকৌশল : হ্যান্ডবলের কলাকৌশলগুলো সাধারণত ১. বল ধরা, ২. বল পাস দেওয়া, ৩. গোলে বল মারা, ৪. বাধা দেওয়া।

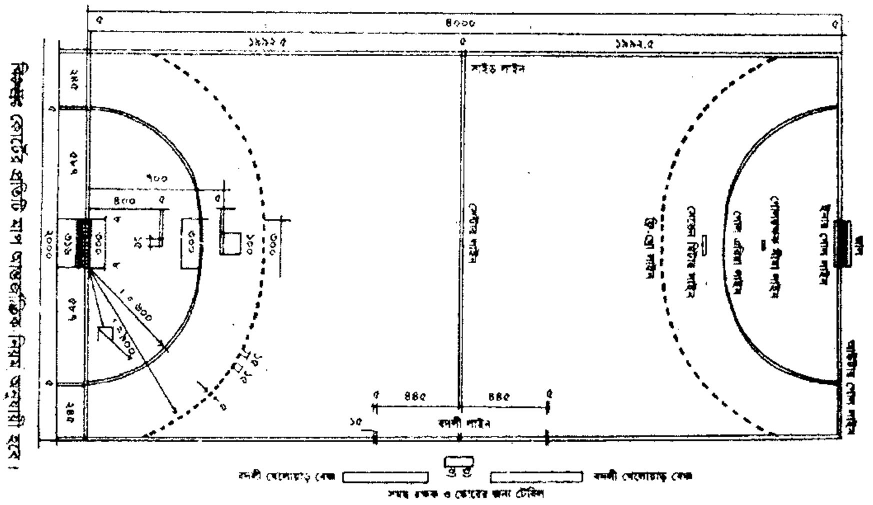

হ্যান্ডবল মাঠ

১. বল ধরা : বল ধরার সময় হাতের আঙ্গুলগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে বলের দিকে দৃষ্টি দেবে এবং হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল ধরে কনুই ভেঙ্গে বলটাকে নিজের দেহের কাছাকাছি টেনে নেবে। বলের গতি ও অবস্থান বিশেষ কাঁধ বরাবর, কোমরের নিচে, মাথার উপর থেকে লাফিয়ে বা দাঁড়ানো অবস্থায় বল ধরা যায়। গড়ানো বল পাশে বা সামনে ধরা যায়।

২. বল পাস দেওয়া : নিজের দলের কাছে বল পাস দেওয়াটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। যেহেতু হ্যান্ডবলের ওজন অনেকটা হালকা ও ছোট সেহেতু বলকে এক হাতে ছুড়ে পাস দেওয়াটাই অনেক সুবিধাজনক। তবে অবস্থা অনুসারে দুই হাতেও পাস দেওয়া যায়। একহাতে ছুড়ে পাস দেওয়ার সময় বলটাকে সাধারণত ডানহাতে ঠিকভাবে ধরে কাঁধের লাইনের পিছনে হাতটা নিয়ে বাম পায়ের উপর ভর রেখে ছুড়তে হয়। বল পাস বিভিন্নভাবে হতে পারে।

ক. কাঁধ বরাবর পাস, খ. কব্জি ঘুরিয়ে পাস, গ. হাত কোমরের নিচে এনে পাস, ঘ. মাথার উপর দিয়ে পাস ইত্যাদি।

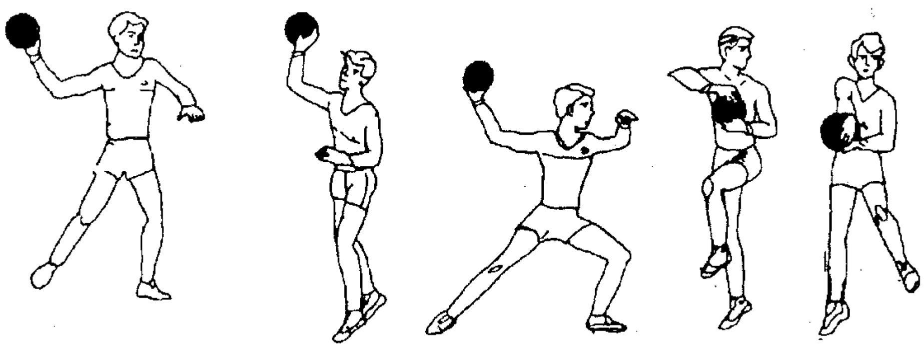

বল পাস

৩. গোলে বল ছোড়া : হ্যান্ডবলে গোল করতে হলে বল ছুড়ে মারাটাকে ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে। বল ছুড়ে গোল করাটা কঠিন ব্যাপার। কারণ একটা নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে থেকে গোল করতে হয় এবং গোলের আকারটাও বেশ ছোট। বলকে বিভিন্ন কায়দায় ছুড়ে গোল করা যায়। যেমন– সরাসরি ছুড়ে মারা, পাস দিয়ে ছুড়েমারা , লাফিয়ে ছুড়ে মারা, বাউন্স করে মারা ইত্যাদি।

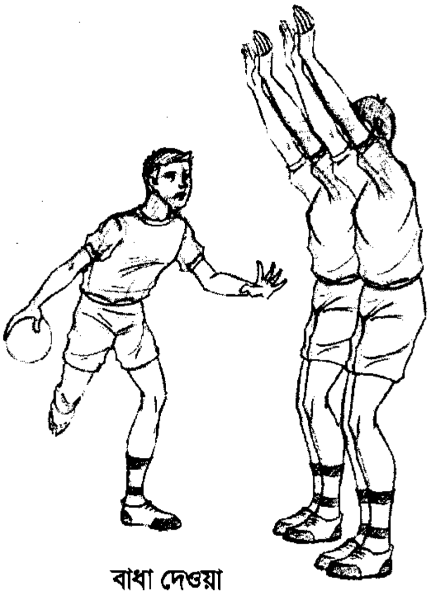

বাধা দেওয়া

৪. বাধা দেওয়া : যখন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় বলটাকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তখন তাকে এমনভাবে বাধা দিতে হবে যাতে সে বলটাকে নিজ দলের অপর খেলোয়াড়কে বা গোলে ছুড়ে দিতে না পারে। এজন্য একাকী বা দুই তিনজন মিলে হাত তুলে প্রাচীর তৈরি করে বা শরীরের অংশ দিয়ে বাধা দিতে হবে।

কাজ–১ : ফি থ্রো দেওয়ার কারণগুলো পোস্টার পেপারে লিখে উপস্থাপন কর।
কাজ–২ : বল ধরার কৌশলগুলো প্রদর্শন কর।
কাজ–৩ : গোলে বল ছোড়ার সময় শরীরের পজিশনগুলো ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।

১.১ ফুটবলের ফ্রি কিক কয় ধরনের?

ক. এক খ. দুই

গ. তিন ঘ. চার

১.২ স্পিন বোলিং-এর সময় উইকেট কিপারের অবস্থান কেমন হবে?

ক. উইকেটের নিকটে
খ. দূরে
গ. উইকেটের ডানে
ঘ. উইকেটের বামে

১.৩ লোনা হলে কত পয়েন্ট হয়?

ক. এক পয়েন্ট
খ. দুই পয়েন্ট
গ. ৩ পয়েন্ট
ঘ. ৪ পয়েন্ট

১.৪ হ্যান্ডবল খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?

ক. ৩০ × ৪০ মিটার
খ. ৪০×২০ মিটার
গ. ৩৫×১৫ মিটার
ঘ. ৩০×২০ মিটার

১.৫ শ্যুটিং সার্কেলের ব্যাসার্ধ কত গজ?

ক. ১০ গজ
খ. ১৬ গজ
গ. ১২ গজ
ঘ. ১৮ গজ

২. **উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।**

ক. কর্নার পতাকার উচ্চতা কম পক্ষে ... ফুট।
খ. ব্যাটে আঘাতের পর শূন্য দিয়ে বল মাঠের বাইরে গেলে তাকে .... বলে।
গ. একজন বোলার এক ওভার কোনো রান না দিলে তাকে ..... ওভার বলে।
ঘ. ব্যাডমিন্টন কোর্টের দৈর্ঘ্য... ফুট।
ঙ. ভলিবল উপর দিকে ছুড়ে সার্ভিস করাকে... বলে।
চ. কাবাডি খেলায় যে দম দেয় তাকে ... বলে।
ছ. বাস্কেটবলের রিং-এর উচ্চতা... মিটার
জ. হকি মাঠের দৈর্ঘ্য... গজ।

৩. **বাম পাশের শব্দের সাথে ডানপাশের শব্দ মিল কর।**

ক. কিক অফ	ক. কাবাডি
খ. রেইডার	খ. ফুটবল
গ. টাইমড আউট	গ. হকি
ঘ. লেট	ঘ. ক্রিকেট
ঙ. শ্যুটিং সার্কেল	ঙ. বাস্কেটবল
চ. লে আপ শট	চ. ভলিবল
ছ. রোটেশন	ছ. ব্যাডমিন্টন
জ. থ্রো অফ	জ. হ্যান্ডবল

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও।

ক. স্টাম্প আউট কী?

খ. ওভার থ্রো কাকে বলে?

গ. বোনাস পয়েন্ট কখন দেওয়া হয় না?

ঘ. ব্যাডমিন্টন কোর্টের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত?

ঙ. ভলিবলের অ্যান্টিনা কাকে বলে?

চ. হকি খেলায় স্কুপ কাকে বলে?

ছ. ফুটবলের অফসাইড কী?

জ. হ্যান্ডবলে একজন খেলোয়াড় কী করতে পারে না?

ঝ. বাস্কেটবল বোর্ডের মাপ কত?

৫. রচনামূলক প্রশ্ন :

ক. প্রত্যক্ষ ফ্রিকিক দেওয়ার কারণগুলো বর্ণনা কর।

খ. ক্রিকেট খেলায় ব্যাটসম্যানের আউটগুলো বর্ণনা কর।

গ. ভায়োলেশন কাকে বলে? কী কী কারণে ভায়োলেশন হয়?

ঘ. ভলিবলের সার্ভিস ফল্টগুলো লিখ।

ঙ. ব্যাডিমিন্টনে ডিউস হলে কীভাবে গেম শেষ করতে হয় লিখ।

চ. কাবাডি খেলায় পয়েন্ট পাওয়ার নিয়মগুলো বর্ণনা কর।

ছ. হকি খেলায় পেনাল্টি কর্নার মারার নিয়ম আলোচনা কর।

জ. হ্যান্ডবলের গোলরক্ষকের জন্য কী কী নিষিদ্ধ বর্ণনা কর।

৬. মাঠে প্রদর্শন কর।

ক. স্পিনবল ধরার কৌশল।

খ. বাস্কেটবলের চেস্ট পাস দেওয়ার কৌশল।

গ. হেডিং-এর কৌশল।

ঘ. হকির ফ্রি হিট মারার কৌশল।

ঙ. ভলিবলের আন্ডার হ্যান্ড সার্ভিস-এর কৌশল।

চ. কাবাডির পা ধরার কৌশল।

ছ. হ্যান্ডবলের পাসিং-এর কৌশল।

জ. ব্যাডমিন্টনের স্ম্যাশ করার কৌশল।

নবম অধ্যায়

অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার

ব্যক্তিগত ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যম হচ্ছে অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার। অ্যাথলেটিক্সের মধ্যে রয়েছে দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপ জাতীয় ইভেন্টসমূহ। আদিম যুগে মানুষ বাঁচার তাগিদে দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপের আশ্রয় গ্রহণ করত। মানব সভ্যতার ক্রমবিবর্তনে এই দৌড়, লাফ, নিক্ষেপই চিত্তবিনোদন ও ব্যক্তিগত ক্রীড়া শৈলী প্রদর্শনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আগের যুগে সাঁতারের কলাকৌশল ও আইন-কানুনের তেমন প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীকালে সুস্বাস্থ্য গঠন, চিত্ত-বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হলো সাঁতার। অ্যাথলেটিক্স ও সাঁতার শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্য গঠন, ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের পারদর্শিতা অর্জন, শৃঙ্খলা ও আনুগত্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।

অ্যাথলেটিক্স

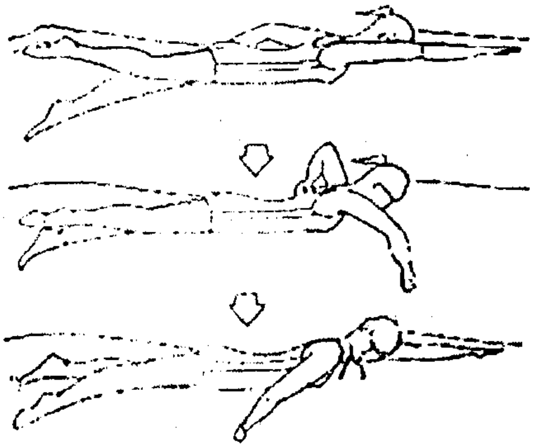

সাঁতার

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- অ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক ও ফিল্ড ইভেন্টের কলাকৌশলসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন ইভেন্টের অ্যাথলেটদের যোগ্যতা ও গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন ইভেন্টের সাঁতারুদের যোগ্যতা ও গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- সাঁতারের বিভিন্ন ইভেন্টের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সাঁতারের বিভিন্ন ইভেন্টের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিয়ম মেনে অ্যাথলেটিক্সের বিভিন্ন ইভেন্ট অনুশীলন করতে পারব।
- নিয়ম মেনে সাঁতার অনুশীলন করতে পারব।

পাঠ–১ : অ্যাথলেটিক্সের ইভেন্টসমূহের (ট্র্যাক এন্ড ফিল্ড) নিয়মাবলি : পৃথিবীতে যত প্রকার খেলাধুলা চালু আছে তার মধ্যে দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপই সবচেয়ে প্রাচীন। একটি মানবশিশু জন্মের পর তার বেড়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। আদিম যুগে মানুষকে খেয়ে বাঁচার জন্য শিকার ও প্রাণরক্ষা করতে গিয়ে দৌড় ও লাফ দিতে হতো। আবার শিকার বা শত্রুকে ঘায়েল করতে নিক্ষেপের সাহায্যে নিতে হতো। এই দৌড়, লাফ ও নিক্ষেপ তাদের জীবনযাপনের কাজে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে মানব সভ্যতার ক্রম বিবর্তনে এই দৌড় লাফ ও নিক্ষেপই ব্যক্তিগত পারদর্শিতা ও চিত্তবিনোদনের ক্রীড়াতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অ্যাথলেটিক্সের ইভেন্টসমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

অ্যাথলেটিক্স

ট্র্যাক ইভেন্টস — ফিল্ড ইভেন্টস

ট্র্যাক ইভেন্টস

দৌড়-সমূহ
১. ১০০ মি: স্প্রিন্ট
২. ২০০ মি: স্প্রিন্ট
৩. ৪০০ মি: স্প্রিন্ট
৪. ৮০০ মি: দৌড়
৫. ১৫০০ মি: দৌড়
৬. ৫০০০ মি: দৌড়
৭. ১০,০০০ মি: দৌড়
৮. ৪ × ১০০ মি: রিলে
৯. ৪ × ৪০০ মি: রিলে
১০. ১০০ মি: হার্ডেল
১১. ১১০ মি: হার্ডেল
১২. ৪০০ মি: হার্ডেল
১৩. ৩০০০ মি: স্টিপল চেজ

হাঁটা-সমূহ
১. ম্যারাথন (২৬ মাইল, ৩৮৫ গজ)
২. ২০ কি:মি: হাঁটা
৩. ৫০ কি:মি: হাঁটা

ফিল্ড ইভেন্টস

লাফ-সমূহ
১. দীর্ঘলাফ
২. উচ্চলাফ
৩. ট্রিপলজাম্প
৪. পোলভল্ট

নিক্ষেপ-সমূহ
১. গোলক নিক্ষেপ
২. চাকতি নিক্ষেপ
৩. বর্শা নিক্ষেপ
৪. হ্যামার নিক্ষেপ

বি: দ্র:– ১০,০০০ মিটার দৌড়, হার্ডেল দৌড়, হাঁটা ইভেন্টস, স্টিপল চেজ ও হ্যামার নিক্ষেপ আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় না।

দৌড় প্রতিযোগিতার সাধারণ নিয়মাবলি

১. দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য ৪০০ মিটার ট্র্যাক আইনসম্মত ট্র্যাক।

২. দৌড়ের সময় অ্যাথলেটগণ বামপাশ ১ম লেনের দিকে রেখে দৌড়াবে।

৩. স্প্রিন্ট অর্থাৎ ১০০ মি:, ২০০ মি:, ৪০০ মি:, হার্ডেল দৌড়, ১০০ × ৪ মি: দৌড়-এর সময় লেন পরিবর্তন করা যাবে না। যার যার নির্দিষ্ট লেনে দৌড়াতে হবে।

৪. ৮০০ মি:, ১৫০০ মি: ও ৪ × ৪০০ মি: রিলে দৌড়ের সময় লেন পরিবর্তন করা যাবে। কতদূর যাওয়ার পর বা কীভাবে লেন পরিবর্তন করতে হবে তা দৌড় শুরু হওয়ার আগেই ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

৫. স্প্রিন্ট-এর জন্য স্টার্টিং ব্লক ব্যবহার করতে হবে। তবে অন্যান্য দৌড়ের ক্ষেত্রে স্টার্টিং ব্লক ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয়।

৬. দৌড়ের শেষ মাথায় দুইটি ফিনিশিং স্ট্যান্ড থাকবে যার উচ্চতা ১.৪০ মি: এবং প্রস্থ ৮ সেন্টিমিটার।

৭. ফিনিশিং ফিতায় 'টর্সো' আগে স্পর্শ করাতে হবে।

৮. দৌড়ের আরম্ভ ও শেষ রেখা সাদা রং দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।

৯. সব দৌড়ের আরম্ভ এক জায়গা থেকে হয় না, কিন্তু শেষ হয় একই স্থানে।

১০. আরম্ভকারীর পিস্তলের আওয়াজে সব দৌড় শুরু হবে।

১১. স্প্রিন্ট দৌড় আরম্ভের সময় আরম্ভকারী তিনটি শব্দ ব্যবহার করবে।

টর্সো

ক. On your mark অর্থাৎ আরম্ভ স্থানে যাও।

খ. Set অর্থাৎ দৌড় শুরুর চূড়ান্ত অবস্থান।

গ. Fired পিস্তলের আওয়াজ।

১২. একবার ফলস স্টার্ট হলে সে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ যাবে।

১৩. দূরপাল্লার দৌড়ের আরম্ভের সময় Set ব্যবহার করতে হয় না শুধু On your mark বলার পরেই বন্দুকের আওয়াজ।

স্প্রিন্ট দৌড়ের কৌশল : সর্বোচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন দৌড়কে স্প্রিন্ট বলে। ১০০ থেকে ৪০০ মিটার পর্যন্ত সব রকম দৌড় স্প্রিন্ট দৌড়ের অন্তর্ভুক্ত। স্প্রিন্ট দৌড়ের স্টার্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সঠিক স্টার্ট হলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়।

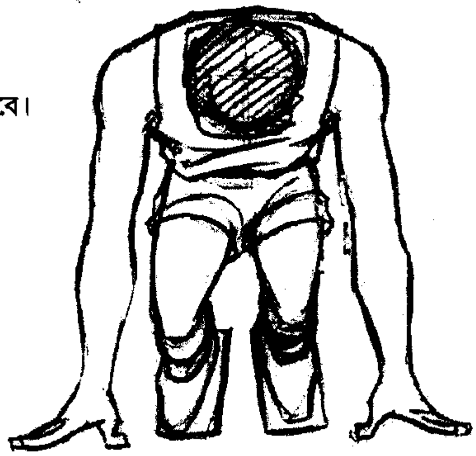

দৌড় আরম্ভ

তিনভাবে স্প্রিন্ট দৌড়ের স্টার্ট নেওয়া যায়–

১. বাঞ্চ স্টার্ট (Bunch Start)

২. মিডিয়াম স্টার্ট (Medium Start)

৩. অ্যালোংগেটেড স্টার্ট (Elongated Start)

১. বাঞ্চ স্টার্ট : সামনের পা আরম্ভ রেখা থেকে এক পা পিছনে এবং পিছনের পায়ের টিপ সামনের পায়ের হিলের সাথে এক লাইনে থাকবে।

২. মিডিয়াম স্টার্ট : সামনের পা আরম্ভ থেকে দুই পা পিছনে এবং পিছনের পায়ের হাঁটু ও সামনের পায়ের বল এক লাইনে থাকবে।

৩. অ্যালোংগেটেড স্টার্ট : সামনের পা আরম্ভ রেখা থেকে তিন পা পিছনে এবং পিছনের পায়ের হাঁটু ও সামনের পায়ের হিল এক লাইনে থাকবে।

স্প্রিন্ট দৌড়ের চারটি পর্যায় (Phase) আছে।

১. আরম্ভ রেখার অবস্থান (On your mark)

২. দৌড়ের শুরুর পূর্ব মুহূর্তের অবস্থান (Set)

৩. ব্লক থেকে উঠা (Drive)

৪. গতিবেগ বৃদ্ধি করা (Acceleration)

১. আরম্ভ রেখার অবস্থান : আরম্ভকারী On your mark বলার সাথে সাথে অ্যাথলেটগণ আরম্ভ রেখার পিছনে ২০–২৫ সে:মি: দূরে পা রেখে এবং আরম্ভ রেখা বরাবর দুইহাতের আঙ্গুল মাটিতে রাখতে হবে। স্টার্টিং ব্লকে পা রাখলে তা নির্দিষ্ট জায়গায় আগেই রাখতে হবে। দৃষ্টি সামনের দিকে থাকবে। হাঁটু ভেঙ্গে হাতের তালুতে ভর দিয়ে বসতে হবে।

২. দৌড় শুরুর পূর্ব মুহূর্তের অবস্থান : আরম্ভকারী সেট বলার সাথে সাথে পিছনের পা'কে সোজা করে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হবে। কোমর উপরে উঠবে। শরীরের সম্পূর্ণ ভর থাকবে হাতের উপর। এ সময় স্থির হয়ে থাকতে হবে এবং ২–৩ সেকেন্ডের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাবে।

৩. ব্লক থেকে ওঠা : বন্দুক/পিস্তলের আওয়াজ শোনার সাথে সাথে উঠে না দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যেতে হবে।

৪. গতিবেগ বৃদ্ধি করা : এর পরই গতিবেগ বৃদ্ধি করে দৌড়াতে হবে। ছবির সাহায্যে এ চারটি অবস্থান দেখানো হলো–

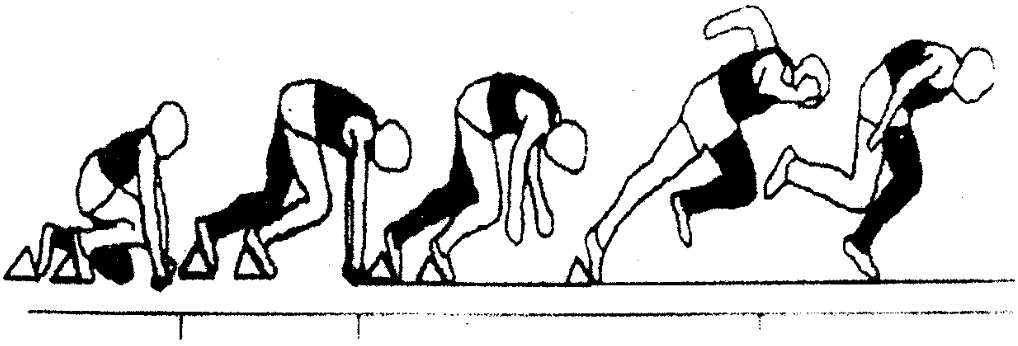

স্টার্টিং এর বিভিন্ন পর্যায়

দাঁড়িয়ে আরম্ভ : মধ্যম ও দীর্ঘ দূরত্বের দৌড় দাঁড়িয়ে আরম্ভ নিতে হয়। আরম্ভকারী On your mark বলার সাথে সাথে আরম্ভ রেখায় এসে দাঁড়াবে। তারপর বন্দুকের আওয়াজ শুনে দৌড় শুরু করবে।

দৌড় সমাপ্ত : সমস্ত দৌড় একই জায়গায় শেষ হবে। শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত যখন একই রেখায় সমাপ্তি রেখায় আসবে তখন দৌড় সমাপ্ত হয়েছে বলে ধরা হবে।

রিলে দৌড় : একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ৪ জন প্রতিযোগী সমান দূরত্বে ভালো করে দৌড়ায় তখন তাকে রিলে দৌড় বলে।

১. হাতে ব্যাটন নিয়ে দৌড়াতে হবে।

২. ব্যাটন বদলের জায়গায় ব্যাটন পরিবর্তন করতে হবে।

৩. ব্যাটন বদলের জায়গা ২০ মিটার।

৪. ব্যাটনের দৈর্ঘ্য ২৮–৩০ সে:মি: পরিধি ৩৮ মি.মি. ওজন ৫০ গ্রাম।

৫. ব্যাটন কাঠ, ধাতু বা ঐ জাতীয় ধাতু দ্বারা তৈরি হবে।

৬. ব্যাটন বদলের পর যার যার নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে হবে যতক্ষণ না অন্যান্য প্রতিযোগী তাকে অতিক্রম করে।

ব্যাটন বদলের কৌশল : ব্যাটন বদলের সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো দৌড়ের গতিবেগ যেন না কমে। সেজন্য ব্যাটন বদলের কৌশলের অনুশীলনটা বারবার করতে হয়। ব্যাটন বদলের কৌশল দু'রকমের (১) দেখে বদল (২) না দেখে বদল।

১. **দেখে পরিবর্তন** : যখন ব্যাটন বদলের সময় পিছনের দিকে তাকায়ে বা দেখে ব্যাটনটি বদল করে তাকে দেখে পরিবর্তন বলে।

২. **না দেখে পরিবর্তন** : বদলের সময় পিছন থেকে স্পিডে দৌড়ে এসে না দেখে হাত থেকে কাঠিটি গ্রহণ করে তাকে না দেখে বদল বলে।

ব্যাটন পাসের কৌশল : ব্যাটন পাসের কৌশল দু'রকমের।

১. উপরের দিকে ধরে পাস (Upward pass)

২. নিচের দিকে ধরে পাস (Downward pass)

১. উপরের দিক পাস : কাঠিটি হস্তান্তর করার সময় যদি ব্যাটনটির মাথা উপরের দিকে ধরে পাস করা হয় তাকে আপওয়ার্ড পাস বলে।

২. নিচের দিকে ধরে পাস : ব্যাটনটি হস্তান্তর করার সময় ব্যাটনটির মাথা যদি নিচের দিকে ধরে পাস করা হয় তাহলে তাকে ডাউনওয়ার্ড পাস বলে।

যেভাবেই পাস করা হোক না কেন এটা নির্ভর করে অনুশীলনের উপর।

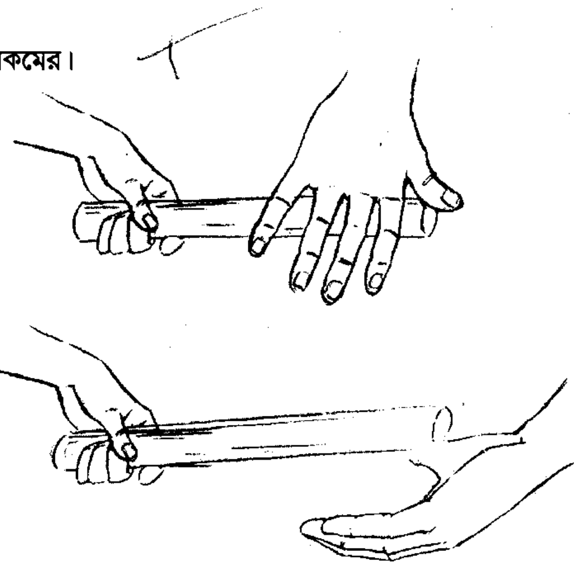

ব্যাটন বদল

কাজ–১ : স্প্রিন্ট দৌড়ের স্টার্ট কীভাবে নিতে হয় মাঠে গিয়ে দেখাতে বলবেন।
কাজ–২ : দৌড়ের সমাপ্তি রেখা স্পর্শ করার কৌশলগুলো গ্রুপ হিসেবে দেখাও।
কাজ–৩ : দেখে বা না দেখে ব্যাটন পরিবর্তনের কৌশলগুলো বর্ণনা কর ও মাঠে প্রদর্শন কর।

পাঠ–২ : লাফ বিভাগ : লাফ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ক. লংজাম্প, খ. হাইজাম্প, গ. হপস্টেপ এন্ড জাম্প, ঘ. পোলভল্ট।

ক. লংজাম্প বা দীর্ঘলাফ-এর সাধারণ নিয়মাবলি

১. রানওয়ের ভেতর দিয়ে দৌড়িয়ে আসতে হবে।

২. রানওয়ের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ৪০ মিটার, প্রস্থ ১.২২-১.২৫ মি:, উভয় পার্শ্ব সাদা রং দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে।

৩. টেক অফ বোর্ডের দৈর্ঘ্য ১.২১–১.২২ মিটার, চওড়া ১৯.৮ মি:মি:– ২০.২ মি:মি:, উচ্চতা–১০০ মি:মি:।

৪. টেক অফ ল্যান্ডিং এরিয়া থেকে ১–৩ মি: দূরে থাকবে।

৫. জাম্প পিটের মাপ দৈর্ঘ্য ১০ মি:, প্রস্থ ২.৭৫–৩ মি:।

৬. টেক অফ বোর্ডের রং হবে সাদা।

৭. জাম্পপিট বালি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে তবে টেক অফ বোর্ডের উপরে উঠবে না।

৮. শরীরের যে অংশ সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করবে সেখান থেকে মাপ নিতে হবে।

৯. একজন প্রতিযোগী অযোগ্য হবে –

ক. নাম ডাকার ৯০ সেকেন্ডের ভিতর লাফ দিতে ব্যর্থ হলে।

খ. টেক বোর্ডের বাইরে দিয়ে লাফ দিলে।

গ. ল্যান্ডিং-এর পূর্বে ল্যান্ডিং এরিয়ার বাইরের মাটি স্পর্শ করলে।

ঘ. লাফ শেষ করে পিছনের দিকে হেঁটে এলে।

ঙ. সামার সল্ট বা দু'পায়ে টেক অফ নিলে।

চ. টেক অফ বোর্ডের সামনের মাটি স্পর্শ করলে।

দীর্ঘ লাফের কৌশল : যারা ভালো স্প্রিন্টার তারা দীর্ঘলাফে ভালো করে। একজন ভালো লং জাম্পার হতে হলে তার শক্তি ও গতি প্রয়োজন যা স্প্রিন্টারের মধ্যে আছে। দীর্ঘলাফের কৌশলকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. অ্যাপ্রোচ রান (দৌড়ে আসা), ২. টেক অফ (মাটিতে ভর দিয়ে উপরে ওঠা), ৩. ফ্লাইট (শূন্যে ভাসা), ৪. ল্যান্ডিং (মাটিতে অবতরণ)

১. অ্যাপ্রোচ রান : লাফ দেয়ার জন্য ৫০ থেকে ৮০ ফুট দূর থেকে তীব্র গতিতে দৌড়ে আসাকে অ্যাপ্রোচ রান বলে। শেষের পদক্ষেপগুলো খুব দ্রুত হবে। টেক অফ বোর্ডে ঠিকমতো পা পড়ার জন্য ১৫-২৫ ফুট দূরে একটি টেকঅফের জন্য চিহ্ন দিতে হয়। এই চেক মার্কে ঠিকমতো পা পড়লে মনে করতে হবে টেক অফ বোর্ডে ঠিক মতো পা পড়বে। টেক অফ বোর্ডে ঠিকমতো পা পড়ার জন্য একজন অ্যাথলেটকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়।

২. টেক অফ : দীর্ঘ লাফে মাটি ছেড়ে উপরে ওঠার জন্য কাঠের তৈরি একটি টেক অফ বোর্ড থাকে। এই বোর্ডটি ৪ ফুট লম্বা, ৮ ইঞ্চি চওড়া ও ৪ ইঞ্চি গভীর হয়। উপরিভাগ সাদা রং দিতে হয়। এর উপর পা দিয়ে শূন্যে ওঠাকে টেক অফ বলে। যার টেক অফ ভালো হবে সে দূরত্ব বেশি যাবে।

৩. ফ্লাইট : টেক অফ বোর্ডে পা দিয়ে উপরে ওঠার পর থেকে মাটিতে নামার আগ পর্যন্ত সময় হচ্ছে ফ্লাইট বা শূন্যে ভাসা। শূন্যে বায়ুর মধ্যে হাঁটা, হাঁটু গুটিয়ে নেওয়া, ঝাঁকুনি দিয়ে খুব জোরে পা ছোড়া হিচকিক (Hitch Kick) এগুলো হলো শূন্যে ভাসার পদ্ধতি। শূন্যে যার পায়ের মুভমেন্ট ভালো হবে সে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে।

৪. ল্যান্ডিং : মাটিতে অবতরণের সময় পা মাটিকে স্পর্শ করার পূর্ব মুহূর্তে পা দুটোকে সামনের দিকে সম্পূর্ণ সোজা করে নিতে হবে যাতে বেশি দূরত্বে যাওয়া যায়। গোড়ালি দুটো ল্যান্ডিং পিটের প্রথম বালি স্পর্শ করবে এবং সাথে সাথে দু'হাঁটু ভেঙ্গে গোড়ালি থেকে পায়ের পাতায় শরীরের ভর নিয়ে আসতে হবে। তারপর সামনে গড়িয়ে পড়তে হবে।

কাজ–১ : দীর্ঘলাফের টেক অফ ঠিকমতো দিতে পারছে কিনা তা দেখাতে বলবেন।
কাজ–২ : ল্যান্ডিং-এর সময় পায়ের অবস্থান ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা প্রদর্শন করতে বলবেন।

পাঠ–৩ : উচ্চলাফ :

উচ্চলাফের নিয়মাবলি :

১. উচ্চলাফ শুরুর পূর্বে প্রতিযোগীদের লাফের উচ্চতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে এবং প্রতি রাউন্ড উচ্চতা কী পরিমাণ বাড়াতে হবে তা ঘোষণা করতে হবে।

২. রাউন্ড শেষে কমপক্ষে ২ সেন্টিমিটার উঠাতে হবে।

৩. রানওয়ের দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ১৫ মিটার হবে।

৪. একজন প্রতিযোগী তার সুবিধার জন্য রানআপ ও টেক অফ মিলানোর জন্য একাধিক মার্কার ব্যবহার করতে পারবে।

৫. দু'খুঁটির মধ্যে দূরত্ব থাকবে ৪.০৪ মিটার।

৬. ক্রসবার ধাতু, কাঠ বা ঐ জাতীয় কোনো বস্তু দ্বারা তৈরি হবে। দৈর্ঘ্য হবে ৩.৯৮ থেকে ৪.০২ মিটার। ব্যাস ২৯ মি:মি: থেকে ৩১ মি:মি:।

৭. উচ্চলাফের ল্যান্ডিং এরিয়ার মাপ ৫ × ৫ মিটার।

৮. একজন প্রতিযোগী কখন একটি সুযোগ হারায়–

ক) নাম ডাকার ৯০ সেকেন্ডের মধ্যে লাফ দিতে না পারলে।

খ) লাফ দেওয়ার সময় ক্রসবারের লাইন অতিক্রম করলে।

গ) দু'পায়ে টেক অফ নিলে।

ঘ) লাফ দেওয়ার সময় ক্রসবার পড়ে গেলে।

উচ্চলাফের কৌশল : যে কৌশলেই লাফ দেওয়া হোক না কেন, লাফ দেওয়ার সময় চারটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়।

১. অ্যাপ্রোচ রান, ২. টেক অফ, ৩. ক্রসবার অতিক্রম করা, ৪. ল্যান্ডিং

১. দৌড়িয়ে আসাকে এ্যাপ্রোচ রান বলে।

২. দৌড়িয়ে এক পায়ে ভর দিয়ে ওঠাকে টেক অফ বলে।

৩. যে কোনো পদ্ধতিতে ক্রসবারটি অতিক্রম করতে হবে।

৪. ক্রসবার অতিক্রমের পর মাটিতে পড়াকে ল্যান্ডিং বলে।

উচ্চ লাফ দেওয়ার পদ্ধতি তিন প্রকার–

১. ওয়েস্টার্ন রোল ২. বেলি রোল ৩. ফসবেরি ফ্লপ

১. ওয়েস্টার্ন রোল : এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো যে পায়ে টেক অফ নেবে, দু'হাত ও সেই পায়ের উপরই ল্যান্ডিং হবে। বাম পায়ের উপর টেক অফ নিলে ক্রসবার অতিক্রম করার পর বাম পায়ের উপরই ল্যান্ডিং হবে।

ক. সাধারণত সাত পদক্ষেপ দৌড়ে এসে লাফ দেওয়া হয়। উচ্চতা কম হলে পাঁচ পদক্ষেপই যথেষ্ট।

খ. লাফানোর জন্য দৌড় শুরু করার সময় ক্রসবারের সাথে ৪৫° থেকে ৬০° কোণ সৃষ্টি করে দাঁড়াতে হবে।

গ. মাটি ছেড়ে ওঠার সময় শেষের তিনটা পদক্ষেপ দ্রুত এবং অপেক্ষাকৃত লম্বা হবে।

ঘ. পিছনের পাকে খুব জোরে উপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে যে পায়ের উপর ভর দিয়ে মাটি ছাড়তে হবে সেই পায়ের গোড়ালি থেকে পাতার উপর সম্পূর্ণ শরীরটাকে গড়িয়ে এনে পাকে সোজা করে মাটি ছেড়ে উপরে উঠাতে হবে।

ঙ. যে পা দিয়ে মাটি ছাড়া হবে, পরে সেই পায়ের হাঁটু ভেঙ্গে উপরে তুলতে হবে।

চ. ক্রসবারের উপর সম্পূর্ণ শরীরটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে সে দিকের কাঁধকে ক্রসবারের উপর খাড়াভাবে রেখে ক্রসবার অতিক্রম করবে।

ছ. যে পায়ে ল্যান্ডিং সেই পা ও দু'হাতের উপর ভর করে ল্যান্ডিং করতে হবে।

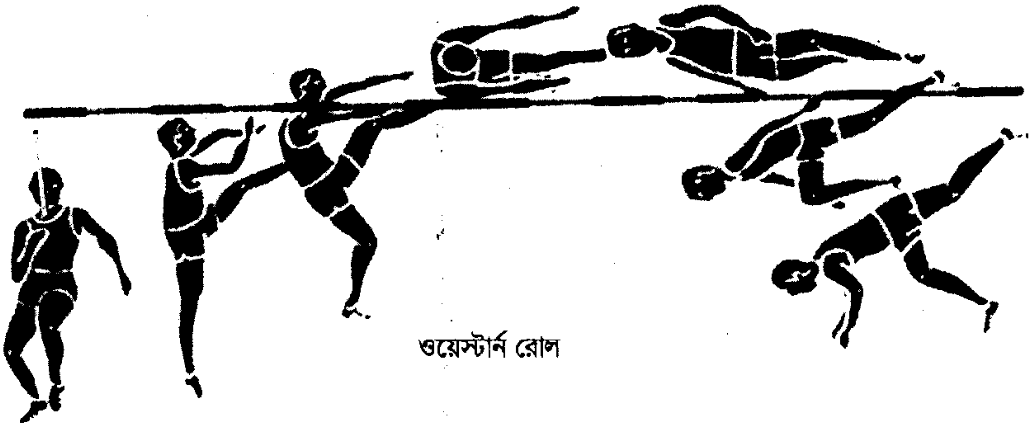

ওয়েস্টার্ন রোল

২. বেলি রোল : এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো যে পায়ে টেক অফ নিবে তার বিপরীত পা ও দু'হাতের উপর ভর করে ল্যান্ডিং করতে হবে। ফোমের উপর হলে নিজের সুবিধে মতো পিঠের উপরও ল্যান্ডিং করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে মনে রাখতে হবে–

ক. দৌড়ে আসার কোণ ক্রসবারের সাথে ২৫°–৪০° হবে।

খ. টেক অফ এর সময় শেষের পদক্ষেপগুলো দ্রুত ও লম্বা হবে। তবে মাটি ছাড়ার পর বিপরীত পা ও সে দিকের হাতকে ক্রসবারের উপর প্রথমে নিয়ে যেতে হবে।

গ. ক্রসবারের উপরে এলে শরীরের উপরের অংশটাকে নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে হয়। তাতে পেটের দিকটাকে ক্রসবারের কাছাকাছি রাখা যায়।

ঘ. যে হাত ও পা প্রথমে নামছে সে দিকের দেহের উপরের অংশ (কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত) মাটিতে নামিয়ে হাতকে দেহের ভিতরের দিকে ঠেলে দিয়ে গড়িয়ে দিতে হবে।

বেলি রোল

৩. **ফসবেরি ফ্লপ** : ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো অলিম্পিকে আমেরিকার ডিক ফসবেরি এক নতুন পদ্ধতিতে উচ্চ লাফ দিয়ে সোনার মেডেল পান তখন থেকে তার নামানুসারে এই ফসবেরি ফ্লপের প্রচলন হয়। এটা বর্তমানে সর্বজনীন পদ্ধতি। তবে মনে রাখতে হবে ফোমের ম্যাট ছাড়া এ পদ্ধতিতে লাফ দেওয়া সম্ভব নয়।

ক. ক্রসবারের সাথে ৯০° কোণ করে দাঁড়িয়ে দৌড় শুরু করতে হয় এবং অর্ধবৃত্তাকারে ক্রসবারের কাছে আসতে হয়।

খ. শরীরের মাঝখানটাকে পিছন দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে টেক অফ পা দেহের ভর কেন্দ্রের সামনে রাখতে হবে। এরপর দ্রুত জোরের সাথে উপরের দিকে উঠতে হবে। একই সাথে অপর পাটাকে দুলিয়ে উপরে ডান কাঁধের লাইনে নিয়ে যেতে হবে। তার ফলে পিঠ ক্রসবারের দিকে চলে আসবে।

গ. দেহ মাটি ছেড়ে যখনই উপরে উঠবে, সাথে সাথে হাত দুটো পাশে দেহের সমান্তরালে এনে মাথা মধ্য শরীর ও কোমরের নিচের অংশ ক্রসবারের উপর দিয়ে পার করতে হবে। হাত ও পা দুটো উপরের দিকে থাকবে এবং পিঠের উপর অবতরণ করবে।

ফসবেরি ফ্লপ

অ্যাথলেটিক্সের টাই : টাই (Tie) অর্থ সমতা। যখন দু'জনের ফলাফল সমান হয় তখন তাকে টাই বলে। টাই দুই রকমের– ১. উচ্চতার টাই ২. দূরত্বের টাই।

১. **উচ্চতার টাই** : পোলভল্ট ও হাইজাম্পে টাই হলে তাকে উচ্চতার টাই বলে। কারণ এদের টাই হয় উচ্চতায়।

২. দূরত্বের টাই : দীর্ঘলাফ হপস্টেপ এন্ড জাম্প, চাকতি নিক্ষেপ গোলক নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ, হাতুড়ি নিক্ষেপ এসব ইভেন্টের প্রতিযোগীদের মধ্যে টাই হলে তাকে দূরত্বের টাই বলে। শুধু ১ম স্থানের জন্য টাই ভাঙতে হয়। ২য় ও ৩য় স্থানের জন্য টাই হলে যুগ্মভাবে ফলাফল ঘোষণা করতে হয়।

১. উচ্চতায় টাই হলে টাই ভাঙ্গার নিয়ম–

ক) যে উচ্চতায় টাই হয়েছে সে উচ্চতায় যে কম চেষ্টায় অতিক্রম করেছে সে প্রথম হবে।

খ) উপরের নিয়মে টাই না ভাঙলে ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত যার ক্রস কম সে ১ম হবে।

গ) এর পরেও যদি টাই না ভাঙ্গে তাহলে উচ্চতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে লাফ দেওয়াতে হবে যে অতিক্রম করবে সে বিজয়ী হবে। এখানে প্রতিযোগীগণ ১টি করে লাফের সুযোগ পাবে।

নিম্নে ছক এঁকে দেখান হলো।

ছক–১

প্রতি যোগী	উচ্চতা						অকৃত কার্য	পুনরায় লাফ			স্থান
	১.৭৫ মি:	১.৮০ মি:	১.৮৪ মি:	১.৮৮ মি:	১.৯১ মি:	১.৯৪মি:		১.৯১	১.৮৯	১.৯১	
ক	o	× o	o	× o	×××	–	২	×	o	×	২
খ	–	× o	–	× o	–	×××	২	×	o	o	১
গ	–	o	× o	× o	×××	–	২	×	×	–	৩
ঘ	× o	o	× o	× o	×××	–	৩	–	–	–	৪

o = অতিক্রম করা, × = অকৃতকার্য, – লাফ দেয়নি।

এখানে দেখা যাচ্ছে ১.৯১ মি: উচ্চতা কেউই পার হতে পারেনি। ১.৮৮ মি: উচ্চতা সবাই দ্বিতীয় চেষ্টায় অতিক্রম করেছে। টাই সমাধানের ২নং সূত্র মতে দেখতে হবে ক্রস কম কার। ক্রসও তিনজনের ২টি করে অর্থাৎ ২নং সূত্র মতেও টাই ভাঙছে না। এখন ৩নং সূত্র অনুসরণ করতে হবে। ৩নং সূত্র মতে ঐ তিনজন প্রতিযোগীকে পুনরায় ১টি লাফ দিতে হবে।

এখানে দেখা যাচ্ছে ১.৮৯ মি: উচ্চতা ক এবং খ অতিক্রম করেছে। এ দু'জনের মধ্যে আবার টাই হয়েছে। বার উপরে তুলে ১.৯১ মি: ঐ দু'জন ১টি করে লাফ দিয়ে ক অকৃতকার্য হয়েছে এবং খ অতিক্রম করেছে। তাহলে ফলাফল হলো। খ–১ম, ক–২য়, গ–৩য় ও ঘ–৪র্থ।

ছক–২

প্রতি যোগী	উচ্চতা							অকৃতকার্য	স্থান
	১.৭৮ মি:	১.৮২ মি:	১.৮৫ মি:	১.৮৮ মি:	১.৯০ মি:	১.৯২মি:	১.৯৪ মি:		
ক	–	× o	o	× o	–	××o	× ×	৪	২
খ	o	o	o	×	× o	××o	× ×	৪	২
গ	o	×	o	o	× × o	××o	× ×	৫	৪
ঘ	× o	–	o	× × o	× × o	× o	× ×	–	১

এখানে দেখা যাচ্ছে ১.৯৪ মি: উচ্চতা কেউই অতিক্রম করতে পারেনি। ১.৯২ মি: উচ্চতা সবাই অতিক্রম করেছে তবে ক, খ, গ করেছে তৃতীয় চেষ্টায় ও ঘ করেছে দ্বিতীয় চেষ্টায়। সুতরাং টাই ভাঙ্গার ১নং সূত্র মতে ঘ ১ম। ক, খ উভয়েই তৃতীয় চেষ্টায় ও ক্রসও সমান সেজন্য দু'জনই দ্বিতীয় হবে কারণ ১ম স্থান ছাড়া অন্য স্থানের জন্য টাই ভাঙ্গা হয় না।

দূরত্বের টাই হলে টাই ভাঙ্গার নিয়ম :

ক. মোট নিক্ষেপ বা লাফের ভিতর ২য় সর্বোচ্চ দূরত্ব দেখতে হবে।

খ. এ নিয়মে টাই না ভাঙলে ৩য় সর্বোচ্চ দেখতে হবে। (এভাবে ক্রমান্বয়ে যাবে)

নিম্নে ছক এঁকে বুঝানো হলো– (দীর্ঘ লাফ)

ছক–৩

প্রতিযোগী	উচ্চতা						স্থান
	১ম লাফ	২য় লাফ	৩য় লাফ	৪র্থ লাফ	৫ম লাফ	৬ষ্ঠ লাফ	
ক	৭.০২	৭.১৫	–	৭.১০	৭.৩৫	৭.৪০	৩য়
খ	৬.১০	৬.৫০	৬.৬০	৭.০৫	৭.১০	৭.১২	৪র্থ
গ	৭.৫০	–	–	৭.৪৫	৭.৫৫	৭.৬০	১ম
ঘ	–	৭.৩০	৭.৪০	৭.৬০	–	৭.৫০	২য়

এখানে দেখা যাচ্ছে গ ও ঘ দু'জনেই ৭.৬০ মি: দূরত্ব অতিক্রম করেছে। সূত্র মতে এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দূরত্ব দেখতে হবে। গ এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দূরত্ব হলো ৭.৫৫ মি: ও ঘ. এর ৭.৫০ মি: সুতরাং গ ১ম ও ঘ ২য় এবং ক ৩য়।

দীর্ঘলাফ, হপস্টেপ এন্ড জাম্প , শটপুট, চাকতি, হ্যামার ও বর্শা নিক্ষেপের টাই হলে সব টাই ভাঙ্গার নিয়ম একই।

কাজ–১ : তোমরা যে পদ্ধতিতে লাফ দেওয়া পছন্দ কর উক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে লাফ দিয়ে কৌশল দেখাও।

কাজ–২ : বেলি রোলের কৌশল বর্ণনা করতে বলবেন।

পাঠ–৪ : ট্রিপল জাম্প বা হপস্টেপ এন্ড জাম্প ও পোলভল্ট :

১. ট্রিপল জাম্প : হপস্টেপ এন্ড জাম্প বা লাফ ঝাঁপ ধাপ অর্থাৎ এই তিনের সমন্বয়ে যে লাফ দেওয়া হয় তাকে ট্রিপল জাম্প বলে। যে পায়ে টেক অফ সে পায়ে প্রথমে হপ, বিপরীত পায়ে স্টেপ ও তার পরে লাফ দিতে হয়। এই ইভেন্টে তিনটি লাফই সমান গুরুত্ব বহন করে। এই তিনটি জাম্পের মধ্যে অনুপাত হিসেব করে লাফ দিলে অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা যায়। সাধারণত ৬ : ৫ : ৬ অনুপাত নতুন অ্যাথলেটদের জন্য সুবিধাজনক। প্রথম হপ ৬ হলে স্টেপ নিতে হবে ৫ এবং শেষে লাফ দিতে হবে ৬। প্রথমে বাম পায়ে টেক অফ নিলে সেই পায়ে হপ দিয়ে ডান পায়ে স্টেপ নিয়ে তারপর জাম্প দিতে হবে।

অ্যাপ্রোচ রান : দীর্ঘলাফের মতো দৌড়িয়ে আসতে হয়। দৌড়ের গতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন মাটি ছাড়ার সময় দৌড়ের গতি বেশি থাকে।

টেক অফ : দীর্ঘলাফ ও ট্রিপল জাম্প এর টেক অফ এক নয়। ট্রিপল জাম্পের মাটি ছাড়ার সময় চেষ্টা থাকে যে, কীভাবে সামনের দিকের গতি বজায় রাখা যায়। প্রথম হপ খুব উঁচু করে নেওয়া ঠিক নয়। স্বাভাবিক হপ নিয়ে ক্রমান্বয়ে উঁচুতে উঠলে লাফটি ভালো হয়। হপ যে উচ্চতা নিতে হবে স্টেপ তা থেকে বেশি উচ্চতায় নিতে হবে। তা থেকেও বেশি উচ্চতায় লাফ দিতে হবে।

মাটির উপরে শূন্যে ভাসা : দীর্ঘলাফের সময় শূন্যে যেভাবে পায়ের নড়াচড়া করতে হয় এখানেও সেভাবে পায়ের নড়াচড়া করতে হবে তাহলে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা যাবে।

ল্যান্ডিং : দীর্ঘলাফের ল্যান্ডিং-এর কৌশল ও ট্রিপল জাম্পের ল্যান্ডিং-এর কৌশল একই।

নিয়মাবলি

১. যদি ৮ এর অধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে সেক্ষেত্রে ৩টি লাফের পর ৮ জনকে বাছাই করে ঐ আটজন আরও তিনটি করে লাফ দিবে। এই ছয় লাফের ভেতর যার দূরত্ব বেশি হবে সে বিজয়ী হবে।

২. লাফ দেওয়ার সময় টেকঅফ বোর্ডের সামনের যে বালির দেয়াল দেওয়া আছে তা ভেঙ্গে ফেললে ঐ লাফটি বাতিল হবে।

৩. অ্যাপ্রোচ রানের সময় দৌড় পথে কোনো চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

৪. হাতে, পায়ে, কোনো ওজন বা গ্রিপ নিয়ে লাফ দেওয়া যাবে না।

৫. লাফ দেওয়ার সময় অপর পা মাটিতে স্পর্শ করলে ঐ লাফটি বাতিল হবে।

২. পোলভল্ট বা দণ্ড লাফ : পোল-এর উপর ভর দিয়ে যে লাফ দেওয়া হয় তাকে পোলভল্ট বা দণ্ডলাফ বলে।

প্রতিযোগিতার নিয়ম :

১. প্রতিযোগিতা শুরু করার আগে উচ্চতা সম্পর্কে প্রতিযোগীদের অবহিত করবেন এবং প্রতি রাউন্ড শেষে কতটুকু উচ্চতা বাড়ানো হবে তাও বলে দেবেন।

২. প্রতি রাউন্ড শেষে ক্রসবার কমপক্ষে ৫ সে: মিটার উপরে উঠবে।

৩. লাফ দেওয়ার সুবিধার জন্য প্রতিযোগীগণ বক্সের ভেতরের ধার থেকে রানওয়ের দিকে ০.৪ মিটার ও পিটের দিকে ০.৮ মিটার পর্যন্ত পোস্টদয় সরাতে পারবেন।

৪. প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলে অনুশীলনের জন্য লাফের স্থান ব্যবহার করা হয় না।

৫. একজন প্রতিযোগীর লাফ কখন ব্যর্থ হবে–

ক. দু'পা শূন্যে উঠে গেলে।

খ. যদি লাফের পর ক্রসবার পড়ে যায়।

গ. যদি ক্রসবারের সামনের ভূমি স্পর্শ করে।

ঘ. যদি লাফ না দিয়ে দণ্ড দিয়ে ক্রসবার ফেলে দেয়।

৫. যদি লাফের সময় দণ্ড ধরা অবস্থায় নিচের হাত উপরের হাতের উপরে নেয় বা দুই হাত পরিবর্তন করে বেয়ে বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করে।

৬. একজন প্রতিযোগী এক উচ্চতায় তিনটি করে লাফ দেওয়ার সুযোগ পাবে।

৭. পোল ভালো করে ধরার জন্য হাতে যে কোনো ধরনের পদার্থ লাগাতে পারবে।

৮. লাফ দেওয়ার সময় দণ্ডটি ভেঙ্গে গেলে পুনরায় লাফ দেওয়ার সুযোগ পাবে।

৯. টাই হলে উচ্চতার টাই ভাঙ্গার নিয়ম অনুসারে টাই ভাঙতে হবে।

১০. রানওয়ের দৈর্ঘ্য হবে ৪০ মি: প্রস্থ হবে ১.২২ মিটার।

১১. ল্যান্ডিং-এর মাপ হবে দৈর্ঘ্য ৫ মি:, প্রস্থ ৫ মিটার।

১২. প্রত্যেক প্রতিযোগী নিজ নিজ দণ্ড ব্যবহার করবে।

কৌশল

পোল তিনভাবে ধরা যায়–

১. উঁচু করে বহন করা, ২. মধ্যমভাবে বহন করা, ৩. নিচুভাবে বহন করা।

কোনো প্রতিযোগী কীভাবে দণ্ড ধরবে তা তাদের উচ্চতা ও অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। যে যেভাবেই ধরুক বক্সে দন্ডের গোড়া ঢুকিয়ে লাফ দিতে হবে।

লাফ দেওয়ার ৬টি ধাপ :

১. রানওয়ে দিয়ে দৌড়ে আসা

২. পোল ঠিকমতো বক্সে প্লেস করা

৩. ঠিকমতো টেক অফ নেওয়া

৪. পোলে ভর দিয়ে উপরে ওঠা

৫. বারের উপর শরীর দোল খাওয়ানো

৬. পোল ছাড়া ও শরীর ঘুরিয়ে ল্যান্ডিং করা

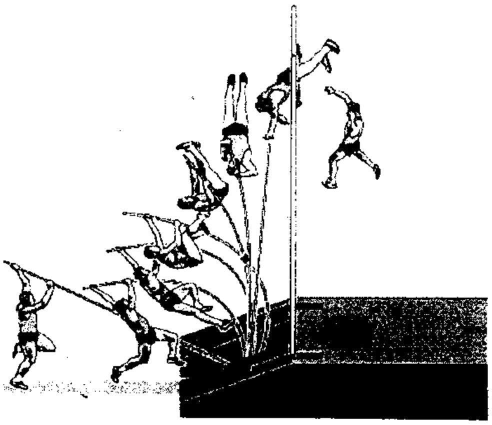

দন্ড লাফ

কাজ–১ : পোল ধরে কীভাবে বহন করতে হয় দেখাও।

কাজ–২ : লাফ দেওয়ার ধাপ কয়টি বর্ণনা করো।

কাজ–৩ : ট্রিপল জাম্প দেওয়ার কৌশলগুলো প্রদর্শন করতে বলবেন।

পাঠ–৫ : নিক্ষেপ বিভাগ : আন্তঃস্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিক্ষেপ বিভাগে গোলক, বর্শা ও চাকতি এই তিনটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই তিনটি ইভেন্টের নিয়মাবলি ও কলাকৌশল বর্ণনা করা হলো–

১. গোলক নিক্ষেপ : গোলকটি লোহা, পিতল বা ঐ জাতীয় কোনো বস্তু দ্বারা তৈরি হবে। আকৃতি গোলাকার এবং মসৃণ হবে । গোলকের ওজন পুরুষদের জন্য ৭.২৬০ কেজি। মহিলাদের জন্য ৪ কেজি। শট পুট সার্কেলের ব্যাস হবে ২.১৩৫ মি: সেক্টরের কোর্প হবে ৩৪.৯২°। একটি বাঁকানো কাঠের তৈরি স্টপ বোর্ড বৃত্তের সামনের দাগের উপর বসাতে হবে। স্টপ বোর্ডটি সাদা রঙের হবে এবং মাটিতে দৃঢ়ভাবে লাগানো থাকবে। পায়ের ধাক্কা লেগে যেন সরে না যায়।

গোলক নিক্ষেপের কৌশল : গোলকটি হাতের তালুতে না ধরে আঙ্গুলের গোড়াসহ সম্পূর্ণ আঙ্গুলের মধ্যে থাকবে। বুড়ো আঙ্গুল ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল গোলকের দুদিকে একটু ছড়িয়ে থাকবে যাতে পড়ে না যায়। এরপর গোলকটি গলা ও কাঁধের মাঝখানে রাখতে হবে এবং হাতের কনুই কিছুটা উঁচুতে থাকবে। যে দিকে গোলকটি ছোড়া হবে তার বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে। ডান পা সামনে ও বাম পায়ের পাতাকে পিছনে নিয়ে ডান পায়ের গোড়ালির কাছে রাখতে হবে। এরপর পাসহ শরীরকে পিছনে টেনে এনে শরীর পাশে ঘুরে আসবে।

নিয়মাবলি

১. গোলকটি সেক্টরের মধ্যে নিক্ষেপ করতে হবে।

২. আটজন প্রতিযোগী হলে সবাই ৬টি করে নিক্ষেপ করার সুযোগ পাবে।

৩. আটের অধিক হলে প্রথমে ৩টি করে নিক্ষেপ করে বাছাই করতে হবে। বাছাইকৃত প্রতিযোগীগণ আরও তিনটি করে নিক্ষেপ করার সুযোগ পাবে।

৪. নিক্ষেপ শেষে বৃত্তের উপরে স্পর্শ করা যাবে না।

৫. গোলকটি মাটিতে না পড়া পর্যন্ত বৃত্ত থেকে বের হওয়া যাবে না।

৬. নাম ডাকার ৯০ সেকেন্ডের ভিতর নিক্ষেপ করতে হবে।

গোলক ধরা

২. বর্শা নিক্ষেপ : বর্শা নিক্ষেপের ইংরেজি হলো জ্যাভেলিন থ্রো। বর্শার দৈর্ঘ্য পুরুষ ২.৬০–২.৭০ মিটার, মহিলাদের ২.২০–২.৩০ মিটার। বর্শার ওজন পুরুষদের ৮০০ গ্রাম, মহিলাদের ৬০০ গ্রাম। রানওয়ে কমপক্ষে ৩৩.৫ মি: হবে। ৮ মি: লম্বা ও ৪ মি: চওড়া একটি বৃত্তচাপ অংকন করতে হবে। আর্কটি একটি কাঠ ধাতুর তৈরি বস্তু দ্বারা মাটির সমান্তরালে স্থাপন করতে হবে। দুপাশে ১.৫০ মি: বাড়ানো থাকবে।

গোলক নিক্ষেপের কৌশল

বর্শা নিক্ষেপের কৌশল : প্রথমে জ্যাভেলিন ধরা শিখতে হবে। কারণ ধরা ভালো হলে ছোড়াও ভালো হবে। ধরা তিন প্রকার–

ক. সামনের আঙ্গুল দিয়ে ধরা (Fore finger grip) : জ্যাভেলিনটি সামনের আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরতে হয়।

খ. মধ্যম আঙ্গুল দিয়ে ধরা (Middle finger grip) : মাঝের আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরা।

গ. মধ্যম ও সামনের আঙ্গুলের মাঝখান দিয়ে ধরা (In between fore and middle finger) : সামনের আঙ্গুল ও মাঝের আঙ্গুলের মাঝখানে দিয়ে ধরা।

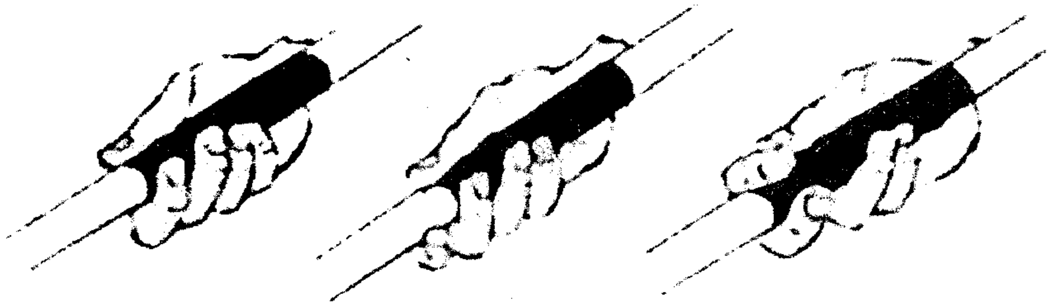

জ্যাভেলিন ধরা

বহন করা : রানওয়ে দিয়ে দৌড়ে আসার সময় তিনভাবে জ্যাভেলিন বহন করা যায় ১. কাঁধের নিচ দিয়ে, ২. কাঁধের উপর দিয়ে, ৩. মাথা বরাবর। যার যেভাবে সুবিধা মনে হবে সে সেভাবে জ্যাভেলিন বহন করতে পারে। তবে উঁচু করে বহন করলে সুবিধা হয়।

জ্যাভেলিন ছোড়া : জ্যাভেলিন ছোড়ার সময় ৪টি ধাপ (Phase) অতিক্রম করতে হয়।

১. দৌড়ে আসা, ২. পাঁচ স্টেপের রিদম, ৩. নিক্ষেপ, ৪. পূর্বের অবস্থায় ফেরা।

১. দৌড়ে আসা : বর্শা ধরে ছোড়ার জন্য রানওয়ে দিয়ে দৌড়ে আসা।

২. পাঁচ স্টেপের রিদম : ছোড়ার আগে রিদমের সাথে পাঁচটি পদক্ষেপ নিয়ে বর্শাটি নিক্ষেপ করতে হয়।

৩. নিক্ষেপ : ৫টি পদক্ষেপ নিয়ে বর্শা ছুড়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।

৪. পূর্বের অবস্থায় ফেরা (Recovery) : ভারসাম্য রক্ষার পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতে হয়।

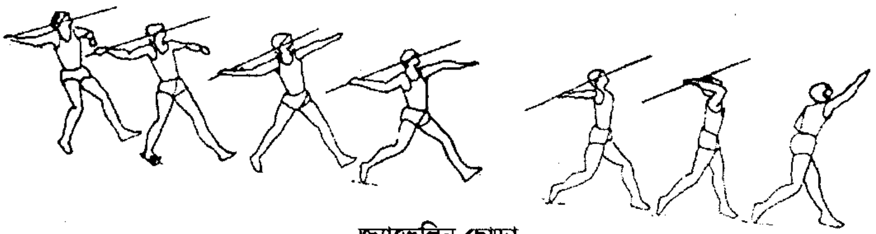

জ্যাভেলিন ছোড়া

বর্শার নিক্ষেপের নিয়মাবলি

১. বর্শাটি সেক্টরের মধ্যে পড়তে হবে এবং মাথা প্রথমে মাটি স্পর্শ করবে।

২. জ্যাভেলিন মার্কার স্পর্শ করে বা সামনের দাগ স্পর্শ করে নিক্ষেপ করা যাবে না।

৩. নিক্ষেপের পর পাশের বাড়ানো রেখা অতিক্রম করা যাবে না।

৪. নাম ডাকার ৯০ সেকেন্ডের ভেতর নিক্ষেপ করতে হবে।

৫. টেপ দ্বারা দুই আঙ্গুলে পেঁচানো যাবে না।

৬. হাতে দস্তানা বা গ্লাভস ব্যবহার করা যাবে না।

৭. শক্ত করে ধরার জন্য হাতে পাউডার জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা যাবে।

৩. চাকতি নিক্ষেপ : চাকতি নিক্ষেপ একটি জনপ্রিয় ফিল্ড ইভেন্ট। ডিসকাস বা চাকতি হলো গোলাকার একটি চাকতি। পুরুষদের জন্য চাকতির ওজন ২ কেজি এবং মহিলাদের জন্য এর ওজন ১ কেজি। চাকতি নিক্ষেপের সার্কেলের ব্যাস ২.৫ মিটার। বৃত্তের চারদিকে লোহার রিং মাটিতে বসানো থাকবে। বৃত্তটি কংক্রিটের ও খসখসে হবে।

চাকতি নিক্ষেপের কৌশল

ক. চাকতি ধরা :

১. প্রথমে বিপরীত হাতে চাকতিটি রাখতে হবে।

২. মসৃণ পিঠ উপরে থাকবে।

৩. যে হাতে নিক্ষেপ করা হবে সে হাতের মধ্যের তিন আঙ্গুলের প্রথম ভাঁজে ডিসকাসকে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে।

৪. বৃদ্ধ ও কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সাহায্যে সাপোর্ট নিতে হবে।

৫. আঙ্গুলগুলো ফাঁকা করে রাখতে হবে।

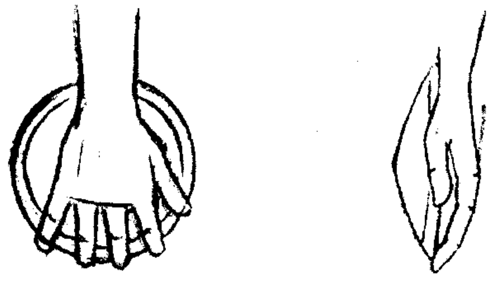

চাকতি ধরা

চাকতি নিক্ষেপের ধাপসমূহ :

চাকতি নিক্ষেপের ধাপ তিনটি। ১. সুইং, ২. টার্ন, ৩. নিক্ষেপ।

১. সুইং : বৃত্তের ভিতর দাঁড়িয়ে চাকতিটি শক্তভাবে ধরে নিক্ষেপকারীর সুবিধা মতো সুইং দিবে।

২. টার্ন : ছোড়ার পূর্ব মুহূর্তে খুব জোরে ১১/২ পাক ঘুরে চাকতিটি ছুড়বে।

৩. নিক্ষেপ : ঘোরার সাথে সাথে পায়ের উপর ভর করে নিক্ষেপ করতে হয়। নিক্ষেপের পর এক পায়ের উপর শরীরের ভারসাম্য রাখতে হয়।

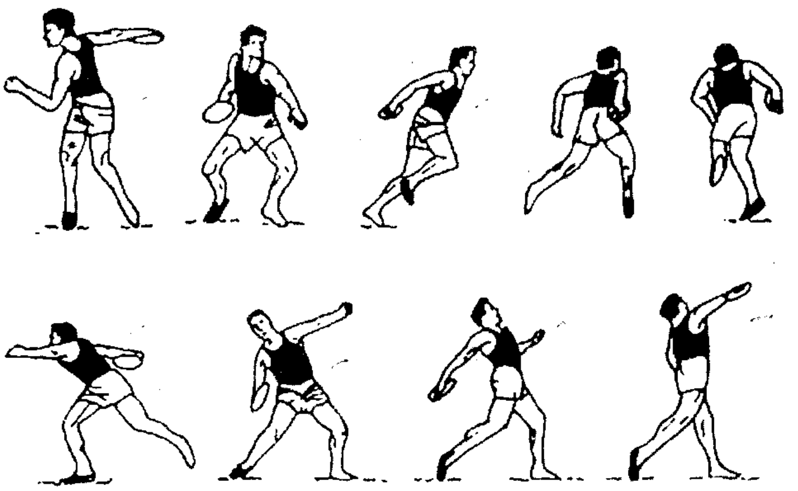

চাকতি নিক্ষেপের কৌশল

নিয়মাবলি

১. নাম ডাকার ৬০ সেকেন্ডের ভিতর নিক্ষেপ করতে হবে।

২. বৃত্তের মধ্যে থেকে চাকতি নিক্ষেপ করতে হবে।

৩. নিক্ষেপের পর পিছনের অংশ দিয়ে বের হতে হবে।

৪. চাকতিটি সেক্টরের মধ্যে পড়তে হবে।

৫. চাকতিটি শূন্যে থাকা অবস্থায় বৃত্ত থেকে বের হওয়া যাবে না।

৬. সার্কেলের চতুর্দিকের লোহার রিং এর উপরে স্পর্শ করা যাবে না।

৭. নিক্ষেপের সময় বৃত্তের বাইরের ভূমি স্পর্শ করা যাবে না।

কাজ–১ : গোলক কীভাবে ধরতে হয় ? কীভাবে নিক্ষেপ করতে হয় তা দেখাতে বলবেন।

কাজ–২ : শিক্ষার্থীদিগকে তিনটি দলে ভাগ করে একেক গ্রুপকে একেকটি নিক্ষেপের কৌশল দেখাতে বলবেন।

কাজ–৩ : তিনটি নিক্ষেপের নিয়মকানুন উপস্থাপন করতে বলবেন।

পাঠ–৬: সাঁতার : সাঁতার একটি অতি প্রাচীন ক্রীড়া। প্রাচীন যুগে মানুষ বাঁচার জন্য সাঁতার শিখেছে। এজন্য কোনো নিয়মকানুন কলাকৌশলের প্রয়োজন ছিল না। পরবর্তীকালে সুস্বাস্থ্য গঠন ও নির্মল চিত্ত বিনোদনের জন্য সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের আনন্দ দিয়ে আসছে। বর্তমানে যে ধরনের সাঁতার আমরা দেখতে পাই সে সাঁতার প্রথমে ইংরেজরা শুরু করেন। ইংরেজরা প্রথমে ব্রেস্ট স্ট্রোক ও সাইড স্ট্রোক দিয়ে সাঁতার শুরু করেন। ১৮৭৩ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়। আস্তে আস্তে

সারা বিশ্বে এর প্রসার ঘটতে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ অ্যামেচার সুইমিং ফেডারেশন গঠিত হয়। তখন থেকে এই ফেডারেশন বাংলাদেশে সাঁতারের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সাঁতারের কলাকৌশল : প্রতিযোগিতামূলক সাঁতার চার রকমের। ১. ফ্রি স্টাইল, ২. ব্যাক স্ট্রোক, ৩. ব্রেস্ট স্ট্রোক বা বুক সাঁতার, ৪. বাটার ফ্লাই বা প্রজাপতি সাঁতার।

ক. ফ্রি স্টাইল বা মুক্ত সাঁতার : এই সাঁতারে একজন প্রতিযোগী যে কোনো স্টাইলে সাঁতার কাটতে পারে। তবে কীভাবে সাঁতার কাটলে দ্রুত যাওয়া যায় তা সাঁতারু বার বার অনুশীলন করে আয়ত্তে আনতে পারে। এজন্য দেহের অবস্থান, পা ও হাতের কাজ, শ্বাস-প্রশ্বাস– এইসব প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১. দেহের অবস্থান : দেহটাকে উপুড় করে পানির সমান্তরালে রাখতে হবে। মাথা পানির সামান্য উপরে থাকবে। তবে পানির মধ্যে মাথার অবস্থান কখনও পানির উপর তুলে, আবার কখনও ঘাড় কাত করে মাঝে মাঝে পরিবর্তন করতে হয়।

২. পায়ের কাজ : পায়ের কাজ কোমর থেকে শুরু হয় এবং সামনে এগোনোর জন্য ডান ও বাম পা একের পর এক ওঠানামা করে। হাঁটুর কাছে পা সামান্য ভাঁজ করা অবস্থায় থাকে এবং পায়ের পাতা সোজা থাকে। বাম পায়ের গোড়ালি পানির উপর ওঠে না। পায়ের পাতা দিয়ে যখন পানিতে চাপ দেওয়া হয় তখন পায়ের পাতা ১২–১৮ ইঞ্চি পরিমাণ পানির নিচে যেতে পারে। পানির মধ্যে দু'হাত একবার ঘুরে আসার সময় দুই পা পানির মধ্যে ৬ বার ওঠা-নামা করবে। পায়ের কাজকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়– ক. উপরে কিক, খ. নিচে বিট।

৩. হাতের কাজ : পানিতে দুই হাত একের পর এক মাথার সামনে ফেলতে হবে। এক হাত পানি কেটে শরীরের পাশ দিয়ে কোমরের কাছে যাবে, ঐ সময় কনুই সামান্য ভাঁজ হবে। হাতটি পানির উপর ওঠা মাত্র অপর হাত মাথার সামনে পানিতে গিয়ে পড়বে। পানিতে হাত পড়ার সাথে হাত দিয়ে পানি কেটে শরীরকে সামনে নিতে হবে। হাত ও পায়ের সমন্বিত কাজের ফলে সাঁতারুর গতি বৃদ্ধি পায়।

৪. শ্বাস প্রশ্বাস : সাঁতার কাটার সময় মাথাটাকে ঘুরিয়ে পানির উপর মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও নিঃশ্বাস ছাড়া হয়। যে হাত পানির উপরে থাকবে সেদিকে মাথা ঘুরিয়ে মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালাতে হবে। তবে নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে মুখ পানির মধ্যে ঘুরে যাওয়ার সময়।

খ. ব্যাক স্ট্রোক বা চিৎ সাঁতার : পানির উপর পিঠ রেখে চিৎ হয়ে পিছনের দিকে সাঁতার কাটতে হয় বলে একে চিৎ সাঁতার বলে।

১. দেহের অবস্থান : পানিতে শরীরকে চিৎ করে রাখতে হবে। সাধারণত মাথাটাকে পানির ভিতর রাখতে হয়। এর

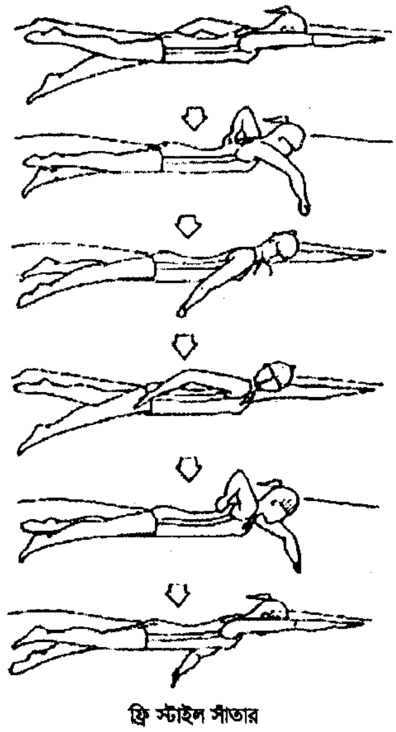

ফ্রি স্টাইল সাঁতার

ফলে শরীর পানির উপর সমান্তরাল অবস্থায় থাকে। নাক পানির মধ্যে না ডুবে পানির উপরে থাকবে এবং দৃষ্টি থাকবে পায়ের গোড়ালির দিকে।

২. পায়ের কাজ : মুক্ত সাঁতার বা ফ্রি স্টাইলের মতো চিৎ সাঁতারে পায়ের কাজ করা হয়। মুক্ত সাঁতারে পানির উপর উপুড় হয়ে দু'পা পানির মধ্যে থেকে একের পর এক ওঠানামা করে। ঠিক তেমনি চিৎ সাঁতারে পানিতে চিৎ হয়ে থেকে দু'পা পানির মধ্যে ওঠা নামা করবে। এ সময় পায়ের পাতা সোজা থাকবে।

৩. হাতের কাজ : এক হাত কানের পাশ দিয়ে সোজা পিছনে নেওয়ার পর হাতের তালু ও আঙ্গুল দিয়ে পানি কেটে শরীরের পাশে নিয়ে আসবে তখন অপর হাত একইভাবে পিছনে গিয়ে পড়বে। এভাবে একের পর এক হাত পিছনে ও পাশে আসবে এবং এর সাথে পায়ের কাজ সমন্বিত হবে।

৪. শ্বাস-প্রশ্বাস : যেহেতু পানির উপর চিৎ হয়ে থাকার জন্য মুখ উপরের দিকে থাকবে তাই শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিকভাবে নিতে হবে।

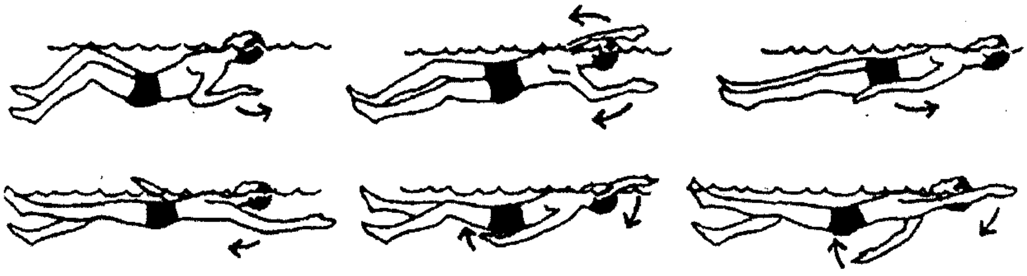

চিৎ সাঁতার

গ. ব্রেস্ট স্ট্রোক বা বুক সাঁতার : পানিতে বুকের উপর ভর করে এই সাঁতার কাটতে হয় বলে একে বুক সাঁতার বলে।

১. দেহের অবস্থান : দেহ থাকবে পানির উপরিভাগের সমান্তরালে। দেহের পিছনের অংশ কিছুটা পানির মধ্যে থাকে। মাথা থাকবে পানির উপরে। হাতের ও পায়ের কাজের শেষে শরীর যখন সামনে এগোবে তখন নাক ও মুখ পানির কিছুটা নিচে যাবে।

২. পায়ের কাজ : দুই পা'কে এক সাথে রাখতে হবে। দুই হাত মাথার সামনে লম্বা করে ফেলে দুই হাত দিয়ে শরীরের দুইপাশে পানি কেটে টেনে আনতে হবে। এ সময় দু হাঁটু ভাঁজ করে পানির নিচে যাবে, আর দু' গোড়ালি এক সাথে কোমরের কাছাকাছি এসে সজোরে পানিতে ধাক্কা দেবে।

৩. হাতের কাজ : দুই হাত এক সাথে সামনে প্রসারিত করতে হবে। দুই হাত এক সাথে পানি কেটে শরীরের দু'দিকে আসার সময় কনুই সামান্য ভাঁজ হবে। পানি কেটে আসার পর আবার মুখের সামনে দুই হাত একত্রিত হয়ে সামনে চলে যাবে। এ সময় নাক, মুখ ও কপালের কিছুটা পানির মধ্যে থাকবে।

৪. শ্বাস প্রশ্বাস : মুখের সামনে দুই হাত প্রসারিত করার পর যখন শরীরের দু'পাশে পানি কেটে আসবে তখন মুখ পানি থেকে উপরে উঠিয়ে শ্বাস নেবে এবং পানির মধ্যে নিঃশ্বাস ছাড়বে।

ঘ. বাটার ফ্লাই স্ট্রোক বা প্রজাপতি সাঁতার : চার প্রকার সাঁতারের মধ্যে বাটার ফ্লাই স্ট্রোকের সাঁতার সবচেয়ে কঠিন। এতে সাঁতারুকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এর কলাকৌশল আয়ত্ত করতে সাঁতারুকে অনেক অনুশীলন করতে হয়।

১. দেহের অবস্থান : অন্য সকল স্ট্রোকের মতো দেহ যথাসম্ভব পানির উপর সমান্তরাল অবস্থানে থাকবে। যেহেতু শরীরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং মাথা উঠিয়ে শ্বাস নিতে হয় তাই শরীরের পিছনের অংশটুকু একটু পানির নিচে থাকে।

২. পায়ের কাজ : দুই হাত জোড়া অবস্থায় থাকবে। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত যত বেশি নমনীয় হবে, তত জোরে পানিতে জোড় পায়ে আঘাত করা যাবে। পা দুটিকে একটু হাঁটু ভেঙ্গে নিচে ও পিছনে পানিতে ধাক্কা দিতে হবে। ডলফিন মাছ যেভাবে লেজের সাহায্যে পানিতে ধাক্কা দিয়ে চলে সেভাবে পায়ের এই ধাক্কাকে ডলফিন কিক বলে।

৩. হাতের কাজ : দুই হাত একসাথে মাথার সামনে নিক্ষেপ করতে হয়। দুই হাত এক সাথে মাথার সামনে চাপ দিয়ে শরীরকে সামনে এগিয়ে নিতে হয়। এর সাথে পায়ের ডলফিন কিকের সমন্বয় ঘটবে। পানির ভিতর থেকে দুই হাত উঠিয়ে যখন সামনে ফেলা হয় তখন খানিকটা প্রজাপতির পাখার মতো দেখতে মনে হবে। তাই একে বাটারফ্লাই স্ট্রোক নাম দেওয়া হয়েছে।

৪. শ্বাস-প্রশ্বাস : একবার হাতের কাজ সম্পন্ন হলে দুইবার পায়ের ডলফিন কিক সম্পন্ন হয়। হাতের সঞ্চালনের কাজ এবং দ্বিতীয় বার পায়ের কিকের সময় মুখ দিয়ে শ্বাস গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়। তখন মাথা থাকে পানির উপরে।

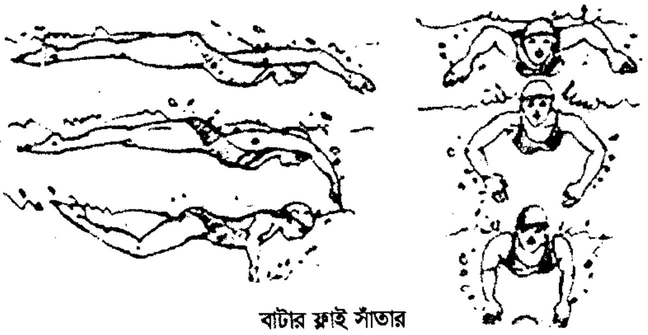

বাটার ফ্লাই সাঁতার

ঘূর্ণন (Turning) : ঘূর্ণন সাঁতারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঘুরতে দেরি হলে সময় বেশি লাগে। ঘূর্ণনের সময় সাঁতারের গতি কমানো যাবে না। একজন সাঁতারু ঘূর্ণনের সময় পর্যায়ক্রমে নিচের কাজগুলো করতে হয়–

১. দেয়ালের কাছে গিয়ে ঘূর্ণনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

২. ঘূর্ণনের কৌশল মোতাবেক শরীরকে ঘোরাতে হবে।

৩. হাঁটু বাঁকা করে পদদ্বয় দেয়ালের কাছে স্থাপন করতে হবে।

৪. পায়ের পাতা স্থাপন ঠিকমতো হলেই শরীরকে ঘোরাতে হবে।

৫. দেয়ালের সাথে পা ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

৬. গ্লাইডের সময় শরীরকে সোজা রেখে অগ্রসর হতে হবে।

৭. পায়ের ও হাতের কাজ শুরু করতে হবে।

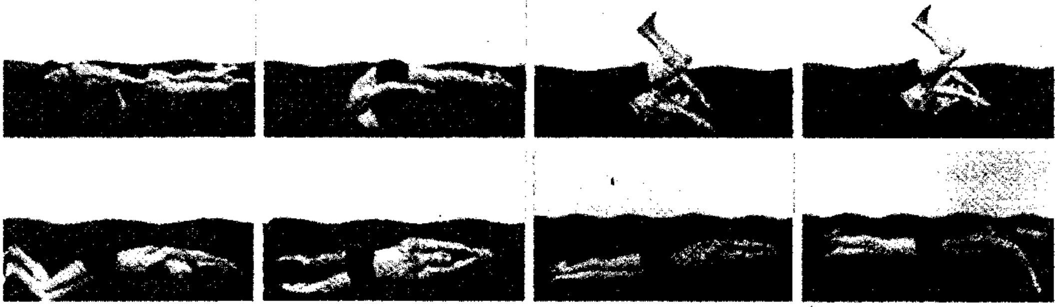

সাঁতারের ঘূর্ণন

সাঁতারের নিয়মাবলি

১. সুইমিং পুলের দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার ও প্রস্থ ২১ মিটার।

২. সুইমিং পুলে লেন থাকে ৮টি, লেনের চওড়া ২.৫০ মি: পানির গভীরতা ১.৮ মিটার।

৩. আরম্ভ স্থান অপিচ্ছিল হবে এবং পানি থেকে ০.৫০–০.৭৫ মিটার উপরে থাকবে।

৪. আরম্ভকারী আরম্ভের সময় নিচের শব্দগুলো উচ্চারণ করবেন টেক ইউর মার্ক, সেট, পিস্তলের আওয়াজ।

৫. চিৎ সাঁতার বাদে অন্য সাঁতারগুলো ডাইভ দিয়ে শুরু করতে হবে।

৬. হিটে যে ১ম ও ২য় হবে তাদেরকে ৪ ও ৫ নং লেন দিতে হবে।

৭. ফ্রি স্টাইল ও চিৎ সাঁতারে এক হাত দিয়ে স্পর্শ করে সাঁতার শেষ করা যায় কিন্তু বুক ও প্রজাপতি সাঁতারে দু'হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয়।

৮. যদি কোনো সাঁতারু নির্দিষ্ট স্টাইলে বা সাঁতরিয়ে অন্য স্টাইলে সাঁতরায় তাহলে সে অযোগ্য হবে।

৯. ব্যাক স্ট্রোক সাঁতারের সময় দেয়ালের সাথে যে হাতল আছে তা ধরে পা দ্বারা পুশ করে চিৎ হয়ে আরম্ভ নিতে হবে।

১০. একজন সাঁতারু লেন পরিবর্তন করতে পারবে না বা অন্য সাঁতারুকে বাধা প্রদান করতে পারবে না।

রিলে : রিলে দুই প্রকার। ক. মিডলে রিলে খ. ব্যক্তিগত মিডলে রিলে।

মিডলে রিলে : চারজন সাঁতারু যখন চারটি স্টাইল একই দূরত্বে সাঁতার দেয় তাকে মিডলে রিলে বলে। মিডলে রিলের ক্রম– ১. চিৎ সাঁতার, ২. বুক সাঁতার, ৩. প্রজাপতি সাঁতার, ৪. মুক্ত সাঁতার।

ব্যক্তিগত মিডলে : একজন সাঁতারু যখন একাই ৪টি স্টাইল সাঁতরায় তাকে ব্যক্তিগত মিডলে রিলে বলে। এ রিলের ক্রম হলো– ১. প্রজাপতি সাঁতার, ২. চিৎ সাঁতার, ৩. বুক সাঁতার, ৪. মুক্ত সাঁতার।

কাজ–১ : মাঠে লম্বা একটি বেঞ্চ এনে তার উপর শুয়ে মুক্ত সাঁতারের হাত ও পায়ের কাজ দেখাতে বলবেন।

কাজ–২ : সবাইকে এক বা দুই ফাইলে দাঁড় করিয়ে শরীর সামনে ঝুঁকে হাতের মুভমেন্ট অনুশীলন করতে বলবেন।

কাজ–৩ : একজন ভালো সাঁতারুকে পানিতে নেমে বিভিন্ন স্টাইলে সাঁতার কেটে অন্যদেরকে বোঝাবেন।

পাঠ–৭ : অ্যাথলেট ও সাঁতারুদের যোগ্যতা : ইভেন্ট অনুযায়ী যোগ্যতার ভিন্নতা রয়েছে। সব ইভেন্টের জন্য একই ধরনের যোগ্যতা প্রয়োজন হয় না। একেক ইভেন্টের জন্য একেক ধরনের শারীরিক যোগ্যতা ও অন্যান্য যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। যেমন একজন নিক্ষেপকারীর জন্য যে ধরনের শারীরিক যোগ্যতার প্রয়োজন হয় একজন দূরপাল্লার দৌড়বিদের জন্য সে রকম শারীরিক যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। অ্যাথলেটিক্স ও সাঁতার প্রতিযোগিতা ইভেন্ট ভিত্তিক ফলে ব্যক্তিগত কলা কৌশলের উপর প্রতিযোগীর সফলতা নির্ভর করে। অ্যাথলেটিক্স ও সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের যোগ্যতা নিচে তুলে ধরা হলো–

১. শারীরিক যোগ্যতা : শারীরিক যোগ্যতা সব খেলার জন্যই প্রয়োজন। কোনো খেলায় শক্তি, কোনো খেলায় দম, কোনো খেলায় গতির প্রয়োজন হয় বেশি। তবে মনে রাখতে হবে শারীরিক যোগ্যতা ইভেন্ট অনুযায়ী পার্থক্য আছে।

ক. স্বল্প দূরত্বের দৌড়বিদ (স্প্রিন্টার) : এ সমস্ত ইভেন্টের দৌড়বিদের জন্য শারীরিক সক্ষমতার ভিতর শক্তি সবচেয়ে প্রয়োজন। বিশেষ করে পায়ের মাংসপেশির উন্নতি অপরিহার্য। এর সাথে প্রয়োজন গতির।

খ. দূরপাল্লার দৌড়বিদ : এ দৌড়ের জন্য শারীরিক যোগ্যতার মধ্যে দমের প্রয়োজন হয় বেশি। যাদের দম বেশি তারা এ ইভেন্টগুলোতে ভালো করে। এর সাথে শরীরের অন্যান্য যোগ্যতারও প্রয়োজন রয়েছে।

গ. স্বল্প দূরত্বের সাঁতারু : শারীরিক যোগ্যতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হাতের শক্তি, শরীরের নমনীয়তা, বাকিগুলোরও প্রয়োজন তবে এ দুটোর মতো নয়। এর সাথে আরোও অন্যান্য যোগ্যতারও দরকার আছে।

ঘ. দূরপাল্লার সাঁতারু : *এসব ইভেন্টের প্রথম যোগ্যতা হলো দম। পানির উপর ভেসে থাকার দক্ষতা ইত্যাদি।* এছাড়া হাত ও কাঁধের মুভমেন্টের দক্ষতারও প্রয়োজন।

২. কলাকৌশলের পারদর্শিতা অর্জনের দক্ষতা : যেহেতু এ দুটি প্রতিযোগিতা ব্যক্তি পারদর্শিতার উপর নির্ভর করে তাই–

ক. রি-অ্যাকশন টাইম : দৌড় ও সাঁতারের ইভেন্টগুলো পিস্তলের আওয়াজের সাথে সাথে শুরু করতে হয় সেজন্য রি-অ্যাকশন টাইম বা প্রতিক্রিয়া ভালো হতে হবে। স্বল্প দূরত্বের দৌড় ও স্বল্প দূরত্বের সাঁতারের জন্য আরম্ভ গুরুত্বপূর্ণ।

খ. সমাপ্তি রেখা স্পর্শ করার যোগ্যতা : সমাপ্তি রেখা স্পর্শ করার দক্ষতাও অত্যন্ত জরুরি। সাঁতারই হোক বা অ্যাথলেটিক্স হোক দুটো প্রতিযোগিতাই নিয়মমাফিক স্পর্শ করার দক্ষতা থাকতে হবে।

গ. যারা নিক্ষেপকারী তাদের ঘোরা, **নিক্ষেপ করা ও ফলো-থ্রো করা**, ফলো-থ্রো সঠিক করার দক্ষতা থাকতে হবে।

ঘ. সংশ্লিষ্ট ইভেন্টের নিয়মকানুন জানা : সংশ্লিষ্ট ইভেন্টের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকতে হবে।

ঙ. আত্মবিশ্বাস : প্রতিযোগীদের আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। মনোবল দৃঢ় না হলে ভালো ফলাফল আশা করা যায় না।

চ. শৃঙ্খলা ও আনুগত্যবোধ : প্রত্যেক প্রতিযোগীর শৃঙ্খলার মাধ্যমে অনুশীলন, সঠিক বিশ্রাম করতে হবে। শিক্ষক/প্রশিক্ষকের নির্দেশ মতো কাজ করতে হবে।

কাজ- ১ : দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে এক গ্রুপ সাঁতারের ও অপর গ্রুপ অ্যাথলেটিক্সের ইভেন্ট অনুসারে কী কী যোগ্যতা প্রয়োজন তা আলোচনা করতে বলবেন।
কাজ-২ : আরম্ভ ও সমাপ্তির নিয়ম-কানুন বর্ণনা করতে বলবেন।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও-

১.১ ব্রেস্ট স্ট্রোক সাঁতারে সমাপ্তি রেখা স্পর্শ করার নিয়ম

ক. এক হাত দিয়ে খ. দুই হাত দিয়ে গ. শরীরের যে কোনো অংশদিয়ে

১.২ দূরপাল্লার দৌড়বিদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন?

ক. নমনীয়তা খ. দম

গ. শক্তি ঘ. ক্ষিপ্রতা

১.৩ বাটার ফ্লাই সাঁতার ডাইভ দিয়ে শুরু করতে হয়? কথাটি-

ক. সত্য খ. মিথ্যা

গ. আংশিক সত্য ঘ. কোনোটিই না।

১.৪ উচ্চলাফে কোন স্থানের জন্য টাই ভাঙতে হয়?

ক. ২য় স্থানের জন্য খ. ১ম স্থানের জন্য

গ. ৩য় স্থানের জন্য ঘ. সব স্থানের জন্য

২. উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. গোলক নিক্ষেপের সার্কেলের ব্যাস............মিটার।

খ. বর্শা নিক্ষেপের সেক্টরের মাপ............মিটার।

গ. উচ্চ লাফের পিটের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ..........মিটার।

ঘ. সাঁতারের সমাপ্তি দেয়াল.............হাত দিয়ে স্পর্শ হয়

ঙ. মিডলে রিলে সাঁতারের শেষ প্রতিযোগী..........সাঁতার দিয়ে শেষ করে।

চ. বাটার ফ্লাই সাঁতারের পায়ের কিককে...........কিক বলে।

৩. বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল কর।

ক. ফস বেরি ফ্লপ	ক. রিলে দৌড়
খ. বাঞ্চ স্টার্ট	খ. উচ্চলাফ
গ. ব্যাটন	গ. দৌড় সমাপ্তি
ঘ. ফ্রগ কিক	ঘ. ১০০ মি: স্প্রিন্ট
ঙ. টর্সো	ঙ. ব্রেস্ট স্ট্রোক

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও-

ক. ট্র্যাক ইভেন্ট কাকে বলে?

খ. ফিল্ড ইভেন্ট কয় ভাগে বিভক্ত?

গ. ব্রেস্ট স্ট্রোক সাঁতারে দেহের অবস্থান লিখ

ঘ. উচ্চলাফ দেওয়ার কৌশলগুলো কী কী?

ঙ. একজন গোলক নিক্ষেপকারী কখন অকৃতকার্য হয়?

৫. রচনামূলক প্রশ্ন :

ক. দীর্ঘ লাফের নিয়মগুলো বর্ণনা কর।

খ. উচ্চ লাফের টাই হলে টাই ভাঙ্গার পদ্ধতি আলোচনা কর।

গ. ট্র্যাক ইভেন্টগুলোর নাম লিখ।

ঘ. ব্যাক স্ট্রোক সাঁতারের নিয়মগুলো বর্ণনা কর।

ঙ. বাটার ফ্লাই সাঁতারের দেহের অবস্থান বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

খেলাধুলার দুর্ঘটনা

দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নানা রকম দুর্ঘটনা জীবনের গতিপথে সাময়িক বাধার সৃষ্টি করে। এসব দুর্ঘটনা নানাভাবে ঘটতে পারে। খেলাধুলা বা ব্যায়াম করার সময় আকস্মিকভাবে পায়ে ব্যথা পাওয়া, পা মচকে বা হাড় ভেঙ্গে যাওয়া, কেটে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। দুর্ঘটনা অকস্মাৎ ঘটে। তখন আশপাশে কোনো ডাক্তার পাওয়া যায় না। এ সময় রোগীকে তাৎক্ষণিক প্রতিবিধান দিতে হয়। সেজন্য আমাদের প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা জরুরি। প্রাথমিক প্রতিবিধানের মাধ্যমে আমরা সুস্থজীবন যাপনে সক্ষম হব।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণ

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- প্রাথমিক প্রতিবিধানের গুরুত্ব ও পদ্ধতি ধারাবাহিকতাবে বর্ণনা করতে পারব।
- প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণসমূহের বর্ণনা দিতে পারব।
- প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- চামড়া ছড়ে যাওয়া ও ফুলে যাওয়ার কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- মচকানো ও হাড়ভাঙ্গার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রতিবিধান বর্ণনা করতে পারব।
- সন্ধিচ্যুতি ও লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্ষতের প্রকার ভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- ক্ষতের প্রতিকার করতে পারব।
- নাক দিয়ে রক্ত পড়া ও মাংসপেশিতে টান ধরার প্রাথমিক প্রতিবিধান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানিতে ডুবে গেলে তাৎক্ষণিক করণীয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- কেউ পানিতে ডুবে গেলে তাৎক্ষণিক প্রাথমিক প্রতিবিধান দিতে পারব।
- চামড়া ছড়ে যাওয়া, ফুলে যাওয়া, মচকানো ও হাড়ভাঙ্গা, সন্ধিচ্যুতি ও লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া, ক্ষত, নাক দিয়ে রক্ত পড়া, মাসলপুল, ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবিধান প্রদানে সক্ষম হব।
- প্রাথমিক প্রতিবিধানের মাধ্যমে সুস্থজীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হব।

পাঠ–১ : প্রাথমিক প্রতিনিবিধানের গুরুত্ব, পদ্ধতি ও উপকরণ : প্রাথমিক প্রতিবিধান হলো চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত একটি প্রাথমিক বিভাগ। এই বিদ্যায় অভিজ্ঞ একজন প্রতিবিধানকারী কেউ দুর্ঘটনায় বা অসুস্থ হলে তাকে সঠিক পদ্ধতিতে ও যত্ন সহকারে প্রাথমিক প্রতিবিধান দিতে পারে। পুরো চিকিৎসা করা প্রতিবিধানের উদ্দেশ্য নয়। কারণ প্রতিবিধানকারী চিকিৎসক নন। প্রতিবিধানকারী ডাক্তার আসার আগ পর্যন্ত বা হাসপাতালে স্থানান্তর করার আগ পর্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করা, সুস্থ করার পথ সুগম করা এবং রোগীর অবস্থা যেন আরও খারাপ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে জীবনরক্ষার ভার নেওয়াই হলো প্রাথমিক প্রতিবিধানের উদ্দেশ্য। First Aid শব্দটি ভাঙলে সহজে প্রাথমিক প্রতিবিধান কী তা বোঝা যায়।

F-Fast (দ্রুত) : প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীকে দ্রুত কাজ সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে।

I-Investigation (অনুসন্ধান) : রোগীর অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক সবকিছু অনুসন্ধান করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

R-Relief (আরাম): সর্বপ্রথম রোগীর যন্ত্রণা লাঘব করে আরামের ব্যবস্থা করতে হবে।

S-Sympathy (সহানুভূতি) : রোগীকে সহানুভূতির সাথে দেখতে হবে। তাহলে সে অনেকটা সুস্থবোধ করবে।

T-Treatment (চিকিৎসা) : প্রতিবিধানকারী দ্রুত তার সাধ্যমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

A-Arrangement (ব্যবস্থা) : রোগীকে প্রাথমিক প্রতিবিধানের পর ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

I-Immediate (তৎক্ষণাৎ) : তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিয়ে ডাক্তার বা হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

D-Disposal (অপসারণ করা) : প্রতিবিধান স্থান থেকে রোগীকে সরাতে হবে অর্থাৎ মারাত্মক না হলে বাড়িতে প্রয়োজন হলে হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের পদ্ধতি : প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানের পদ্ধতিগুলো হলো–

১. দ্রুত অথচ ঠান্ডা মাথায় আগের কাজ আগে ও পরের কাজ পরে করতে হবে।

২. রোগীকে ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিতে হবে।

৩. রোগীর জ্ঞান আছে কিনা দেখতে হবে।

৪. শ্বাস-প্রশ্বাসের বিঘ্ন দেখা দিলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. রক্তক্ষরণ থাকলে তৎক্ষণাৎ বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।

৬. শক দেখা দিলে তার প্রতিবিধান আগে করতে হবে।

৭. নাড়ির গতির প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

৮. রোগীর জ্ঞান না থাকলে শরীরের কাপড়-চোপড় আলগা করে দিতে হবে।

৯. রোগী ও তার সাথী বা সকলকে আশ্বাস ও সাহস দিতে হবে।

১০. দর্শক যেন বেশি ভিড় করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. চোখের তারা অস্বাভাবিক কিনা, মুখ বিবর্ণ কিনা, মাথায় আঘাত আছে কিনা এবং রোগীকে উত্তাপ দিতে হবে কিনা এসবের দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

১৩. যত শীঘ্র ডাক্তারের নিকট হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণ :

নিম্নলিখিত উপকরণগুলো প্রাথমিক প্রতিবিধান করার সময় প্রয়োজন হয়–

১. জীবাণুমুক্ত তুলা বা গজ ২. লিন্ট ৩. স্প্লিন্ট ৪. প্যাড ৫. কাঁচি ৬. ত্রিকোণ ও রোলার

ব্যান্ডেজ ৭. ডেটল ৮. প্যাড, ফ্লাট প্যাড ও রিং প্যাড, ৯. আয়োডিন ১০. বেনজিন ১১. একটি চিমটা ১২. সেফটিফিন, ১৩. ব্লেড, সেলাই করার জন্য সুচ, ১৪. স্পিরিট ১৫. লিউকো প্লাস্টার ১৬. আই প্যাড ১৭. এক টিউব বারনল ১৮. একটি ঔষধের ট্রে ১৯. একটি সিরিঞ্জ ২০. একটি ফার্স্ট এইড বক্স।

কাজ– ১ : প্রাথমিক প্রতিবিধানের গুরুত্বগুলো পোস্টার পেপারে লিখে আনতে বলবেন।
কাজ–২ : প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর করণীয় কাজ বোর্ডে লিখে দেখাতে বলবেন।
কাজ–৩ : প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণগুলো টেবিলে সাজিয়ে রেখে বেছে বের করতে বলবেন।

পাঠ–২ : প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর গুণাবলি– একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর নিম্নলিখিত গুণগুলো থাকা প্রয়োজন–

১. **পর্যবেক্ষণ জ্ঞান সম্পন্ন :** প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী রোগীর আঘাতের কারণ ও চিহ্ন সহজেই পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

২. **বিচক্ষণতা :** প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী কোনো অপ্রোয়াজনীয় কাজ না করে সহজে রোগীর লক্ষণাদি দেখে আহত জায়গা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ ও সকলের বিশ্বাসভাজন হতে পারে।

৩. **অভিজ্ঞতাপূর্ণ :** প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হাতের কাছে যে সমস্ত জিনিস পাবে তা দিয়েই সে প্রতিবিধানের কাজ চালাতে পারেন সেরকম অভিজ্ঞ হতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে যেন বেশি না হয়।

৪. **কর্মদক্ষতা :** প্রতিবিধানকারী অযথা রোগীকে যেন কষ্ট না দেয়। অভিজ্ঞতার আলোকে অত্যন্ত সহজ ও নিপুণভাবে কাজটি সম্পন্ন করবে।

৫. **সঠিক উপদেশ দাতা :** প্রতিবিধানকারীকে ও তার নিকটস্থ লোকদেরকে উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে সঠিক উপদেশ বা নির্দেশ দেবেন।

৬. সঠিক সিদ্ধান্ত : প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীও আঘাতের গুরুত্ব লঘুত্ব বুঝে আগের কাজ আগে ও পরের কাজ পরে করবে।

৭. আত্মবিশ্বাসী : প্রতিবিধানকারী প্রথমে অসুবিধা হলেও সে যেন প্রতিবিধানের কাজ আত্মবিশ্বাসের সাথে শেষ করে।

৮. সহানুভূতি : প্রতিবিধানকারী রোগীর প্রতি কখনো কঠোর হবে না। রোগী যেন কষ্ট না পায় সেদিকে লক্ষ রেখে অন্যদের সাহস দিতে হবে।

> কাজ–১ : প্রাথমিক প্রতিবিধানের দুইটি গুণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা গ্রুপ করে আলোচনা করবে।
>
> কাজ–২ : তোমার মতে কোন গুণটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা বর্ণনা কর।

পাঠ–৩ : চামড়া ছড়ে যাওয়া, মাংসপেশিতে টান ও ফুলে যাওয়া– দৈনন্দিন চলার পথে ও খেলাধুলা করার সময় আমরা যে কোনো সময় দুর্ঘটনায় পড়তে পারি। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে কোনো কোনো সময় দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলা সম্ভব। আর যদি দুর্ঘটনা ঘটেই যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে প্রয়োজন হলে ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। খেলাধুলা করার সময় আমরা বিভিন্নভাবে দুর্ঘটনায় পড়তে পারি।

১. দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলো মেনে চলা প্রয়োজন।

২. খেলাধুলা ও ব্যায়াম করার পূর্বে শরীর ভালোভাবে গরম করে খেলার উপযোগী করে নিতে হবে।

৩. প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যায়াম বা খেলাধুলা করা উচিত নয়।

৪. ব্যায়াম করার সময় নিজের উচ্চতা ও ওজন অনুসারে সঙ্গী বেছে নিতে হবে।

৫. পিচ্ছিল, ভেজা, ও ইট পাটকেলযুক্ত মাঠে খেলা উচিত নয়।

৬. গাছ বা বৈদ্যুতিক তারের কাছে খেলাধুলা করা উচিত নয়।

এগুলো মেনে চললে দুর্ঘটনা অনেকটাই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

১. চামড়া ছড়ে যাওয়া : হাতুড়ি, পাথর বা কোনো ভোঁতা জিনিসের আঘাতে বা খেলার সময় বুটের আঘাতে চামড়া ছড়ে যেতে পারে। চামড়া ছড়ে গেলে ঐ স্থানটি থেতলানো, রক্তজমা ও কালশিটেযুক্ত হয়।

প্রাথমিক প্রতিবিধান–

১. ছড়ে যাওয়া থেঁতলানো জায়গায় ঠান্ডা পানি বা বরফ লাগাতে হবে।

২. পরিষ্কার তোয়ালে বা কাপড় ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে বেঁধে রাখতে হবে। শুকিয়ে গেলে পুনরায় ভিজিয়ে দিতে হবে।

৩. রক্ত বের হলে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. জীবাণুমুক্ত তুলা দিয়ে জমাট রক্ত মুছে মলম লাগাতে হবে।

৫. প্রয়োজন হলে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

২. মাংসপেশিতে টান ধরা : খেলাধুলা করার সময় বা ভারী কোনো জিনিস তোলার সময় মাংসপেশিতে টান লেগে মাংসপেশির আঁশ ছিঁড়ে ব্যথা অনুভূত হয় ও চলতে গেলে খুব কষ্ট হয়। কোনো কোনো সময় আহত স্থানে ফুলে ওঠে এবং কালশিরা পড়ে যায়। এ অবস্থাকে মাসলপুল বা মাংসপেশিতে টান বলে। এরূপ হলে আহত স্থানটিকে বিশ্রাম দিয়ে বরফ লাগাতে হবে। ২৪ ঘণ্টা পর গরম পানিতে বোরিক এসিড পাউডারের কমপ্রেস প্রয়োগ করতে হবে। অ্যাথলেটিকস ও সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের মাংসপেশিতে টান ধরে বেশি।

৩. ফুলে যাওয়া : ফুটবল খেলার সময় বুটের আঘাতে, বক্সিং খেলার সময় মুষ্টির আঘাতে বা পড়ে গিয়ে আঘাত লেগে শরীরের কোনো স্থান ফুলে যেতে পারে। এর প্রথম কাজই হলো বরফ লাগানো। কিছুক্ষণ বরফ লাগালে ফোলা আস্তে আস্তে কমে যাবে। এর পরেও যদি ব্যথা থাকে তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

কাজ–১ : চামড়া ছড়ে গেলে তার প্রাথমিক প্রতিবিধান করে দেখাতে বলবেন।

কাজ–২ : মাংসপেশিতে টান ধরার কারণ ও এর প্রতিবিধান বর্ণনা কর।

পাঠ–৪ : সন্ধিচ্যুতি, মচকানো ও হাড় ভাঙ্গা এবং লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া :

১. সন্ধিচ্যুতি : শরীরের একটি অস্থি/হাড় অন্য হাড়ের সাথে যেখানে মিলিত হয়েছে ঐ স্থানকে সন্ধিস্থান বলে। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক হাড়ের সংযোগ স্থানের নাম সন্ধি। এই সন্ধির স্থান থেকে যদি হাড়ের বিচ্যুতি ঘটে তাকে সন্ধিচ্যুতি বলে। কাঁধ, কনুই, কব্জি, বৃদ্ধাঙ্গুল, নিম্ন চোয়াল, হাঁটু ও পায়ের গোড়ালি ইত্যাদির সন্ধিস্থানের সন্ধিচ্যুতি ঘটতে পারে। অনেক সময় সন্ধিচ্যুতি ও হাড়ভাঙ্গা একই সময়ে হয়ে থাকে।

সন্ধিচ্যুতির লক্ষণ : ১. সন্ধিস্থান ফুলে যাওয়া, ২. সন্ধিস্থানে ব্যথা অনুভব করা, ৩. সন্ধিস্থান নড়াচড়া করানো যায় না, ৪. সন্ধিস্থানের হাড় সরে গিয়ে বিকৃত রূপ ধারণ করা।

সন্ধিচ্যুতির প্রাথমিক প্রতিবিধান–

১. আহত অঙ্গ যথাসম্ভব আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হবে।

২. আহত অঙ্গ নড়াচড়া করা যাবে না।

৩. সংযোগ বিচ্যুতি অস্থি দুটিকে সংযোগ দিতে হবে বা সংযোগ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৪. সন্ধিচ্যুতির স্থানে ভেজা কাপড় বা বরফ লাগাতে হবে।

৫. প্রয়োজনে হাড়ভাঙ্গার ব্যান্ডেজ ব্যবহার করবে।

৬. রোগীর শক লাগলে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. হাড়ভাঙ্গার সন্দেহ হলে হাড়ভাঙ্গার ব্যান্ডেজ করতে হবে।

৮. রোগীকে যথাসম্ভব দ্রুত ডাক্তারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২. মচকানো ও হাড়ভাঙ্গা

২.১ অস্থি বা হাড়ের জোড় লাগানোর স্থানে শক্ত লিগামেন্ট হাড়ের জোড়াকে একসাথে রাখে। কোনো কারণে যদি এই লিগামেন্ট টানটান হয় কিংবা ছিঁড়ে যায় তাহলে হাড়ের সন্ধিস্থলে প্রচণ্ড ব্যথা হয় এবং আহত স্থানের চারপাশ ফুলে ওঠে। একে অস্থিসন্ধির মচকানো বলে। খেলাধুলা বা ব্যায়ামের সময় মচকালে স্থানটিকে

সবচেয়ে আরামদায়ক অবস্থানে রাখতে হবে। এরপর তুলা বেশ পুরু করে আহত স্থানের উপরে ও নিচে দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ করতে হবে।

২.২ হাড়ভাঙ্গা : শরীরের কোনো হাড় ভেঙ্গে গেলে একে হাড় ভাঙ্গা বা Fracture বলে। হাড়ভাঙ্গা নানা প্রকার হতে পারে। যেমন– ক. সাধারণ হাড়ভাঙ্গা খ. কম্পাউন্ড হাড়ভাঙ্গা গ. জটিল হাড়ভাঙ্গা

২.২.১ সাধারণ হাড়ভাঙ্গা : এই হাড়ভাঙ্গা শরীরের অভ্যন্তরে ঘটে। প্রথমে হাড়ের দুই মাথা সোজা করে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করতে হবে। তারপরে স্প্রিন্ট দিয়ে বেঁধে অনড় করতে হবে।

২.২.২ কম্পাউন্ড ফ্রাকচার : একে উন্মুক্ত ফ্রাকচারও বলে। কারণ এই ফ্রাকচারের ভাঙ্গাহাড় চামড়া ভেদ করে শরীরের বাইরে বেরিয়ে আসে। ভাঙ্গাহাড় যতটা সম্ভব সোজা করে শক্তভাবে ব্যান্ডেজ করতে হবে যেন ঐ স্থান অনড় হয়।

২.২.৩ কমপ্লিকেটেড ফ্রাকচার : এই ফ্রাকচারের ভাঙ্গা হাড়ের প্রান্ত শরীরের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দেহ যথা– কিডনি, লিভার, ফুসফুস বা কোনো রক্তনালিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এছাড়াও আরো কয়েক প্রকার হাড়ভাঙ্গা রয়েছে, যেমন–

১. **কমিনিউটেড–** হাড় ভেঙ্গে কয়েক টুকরা হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়।

২. **ইমপ্যাক্টেড–** যেখানে হাড়ের ভাঙ্গা প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

৩. **গ্রিনস্টিক–** বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে হাড় না ভেঙ্গে কেবল চির খেয়ে যায়। কচি নিম ডাল খানিকটা দুমড়ে ছেড়ে দিলে যেমন হয়।

হাড় ভেঙ্গে গেলে করণীয়–

১. সাথে সাথে রোগীর চিকিৎসা শুরু করতে হবে। কারণ রোগীকে তৎক্ষণাৎ স্থানান্তর করা সম্ভব হয় না।

২. আঘাতপ্রাপ্ত স্থানকে অনড় করতে হবে যাতে নড়াচড়া করতে না পারে।

৩. স্প্রিন্ট ব্যবহার করে আহত অঙ্গ অনড় করতে হবে।

৪. রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া : লিগামেন্ট জয়েন্টের সাথে সম্পৃক্ত। জয়েন্টে লিগামেন্ট, টেনডন ও মেমব্রেন দ্বারা বেষ্টিত। চ্যাপ্টা জাতীয় বন্ধনীর নাম লিগামেন্ট। লিগামেন্ট দুই হাড়ের নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। এদের উপরে আছে টিস্যুর বন্ধনী ফলে সংযোগস্থানটি আরও মজবুত করেছে। কখনও যদি অসমান্তরাল জায়গায় পা পড়ে, বাস থেকে নামার সময় জয়েন্টে ঝাঁকি লাগে বা দৌড়ের সময় জয়েন্টে কোনো কারণে আঘাত লাগলে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। আহত স্থানটি ফুলে যায় ও ব্যথা অনুভূত হয়। ঐ অঙ্গ নড়াচড়া করতে কষ্ট হয়। সাথে সাথে বরফ লাগাতে হবে এবং বিশ্রামে থাকতে হবে। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের কাছে পাঠাতে হবে।

কাজ–১ : সন্ধিচ্যুতি কেন হয়? এর প্রাথমিক প্রতিবিধান আলোচনা কর।

কাজ–২ : হাড় ভাঙ্গা কত প্রকার ও কী কী? হাড় ভেঙ্গে গেলে তার প্রতিবিধানের বিশদ বর্ণনা দাও।

পাঠ–৫ : ক্ষত, ক্ষতের প্রকারভেদ ও প্রতিকার– শরীরের কোনো তন্তু ছিন্ন অথবা দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত হলে বা তন্তু ছিদ্র হলে তাকে ক্ষত বলে। সাধারণভাবে ত্বক কেটে রক্তপাত হলে তাকেও ক্ষত বলে। ক্ষত পাঁচ প্রকার–

১. পিষ্ট ক্ষত (Confused wound)।

২. ছিন্ন ভিন্ন ক্ষত (Lacerated wound)।

৩. কর্তনজনিত ক্ষত (Incised wound)।

৪. বিদ্ধ ক্ষত (Punctured wound)।

৫. মিশ্রজাতীয় ক্ষত (Mixed wound)।

১. **পিষ্ট ক্ষত** : মানুষের দেহে সূক্ষ্মভাবে গ্রথিত কোষসমূহ ভারী বস্তুর আঘাতের ফলে চামড়ার কোনো ক্ষতি না হয়ে অন্তঃস্থ ক্যাপিলারি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রক্তপাত হয়। কিন্তু সেই রক্ত বাইরে বেরোতে না পেরে ভিতরে জমে থাকে তাকে পিষ্ট ক্ষত বলে। এই ধরনের ক্ষতে দৃশ্যমান রক্তপাত হয় না।

২. **ছিন্নভিন্ন ক্ষত** : জন্তু জানোয়ারের আক্রমণে, মেশিনে থেঁতলালে ও গোলাগুলির আঘাতে যে ক্ষত হয় তাকে ছিন্নভিন্ন ক্ষত বলে। ক্ষতগুলো অসমান বা বিক্ষিপ্তভাবে থাকে।

৩. **কর্তনজনিত ক্ষত** : কোনো ধারালো অস্ত্র যেমন– ব্লেড, ক্ষুর, ছুরি, বঁটি, ভাঙ্গা কাঁচ দ্বারা কেটে যে ক্ষত হয় তাকে কর্তনজনিত ক্ষত বলে। এই ধরনের ক্ষতে ত্বক ও রক্তনালি মসৃণভাবে কেটে যায় এবং অবিরামভাবে রক্তপাত হয় সহজে বন্ধ করা যায় না।

৪. **বিদ্ধক্ষত** : ক্ষতটা গভীর হয়। সে তুলনায় মুখের পরিসর বড় হয় না এ ক্ষতকে বিদ্ধ ক্ষত বলে। যেমন– সুচ, পেরেক, ছুরি, তার ও তারকাটা ইত্যাদি দ্বারা এ ক্ষত হয়। রক্তপাত প্রচুর হতে পারে নাও পারে।

৫. **মিশ্রক্ষত** : উপরে বর্ণিত একাধিক ক্ষত একত্র মিলে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তাকে মিশ্র ক্ষত বলে। যেমন– গুলির ক্ষত, ক্ষতের মুখের পরিসর ছোট এবং অভ্যন্তরে কতটা গভীর তা দেখে বোঝা যায় না। অপর দিকে যেখান দিয়ে গুলি বের হয়েছে সে স্থান বড় ও আকারে অসমানভাবে ক্ষত থাকে। এই ক্ষতটি একদিকে বিদ্ধক্ষত অপর দিকে ছিন্নভিন্ন ক্ষত। দুইটি মিলিত হয়ে মিশ্রিত জাতীয় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষতের প্রাথমিক প্রতিবিধান–

১. রোগীকে শুইয়ে দিতে হবে যেন রোগী সহজ ও নিষ্ফলভাবে শুয়ে থাকতে পারে।

২. ক্ষত স্থানকে হার্ট লেভেল বা হৃৎপিণ্ডের সমতার উপরে রাখতে হবে যাতে ক্ষত স্থান থেকে রক্ত চলাচল কমে রক্ত পড়া থেমে যায়।

৩. আহত হওয়ার সাথে সাথে আহত স্থানে বরফ লাগাতে হবে।

৪. রোগী যথাসম্ভব কম নড়াচড়া করবে।

৫. ক্ষতস্থান এন্টিসেপ্টিক পদার্থ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

৬. রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ চাপ দিতে হবে।

৭. ক্ষতস্থানে কিছু শক্তভাবে ঢুকলে তা তুলে ফেলতে হবে।

৮. ক্ষতস্থানে রক্ত জমাট বাঁধলে উক্ত জমাট রক্ত সরাতে চেষ্টা করবে না।

৯. শক পেলে প্রথমে তার চিকিৎসা করতে হবে।

১০. ক্ষতস্থানে জীবাণুমুক্ত প্যাড ব্যবহার করতে হবে।

১১. আহত অঙ্গকে ব্যান্ডেজ বেঁধে স্থির রাখতে হবে।

১২. কোনো উত্তেজক দ্রব্য বা পানীয় পান করতে দেওয়া যাবে না।

১৩. দ্রুত রোগীকে ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে পাঠাতে হবে।

একজন রোগীর ক্ষত চিকিৎসা করতে গেলে প্রতিবিধান করার কিছু জ্ঞান থাকা দরকার।

ক. কীভাবে কেটেছে, তা কোন পর্যায়ে পড়ে, কর্তনজনিত ক্ষত/ছিন্নভিন্ন ক্ষত, পিষ্টক্ষত না বিদ্ধক্ষত ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত হতে হবে।

খ. প্রথমে করণীয় ঠিক করে নেওয়া। রক্তক্ষরণ হলে প্রথমে তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা। তারপর ইনফেকশন যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা। শক লাগলে তার প্রতিবিধান করা।

গ. পরিষ্কারভাবে যথারীতি ড্রেসিংয়ের ব্যবস্থা করা, রক্তক্ষরণ থাকলে তা বন্ধ করা। সেপটিক যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। Toxoid Injection নিতে বলা ইত্যাদি।

ঘ. শক লাগলে প্রথমে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালু করা।

ঙ. রোগীর অবস্থা বুঝে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

কাজ–১ : ক্ষত কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? তা পোস্টার পেপারে লিখে ঝুলিয়ে রাখ।
কাজ–২ : চার গ্রুপে বসে চারটি ক্ষতের প্রাথমিক প্রতিবিধানগুলো আলোচনা কর ও বোর্ডে এসে উপস্থাপন কর।

পাঠ–৬ : নাক দিয়ে রক্ত পড়া, পানিতে ডুবে যাওয়া, উদ্ধার পদ্ধতি ও কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রদান।

১. নাক দিয়ে রক্ত পড়া : খেলাধুলা করার সময় সামান্য আঘাত লাগলেই নাক দিয়ে রক্ত বের হয়। বিশেষ করে বক্সিং খেলার সময় এ দুর্ঘটনা বেশি ঘটে থাকে।

ক. প্রথমে রোগীকে চেয়ারে বসিয়ে বা চিৎ করে শুইয়ে মুখ পিছনের দিকে সামান্য হেলিয়ে রাখতে হবে।

খ. মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে বলতে হবে।

গ. নাক হালকাভাবে চেপে ধরে রাখতে হবে।

ঘ. জমাট বাঁধা রক্ত সরাতে হয় না, এতে রক্ত আরও বেশি বের হয়।

ঙ. বরফ বা ঠান্ডা পানি লাগালে রক্ত পড়া তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়।

২. পানিতে ডোবা : আমাদের চারপাশে অসংখ্য ডোবা, নালা, পুকুর রয়েছে। সেজন্য সকলেরই সাঁতার জানা দরকার। সাঁতার না জানলে কখনই পানিতে নেমে গোসল করা উচিত নয়। পা পিছলে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পানি উপরে তুলে গোসল করলে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। যদি কেউ পানিতে পড়ে যায়, সাথে সাথে ভাসমান কোনো কিছু পানিতে ছুড়ে দিয়ে বা সাঁতরিয়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে রোগী যেন উদ্ধারকারীকে জড়িয়ে ধরে তার জীবন বিপন্ন না করে। রোগী যদি পানি খায় তাহলে পানি দ্রুত বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে শ্বাসনালিতে পানি ঢুকে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ডুবে যাওয়া রোগীকে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবে–

শিশু হলে

ক. পায়ের গোড়ালি উঁচু করে ধরতে হবে। মাথা নিচের দিকে থাকবে। মাঝে মাঝে পিঠে হালকা চাপ দিতে হবে। এতে গিলে খাওয়া পানি বের হয়ে আসবে। মুখে যদি জলজ উদ্ভিদ ঢোকে তাও বের হয়ে আসবে।

খ. কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. ভেজা কাপড় খুলে ফেলতে হবে।

ঘ. মেডিকেল সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে যেতে হবে।

বয়স্ক লোক হলে

ক. প্রথমে রোগীর গলা মুখ পরিষ্কার করতে হবে।

খ. রোগীর হাঁটু ভাঁজ করে চেয়ার বা টুলের উপর এমনভাবে বসাতে হবে যেন মাথা ঝুলে থাকে। পিঠে হালকা চাপ দিলে গিলে খাওয়া পানি বের হয়ে আসবে।

গ. ভেজা কাপড় খুলে ফেলতে হবে।

ঘ. মেডিকেল সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে যেতে হবে।

২. কৃত্রিম শ্বাস ক্রিয়া : রোগীর শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসক্রিয়া চালু করতে হয় তাকে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া বলে। কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া হাত দিয়ে বা যন্ত্রের সাহায্যে দেওয়া হয়। হাত দ্বারা চাপ দিয়ে কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়ার লক্ষ হচ্ছে যাতে রোগীর ফুসফুসে মিনিটে ১০-১২ বার ছোট ও বড় করা যায়। ছোট হওয়ার সাথে সাথে ফুসফুস থেকে বাতাস বেরিয়ে যায় একে বলে নিঃশ্বাস। বড় হলে বাতাস প্রবেশ করে, একে বলে প্রশ্বাস। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস দেওয়ার কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতি আছে। বহুল প্রচলিত পদ্ধতিগুলো হলো–

১. সেফার (Schafer's) পদ্ধতি।

২. সিলভেস্টার (Silvesters) পদ্ধতি।

৩. হোলজার নেলসন (Holger neilson) পদ্ধতি।

৪. মুখে মুখ (Mouth to Mouth) পদ্ধতি।

১. সেফার পদ্ধতি : রোগীকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। তার মুখ থাকবে নিচের দিকে। হাত দুটি মাথার দু'পাশে ছড়ানো থাকবে। মাথা এক পাশ করে দিতে হবে যাতে তার নাক মাটিতে ঠেকে না থাকে। পরনের কাপড় চোপড় খোলার জন্য সময় নষ্ট করা উচিত নয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী রোগীর মাথার দিকে মুখ করে কোমর বরাবর সমান্তরাল হয়ে পাশে হাঁটু গেড়ে বসবে। তারপর রোগীর কোমরের দু'পাশে নিচের দুটি হাত এমনভাবে রাখতে হবে যাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি দুইটি সামনের দিকে এবং অন্য আঙ্গুলগুলো কোমরের দুই পাশে আড়াআড়িভাবে ছড়িয়ে থাকবে। নিজের হাত দুটি এবং কনুই ঠিক সোজা রাখতে হবে। তারপর কনুই না বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে চাপ দিতে হবে। এ চাপ পেটের সমস্ত অন্ত্রে পড়বে এবং ফুসফুসের বায়ু বেরিয়ে আসবে। তারপর ধীরে ধীরে চাপ ছেড়ে দিতে হবে। চাপ দেওয়া এবং ছাড়া এ দুটি কাজ ৫ সেকেন্ডের ভেতর করতে হবে। চাপ দিতে ২ সেকেন্ড ও ছাড়তে ৩ সেকেন্ড এই মোট ৫ সেকেন্ড। যতক্ষণ শ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিক না হয় ততক্ষণ এ প্রক্রিয়া চলবে।

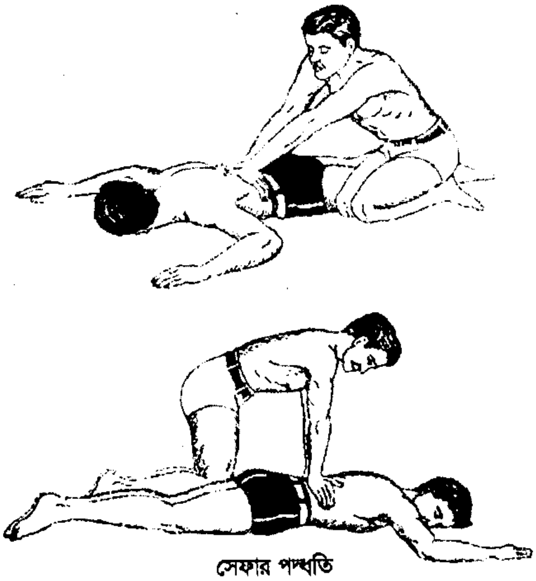

সেফার পদ্ধতি

২. সিলভেস্টার পদ্ধতি : রোগীকে প্রথমে চিৎ করে শোয়াতে হবে। রোগীর ঘাড়ের নিচে একটি ছোট বালিশ দিতে হবে। তার মাথাটা যেন বালিশ পেরিয়ে ঝুলে পড়ে। জামা কাপড় খুলে ফেলতে হবে। জিহ্বা উল্টে যেন বাতাস বন্ধ করে না দেয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। রোগীকে শুইয়ে দুই হাত দিয়ে তার কনুই দুটি সজোরে উপরের দিকে টেনে তুলতে হবে। তারপরে সজোরে কনুই দুটি বুকের দু'পাশে রাখতে হবে। যাতে বুকের দু'পাশে চাপ পড়ে। এভাবে একবার চাপ পড়বে আবার চাপ ছাড়তে হবে। মোট সময় ৫ সেকেন্ড। নাকের কাছে এক টুকরা কাগজ ধরে দেখতে হবে শ্বাস পড়ছে কি না? শ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ ক্রিয়া চলতে থাকবে।

৩. হোলজার নেলসন পদ্ধতি : রোগীকে উপুড় করে শোয়াতে হবে।

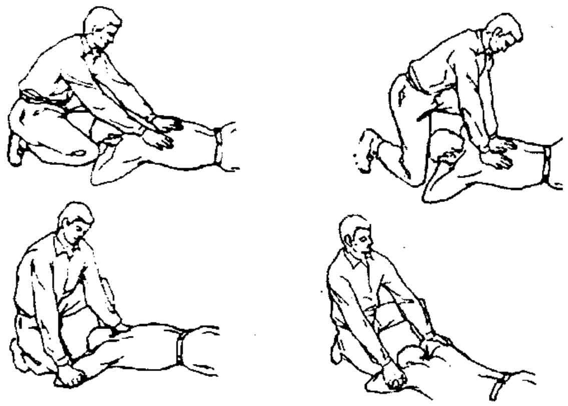

হোলজার নেলসন পদ্ধতি

ক. প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী রোগীর মাথার দিকে হাঁটু গেড়ে বসবে।

খ. রোগীর পিঠে চাপ দিতে হবে। তারপর রোগীর বাহু দুটি ওঠানামা করাতে হবে। মনে রাখতে হবে যদি শোল্ডার জয়েন্ট বা তার কাছাকাছি কোথাও অস্থিভাঙ্গা থাকে তাহলে এ পদ্ধতি চলবে না।

চাপ দেয়ার নিয়ম–

এক, দুই– পিঠে চাপ সৃষ্টি

তিন– একটু থামতে হবে

চার, পাঁচ– বাহুতে টান সৃষ্টি

ছয়– কিছুক্ষণ থাম।

এই প্রক্রিয়ায় রোগীকে প্রতি মিনিট ১০/১২ শ্বাস প্রশ্বাস দেওয়া যায়। প্রতিবারে বাতাস চলাচলের পরিমাণ ১ লিটার।

৪. মুখে মুখ পদ্ধতি : কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের একটি সহজ পদ্ধতি হলো মুখে মুখ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ফুসফুসে বাতাস ঢোকানো যায়। এ পদ্ধতি খুবই সহজ ও পরিশ্রমও কম। অল্প বয়স্করাও সহজে এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারবে। তবে নৈতিক দিক দিয়ে এ পদ্ধতি অনেক সময় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রশ্বাস না পেলে এই ধরনের প্রক্রিয়া বহুকাল আগ থেকে চালু আছে। মূলত প্রতিবিধানকারীর লক্ষ্যই হলো যে কোনো উপায়ে রোগীকে বাঁচানোর চেষ্টা করা। মুখের ভিতরে ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করে, এক হাত দিয়ে রোগীর মাথা চেপে ধর, অপর হাত নিম্ন চোয়াল ধরে মুখ ফাঁক করে নিজে শ্বাস পুরো গ্রহণ করে রোগীর মুখ ঠোঁট দিয়ে আটকে ধরে বাতাস ঢোকাতে হবে। এভাবে ১০-১২ বার বুক ফুলানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

কাজ–১ : নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধের উপায়গুলো লিখ ও উপস্থাপন কর।

কাজ–২ : কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া কাকে বলে বর্ণনা কর।

কাজ–৩ : কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া তোমার কাছে যেটি সহজ মনে হবে সেটি হাতে কলমে দেখাও।

অনুশীলনী

১. **সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও–**

১.১ প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণ নয় কোনটি?

ক. প্যাড খ. ড্রেসিং

গ. কাঁচি ঘ. তুলা

১.২ প্রাথমিক প্রতিবিধানের উদ্দেশ্য কী?

ক. রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ করা। খ. রোগীকে বরফ লাগানো।

গ. রোগীকে সুস্থ করার পথ সুগম করা। ঘ. ডাক্তারের কাছে দ্রুত প্রেরণ করা।

১.৩ **শরীরের ভিতরের হাড় ভেঙ্গে গেলে তাকে কী ভাঙ্গা বলে?**

ক. সাধারণ হাড় ভাঙ্গা খ. জটিল হাড় ভাঙ্গা

গ. কম্পাউন্ড হাড় ভাঙ্গা ঘ. হাত ভাঙ্গা

২. **উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর।**

ক. আঘাতে শরীরের রক্ত ভিতরে জমে থাকে বেরোতে পারে না তাকে..........ক্ষত বলে।

খ. ব্লেড বা ধারালো বস্তু দ্বারা কেটে যাওয়াকে............ক্ষত বলে।

গ. সুচ বা পেরেক শরীরে ঢুকে গেলে তাকে............বলে।

ঘ. মেশিনে থেঁতলে গেলে তাকে...........বলে।

৩. বাম পাশের শব্দের সাথে ডান পাশের শব্দের মিল কর।

ক. ফুলে যাওয়া	ক. ড্রেসিং
খ. গ্রীন স্টিক	খ. বরফ
গ. কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস	গ. হাড় ভাঙ্গা
ঘ. প্রাথমিক চিকিৎসা	ঘ. সেফার পদ্ধতি

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও–

ক. ড্রেসিং কী?

খ. কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া কাকে বলে?

গ. নাক দিয়ে রক্তপড়া বন্ধের উপায় কী?

ঘ. মচকানো কাকে বলে?

৫. রচনামূলক প্রশ্ন:

ক. সন্ধিচ্যুতির লক্ষণগুলো বর্ণনা কর।

খ কমপ্লিকেটেড বা জটিল হাড় ভাঙ্গা কাকে বলে?

গ. বিদ্ধক্ষত কাকে বলে? বিদ্ধ ক্ষতের প্রতিবিধান বর্ণনা কর।

ঘ. সিলভেস্টার পদ্ধতিতে কীভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রদান করা হয় তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

সমাপ্ত